সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ
ও
সঙ্গীত কল্পতরু

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

জিজ্ঞাসা ॥ কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৭০ : অক্টোবর ১৯৬৩

প্রকাশক : শ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা
৩৩ কলেজ রো। কলিকাতা ৯
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। কলিকাতা ২৯

মুদ্রাকর : শ্রীমণীন্দ্রকুমার সরকার
ব্রাহ্মমিশন প্রেস
২১১ বিধান সরণী। কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

পূজনীয় মাতামহ

শিল্পাচার্য শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

চরণ কমলে

ভূমিকা

"সঙ্গীতসাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত-কল্পতরু"—গ্রন্থটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন বিচক্ষণ সাঙ্গীতিক-প্রবন্ধলেখক ও সঙ্গীত-সমালোচক শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থ দুটি প্রধানভাগে বিভক্ত : ১. প্রথমাংশ ১৪৬ পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থকারের নিজস্ব রচনা ও ২. দ্বিতীয়াংশ একখানি প্রাচীন ও অধুনালুপ্ত সঙ্গীত গ্রন্থ 'সঙ্গীত কল্পতরু'—যা রচনা ও সম্পাদনা করেছিলেন বৈষ্ণবচরণ বসাক ও নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি. এ.। বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বাশ্রম তথা গৃহস্থাশ্রমের নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। স্বামী বিবেকানন্দ আজ সমগ্র বিশ্বে পরিচিত নবযুগ সংস্কারক মহামানবাত্মা সন্ন্যাসীরূপে। কিন্তু সঙ্গীতজ্ঞান ও সঙ্গীতশিল্পের তিনি যে ছিলেন একজন পরম পথচারী এবং কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতে ছিল তাঁর অসাধারণ অধিকার, সে কথার পরিচয় আমাদের কাছে একরকম অপরিজ্ঞাতই। তাছাড়া সে সম্বন্ধে জানার আকাঙ্ক্ষাও আছে তাঁর অগণিত অনুসারী ও অনুরাগীদের মধ্যে ক-জনের, তা জিজ্ঞাসার বিষয়।

আচার্যদেব স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের মুখে শুনেছি স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর ছিল সতেজ, গম্ভীর ও সুমিষ্ট। একই সঙ্গে স্নিগ্ধতা ও সতেজতারূপ কোমল-কঠিন বিকাশ স্মরণ করিয়ে দেয় আচার্য শংকরের প্রসন্ন-গম্ভীর ভাষ্য-মাধুর্যের কথা, যদিও একটির বৈশিষ্ট্য সাহিত্যরচনাকে নিয়ে ও অপরটির সার্থকতা রসায়িত স্বর-সৌন্দর্যকে নিয়ে। ধ্রুপদ গীতিরীতিরই তিনি ছিলেন বিশেষভাবে সাধক। তা ছাড়া খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী ও বাংলা টপখেয়াল ও কীর্তন গানও তিনি গাইতেন সুনিপুণভাবে। রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষা করেছিলেন তিনি তদানীন্তন প্রখ্যাত গীতশিল্পীদের কাছে। বিখ্যাত বাঙালী শিল্পী বেণী ওস্তাদের নিকট তিনি অধিকদিন সঙ্গীত শিক্ষা করলেও তাঁর পরবর্তী সঙ্গীতগুরু উস্তাদ আহম্মদ খাঁর উত্তরভারতীয় হিন্দুস্থানী-গায়কী-পদ্ধতিরই তিনি ছিলেন অন্যতম উত্তরসাধক। পাখোয়াজ, তবলা ও সেতারও তিনি শিক্ষা করেছিলেন। কাব্যসৌন্দর্যপূর্ণ সাহিত্যসম্ভার দিয়ে গীত-রচনার শক্তিও ছিল তাঁর মধ্যে অসাধারণ এবং গীতি সংখ্যা মাত্র পাঁচ ছটি হলেও তাদের রসায়িত সাহিত্য ও কাব্য সম্পদই নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে তাঁর রচনাশ্রেষ্ঠতার। তাঁর 'একরূপ অরূপ নাম-বরণ' ও 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ'

এই সৃষ্টি-প্রলয় তথা বিশ্ব প্রকৃতির উন্মীলন ও নিমীলন-নির্দেশক গান দুটির সত্যই তুলনা নাই। তদানীন্তন কালে রচিত বহু বিদগ্ধ গীতরচয়িতার গান হয়ত অনুরূপ রসবিলাসী ও কাব্যসৌন্দর্য-পূর্ণ রূপে পাওয়া যাবে, কিন্তু ব্যাপক প্রাণ-চৈতন্যের প্রত্যক্ষ্যানুভূতির অধিকারী স্বামী বিবেকানন্দের রচনাশৈলী অবশ্যই অধ্যাত্মভাব সম্পদে সমধিক শ্রেষ্ঠ বলেই বিবেচিত হবে। তাঁর 'বীরবাণী'-গ্রন্থের (যদিও সংকলিত) ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত রচনাগুলির মধ্যে বেশ একটি বাস্তব সম্পর্কের সঙ্গে অপার্থিব ভাবসম্পর্কের প্রত্যক্ষ আভাস পাওয়া যায়।

স্বামীজীর কাব্য, সাহিত্য, স্তব ও গীত রচনাগুলির মধ্যে অনুপ্রাস ও রসলালিত্য ও ছন্দমাধুর্যের তুলনা নাই। কাব্য ও সাহিত্য চেতনা তাঁর মধ্যে অভিনব ভাবেই ছিল। 'ভাববার কথা,' 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য,' 'বর্তমান ভারত,' ও 'পরিব্রাজক' গ্রন্থগুলির মধ্যে মৌলিক চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গে রচনাবৈশিষ্ট্যের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। বলিষ্ঠ ও তেজোদীপ্ত ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কারুণ্য ও সারল্যের আভাসও আছে শিবশক্তি মিলনের মতো। মৌলিকতা ও স্বাধীনচিন্তা ছিল তাঁর জীবনচর্যার প্রতিটি পদক্ষেপে। তাই নব সৃষ্টির জগতে তাঁর ভাবসমৃদ্ধ অবদান তাঁকে অবিস্মরণীয় করে রাখবে অনন্ত কালের বুকে।

বিচিত্র শক্তিবিকাশের মধ্যে সঙ্গীত প্রতিভা ছিল তাঁর অন্যতম। ভারতীয় সঙ্গীতসাধনার ক্ষেত্রে নূতন দিক-দর্শনের আভাসও তিনি দিয়েছেন এবং একমুখী অসচ্ছল সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির পরিবর্তে তাঁর মধ্যে দেখি সমন্বয় ও ঐক্যের প্রেরণা। তারই জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত ধারা দুটির মধ্যে সম্ভাব্য যোগসূত্র রচনার কথা তিনি বলেছেন। সঙ্গীত সূক্ষ্ম কারুশিল্প তথা ললিতকলা। অলংকার, মূর্ছনা, তান, রাগ ও আরো বিচিত্র উপাদানের সমষ্টি নিয়ে ভারতীয় সঙ্গীতের বাস্তব রূপের প্রতিফলন যেমন প্রয়োজন, তেমনি অপার্থিব রস ও ভাবের সঞ্চার দিয়ে সঙ্গীতের আন্তর রূপকেও সচল ও প্রাণবান করার সার্থকতাকে তিনি বিশেষভাবে সমর্থন করেছেন। অধ্যাত্ম সম্পদই ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাণ ও নিজস্ব সম্পদ। স্বামীজীর সঙ্গীত-সাধনা ও সঙ্গীত প্রতিফলনের মধ্যে ছিল ঐ অধ্যাত্মভাবেরই বিচ্ছুরণ, আর তারই জন্য তাঁর গান বা সঙ্গীতসাধনা মিলন সাধন করিয়েছিল ঊনবিংশ শতকের মহামানব দক্ষিণেশ্বরমহাতীর্থবাসী শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গীত

শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ হতেন সমাধিমগ্ন। স্বামীজীর গান ঈশ্বরীয় ভাবপ্রেরণায় পরিপূর্ণ ছিল বলেই শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন তাঁর গান-সম্পদের ভিখারী।

স্বামীজী ছিলেন না শুধুই গীতশিল্পী, ছিলেন সঙ্গীত তত্ত্বানুসন্ধানেরও পথচারী, সেকথা আগেই বলেছি এবং 'সঙ্গীত কল্পতরু' গ্রন্থখানির ঔপপত্তিক আলোচনাশৈলীই তাঁর সঙ্গীত জ্ঞান বিচক্ষণতার কথা প্রমাণ করে। অনেকে হয়ত আবার সন্দিহানও হতে পারেন যে, সত্যই স্বামী বিবেকানন্দ 'সঙ্গীত কল্পতরু' গ্রন্থরচনার সহায়ক ছিলেন কিনা। অবশ্য বর্তমান 'সঙ্গীতসাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু' গ্রন্থের ১৩৩ এবং ১৩৮ পৃষ্ঠায় বিচক্ষণ গ্রন্থকার শ্রীদিলীপবাবু এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাছাড়া 'সঙ্গীত কল্পতরু'-র অন্যতম সম্পাদক ও সংকলয়িতা বৈষ্ণবচরণ বসাক ১২৯৪ সালে যে মুখবন্ধ বা বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করেন তার ঐতিহাসিকতায় অবিশ্বাসী হবার কোন কারণ নাই। তিনি লিখেছেন, 'প্রায় এক বৎসর হইল, ইহার সংকলন-কার্য আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি. এ. মহাশয়ই প্রথমত ইহার অধিকাংশ সংগ্রহ করেন। কিন্তু পরিশেষে তিনি নানা অলঙ্ঘনীয় কারণে অবসর না পাওয়ায় ইহা শেষ করিতে পারেন নাই, তজ্জন্য আমিই ইহার অবশিষ্টাংশ পূরণ করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করিলাম।'

এখানে মনে রাখা দরকার যে, 'সঙ্গীত কল্পতরু' গ্রন্থের যে অংশে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর অসংখ্য গান সন্নিবিষ্ট হয়েছিল তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'সঙ্গীত সংগ্রহ'। স্বামী বিবেকানন্দ তথা নরেন্দ্রনাথ দত্ত সে গীতসংগ্রহ কার্যে যেমন বৈষ্ণবচরণ বসাককে সহায়তা করেছিলেন তেমনি করেছিলেন সঙ্গীতের ইতিহাসাশ্রিত ঔপপত্তিক অংশের রচনায়। 'সঙ্গীত কল্পতরু' গ্রন্থের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ স্বামী বিবেকানন্দের নাম (নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি. এ.) ও তাঁর সংগৃহীত উপাদান সজ্জা নিয়ে যথাযথ প্রকাশিত হলেও চতুর্থ সংস্করণে গ্রন্থের কলেবরে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে ও স্বামী বিবেকানন্দের (নরেন্দ্রনাথ দত্ত) নাম পরিত্যক্ত হয়। অবশ্য পরে জ্ঞানচন্দ্র বসাক ও বৈষ্ণবচরণ বসাকের সম্পাদনায় 'বিশ্বসঙ্গীত' নামে তা আবার আত্মপ্রকাশ করে আরো দীর্ঘ কলেবর নিয়ে এবং গ্রন্থকার শ্রীদিলীপবাবু এ সমস্তেরই পরিচয় দিয়েছেন সুনিপুণভাবে।

বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসজীবনাচরণের পূর্বে ও পরে কিভাবে সঙ্গীতানুশীলন ও সঙ্গীত-পরিবেশন করেছেন বিদগ্ধ মনীষীমণ্ডলের মাঝে;

বিচিত্র-সভায় ও আলোচনা-চক্রে, শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসমাজে, মঠে-মন্দিরে, উৎসবে-জনসমাগমে এবং গৃহে-প্রবাসে, সকলগুলির প্রমাণ পঞ্জীসহ তথ্য উপস্থাপন করেছেন শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় এই বর্তমান গ্রন্থের প্রথমাংশে। স্বামীজীর রচনা-চাতুর্যের তিনি পরিচয় দিয়েছেন রচনার কাল, স্থান ও কারণ প্রভৃতির নির্দেশ দিয়ে। সর্বত্র ও সর্বগ্রন্থে সমাকীর্ণ স্বামীজীর অলৌকিক বিরাট জীবনের সঙ্গীত ঘটনাবলীর কাহিনী বা ইতিহাসই বলা যায় এ গ্রন্থটিকে। সকলগুলির একত্র গ্রন্থনে চাক্ষুষ রূপদান করার দায়িত্ব ও সার্থকতা কতখানি তা' স্বামী বিবেকানন্দের সর্বতোমুখী প্রতিভার সমাদর-বিলাসী মাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করবেন। পূর্বেই বলেছি যে, স্বামীজীর বিচিত্র জীবনচর্যার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্নমুখী জীবনের কর্মপ্রবাহ ও মনীষার বিকাশকাহিনীর পরিচয় দান বহু গ্রন্থেই করা হয়েছে এবং বর্তমানেও অনেকানেক গ্রন্থ রচিত হচ্ছে পূর্ব-পূর্ব শৈলী বা ধারারই অনুসরণ করে, কিন্তু জানি না তাঁর বিরাট সঙ্গীত প্রতিভার প্রতিফলন ও শিল্পচর্যার মহনীয় কাহিনী ক'খানি গ্রন্থ—কি প্রাচ্যে ও কি পাশ্চাত্যে দান করেছে।

মনে পড়ে এ প্রসঙ্গে ভারতের ইতিহাস রচনারই কথা। ভারতের ইতিহাস-রচনায় স্থান পেয়েছে—বিচিত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভাঙাগড়ার কথা, অসংখ্য জাতি ও দেশের উত্থান-পতনের বিস্ময়কর ও শিক্ষাপ্রদ কাহিনী। স্থান পেয়েছে ভৌগোলিক সীমারেখা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ, নদ নদী সাগর, ব্যাবসা-বাণিজ্য, খনিজ সম্পদ, রাজনীতি, শিক্ষানীতি, চিত্র, ভাস্কর্য ও আরো কত-কিছু জিনিসের খুঁটিনাটি তথ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চারুশিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিকাশ সঙ্গীতের জন্মকথা, তার বিকাশ ও বিচিত্র অনুশীলন কাহিনীর পরিবেশন ইতিহাসের পাতায় হয়েছে বর্জিত, সুতরাং অবহেলিত। সঠিক কারণও এর নির্ধারণ করা বোধ হয় সহজ নয় মনে করি। তেমনি স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-ইতিহাস ও জীবনতথ্য-পরিবেশনের ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গীত প্রতিভার আলোচনা হয়েছে বর্জিত অথবা উপেক্ষিত এবং পূর্বোল্লিখিত মন্তব্যের মতোই বলি—কারণ কি এর জানি না। তাই স্বামীজীর জন্মশতবর্ষ-আনন্দোৎসবের দিনে যখনই বন্ধুবর শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় অশেষ পরিশ্রমে বিক্ষিপ্ত সঙ্গীতকাহিনী কেন্দ্রায়িত এবং লুপ্ত 'সঙ্গীত কল্পতরু' গ্রন্থের উদ্ধারসাধন করে 'সঙ্গীতসাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু'-গ্রন্থের রূপদান করেন তখনই জানাই আমি তাঁকে অন্তরের

কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ধন্যবাদ। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-ইতিহাসের ক্ষেত্রে অপূর্ণতার পরিপূরণ কার্য তিনি করেছেন সকলের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে।

শ্রীযুক্ত দিলীপবাবু সঙ্গীত সাহিত্য -ক্ষেত্রে মোটেই অপরিচিত নন, বরং সুপরিচিত। প্রাচীন ও বর্তমান কালের সঙ্গীতশিল্পী ও সঙ্গীতগ্রন্থকারদের জীবন ও অবদান সম্বন্ধে অনেক সুচিন্তিত প্রবন্ধই তিনি প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকায়। প্রতিটি প্রবন্ধই তাঁর সমৃদ্ধ বিচিত্র ঐতিহাসিক তথ্য ও বিশ্লেষণী ধারাকে নিয়ে। এ গ্রন্থে তিনি যে ভাবে স্বামীজীর সঙ্গীতানুশীলনের উপাদান ও কাহিনীর সমাবেশ করেছেন তাতে নূতন বা পৃথক করে কোন ভূমিকা-সংযোজনের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। তবে তাঁর অনুরোধে এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টায় ও নূতনতম দানে সামান্যভাবে নিজেকে সম্পর্কিত করতে পেরে ধন্য জ্ঞান করছি। সার্থক হোক গ্রন্থকারের পরিশ্রম ও কল্যাণী প্রচেষ্টা স্বামীজীর সঙ্গীতমনীষার আলোকদীপ্ত কথা ও কাহিনী বিদগ্ধ ও সাধারণ সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ।
১৯ বি রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট।
কলিকাতা ৬
১৫ অক্টোবর ১৯৬৩

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

নিবেদন

স্বামীজীর পুণ্য জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর ধর্মজীবন নিয়ে নানাপ্রকার আলোচনা ও গবেষণা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর সঙ্গীতজীবন ও সঙ্গীতকৃতি সম্বন্ধে কোন পূর্ণাঙ্গ রচনা দেখা যায় নি। সে অভাব পূরণ করবার আশায় এই গ্রন্থ প্রকাশিত হ'ল। গায়ক ও সঙ্গতকার, সঙ্গীত-ভাবুক ও সুরকার, গান-রচয়িতা ও তত্ত্বদর্শী স্বামীজীর বহুমুখী সঙ্গীতপ্রতিভা সমগ্রভাবে উপস্থাপিত করবার প্রয়াস পেয়েছি। তথ্য ও উপকরণাদি আহরণ করেছি সমসাময়িক বিবরণী ও নির্ভরযোগ্য জীবনী গ্রন্থ থেকে। যে সব গান স্বামীজী গাইতেন বা তাঁর প্রিয় ছিল, তাদের রচয়িতাদের নাম-পরিচয়ও জানিয়েছি এবং প্রসঙ্গত সঙ্গীতজগতের কিছু প্রয়োজনীয় কথাও এসে গেছে। জিজ্ঞাসু পাঠকপাঠিকাদের হয়তো এসব প্রসঙ্গ ভাল লাগবে।

বর্তমান পুস্তকের পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা—স্বামীজীর সঙ্গীতবিষয়ে একটি লুপ্তপ্রায় রচনা এই সঙ্গে মুদ্রিত হ'ল। স্বামীজীর সম্পাদিত সঙ্গীত সংকলন-গ্রন্থ "সঙ্গীত কল্পতরু"র তাঁরই লিখিত এই উপক্রমণিকাটি সঙ্গীততত্ত্ব বিষয়ে এক দুষ্প্রাপ্য রচনা। তার মধ্যে কয়েক পৃষ্ঠা গানের স্বরলিপি এখানে মুদ্রিত করা গেল না। কারণ বটতলা সংস্করণের মূল-গ্রন্থটি বহু স্থানে, বিশেষ স্বরলিপি অংশে ভ্রমপ্রমাদে পূর্ণ ছিল। গানের স্বরলিপি অংশে মুদ্রণ-প্রমাদের মাত্রা এত বেশি যে সংশোধন করতে গেলে রচনাটি একেবারে নতুন হয়ে পড়ে। তাই গান ক'খানির স্বরলিপি অনিচ্ছাসত্ত্বেও বর্জন করতে হ'ল। তবে সঙ্গতযন্ত্রের ঠেকা ও বোলের লিপিমালার (বটতলা সংস্করণে প্রকাশিত) মুদ্রণপ্রমাদ এখানে সংশোধিত হয়েছে। এবং তা' সংশোধন করে' দিয়েছেন— তবলা-বাদনে বাংলার গৌরব শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও মৃদঙ্গগুণী শ্রীপ্রতাপনারায়ণ মিত্র। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সংশোধন করেছেন আড়া ঠেকা, ত্রিতাল, একতাল, তিওর ও ঝাঁপতাল এবং মিত্র মহাশয় সংশোধন করেছেন চৌতাল সুরফাঁকতাল, ধামার ও আড়া চৌতাল। এ বিষয়ে অকুণ্ঠ সাহায্যের জন্যে হীরেন্দ্রবাবু এবং প্রতাপবাবুকে আমার সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ।

সঙ্গীতের ঔপপত্তিক ও ক্রিয়া বিষয়ে স্বামীজীর এই রচনাটি সম্পর্কে

একটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ হয়। প্রায় ৮০ বছর পূর্বে প্রকাশিত এবং তাঁর মাত্র ২৩ বছর বয়সে, প্রচণ্ড মানসিক দ্বন্দ্ব ও বিক্ষোভের কালে লিখিত এই রচনাটি আজকের পরিণত দৃষ্টিতে যদি কেউ বিচার করতে বসেন, তাহলে সুবিবেচনা হবে না। সেযুগে বাংলায় সঙ্গীততত্ত্ব আলোচনা কতদূর অগ্রসর হয়েছিল, সেই নিরিখও মনে রাখা প্রয়োজন।

এই পুস্তকের ভূমিকা রচনা করেছেন, সঙ্গীত-সাহিত্যে বিশ্রুতকীর্তি স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ। আমার সমস্ত প্রচেষ্টায় তাঁর শুভেচ্ছা ও কল্যাণ কামনা অনুভব করে থাকি। তাঁর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন ভাব আমার পক্ষে প্রকাশ করবার নেই। বইয়ের অতি-প্রয়োজনীয় নির্দেশিকাটি অনেক সময় ব্যয় করে প্রস্তুত করেছেন শ্রীতারকেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। তাঁর এই সানন্দ সহযোগিতার জন্যে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

বইখানি আমার ভক্তিভাজন দাদামশায় শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে উৎসর্গ করে কৃতার্থ হয়েছি। সুদীর্ঘকাল তিনি রূপলোকের অপরূপ সন্ধানী চিত্র-সম্পদ দান করে এবং বিচিত্র তন্ত্র, তথা ভ্রমণ সাহিত্য রচনা করে দেশকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর জীবনব্যাপী শিল্পসাধনা একটি মহৎ প্রেরণাস্থল হয়ে আছে আমার মনোলোকে। প্রথম জীবনে তিনি কিছুকাল সঙ্গীতচর্চাও করেছিলেন। সে সব কথা স্মরণ করে তাঁকে নিবেদন করলুম তাঁরই এক শ্রদ্ধাস্পদ পুরুষের সঙ্গীতজীবনকথা।

ললিত নিলয়।
৩৯ একবালপুর রোড।
কলিকাতা ২৩

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
মহালয়া ১৩৭০

সূচীপত্র

লেখকের অপর গ্রন্থ

বিষ্ণুপুর ঘরানা

সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু

উত্তরাধিকার

উত্তর কল্‌কাতায় শিমুলিয়ার বিখ্যাত ও বনিয়াদী দত্তবংশে নরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। এই পরিবারে সংস্কৃতির নানা বিভাগের মধ্যে সঙ্গীতেরও চর্চা ছিল।

উনিশ শতকের ভারতীয় নবজাগৃতির প্রাণকেন্দ্র ছিল কল্‌কাতা। আর তৎকালীন ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার-আন্দোলনে, সাহিত্যচর্চায় ও স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে এই বংশ নতুন যুগের ভাবধারা গ্রহণ করেছিল। সে সব বিষয়ে নানা উল্লেখযোগ্য তথ্যাদি পাওয়া যায়।[১] কিন্তু সে সম্পর্কে বিবরণাদি এখানে অবান্তর বোধে উদ্‌ধৃত করা হল না। কারণ, বর্তমান অধ্যায়ে নরেন্দ্রনাথের পিতৃপিতামহের আলোচনা করা হবে। তাঁদের বিষয়ে প্রসঙ্গত অন্যান্য কথার কিছু উল্লেখ থাকলেও প্রধানত সঙ্গীত সম্পর্কেই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে। শিমুলিয়ার সমগ্র দত্তপরিবারের উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

নরেন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষদের মধ্যে তাঁর পিতা শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত বিশেষ সংস্কৃতিবান্ ব্যক্তি ছিলেন। কৃতী আইনজীবী বিশ্বনাথ অবসর যাপন করতেন কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস -পাঠ ইত্যাদিতে এবং কলাবতের সঙ্গীত শ্রবণ করে। তিনি উদারহৃদয়, সামাজিক, মজ্‌লিসী ও সৌখিন ছিলেন এবং রাগসঙ্গীতের প্রতি তাঁর আন্তরিক অনুরাগ ছিল। তিনি সঙ্গীতের শুধু বোদ্ধা ছিলেন না, এক সময়ে কলাবতের শিক্ষাধীনে সঙ্গীতচর্চাও করেছিলেন। পরবর্তী কালে সঙ্গীতচর্চা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব না হলেও, তিনি আজীবন ছিলেন সঙ্গীত-প্রেমী। তাঁর শিমুলিয়ার বাড়ীতে প্রতি সপ্তায় দুদিন, শনি ও রবি বার, গানের আসর বসত এবং সেখানে কৃতবিদ্য সঙ্গীতজ্ঞগণ সঙ্গীত পরিবেশন করতেন।

নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীতশিক্ষা তাঁর পিতার কাছেই প্রথমে আরম্ভ হয়েছিল। সপরিবারে পশ্চিম ভারতে থাকবার সময় বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয় পুত্রকে সঙ্গীতের প্রথম পাঠ দেন। তার পরে কল্‌কাতায় নরেন্দ্রনাথের নিয়মিত সঙ্গীতশিক্ষার ব্যবস্থা করেন গুণী সঙ্গীতজ্ঞের অধীনে। পরে সে বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হবে।

বিশ্বনাথের সঙ্গীতচর্চা সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য দেবার আছে। কিন্তু তার আগে তাঁর পিতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিশ্বনাথের পিতা অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথের পিতামহ ছিলেন দুর্গাপ্রসাদ। যৌবনে স্ত্রী এবং শিশুপুত্র বিশ্বনাথকে ত্যাগ করে, স্বচ্ছল সংসারের সর্বসুখ বিসর্জন দিয়ে দুর্গাপ্রসাদ সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। আর তিনি সংসারে প্রবেশ করেন নি। তাঁর সঙ্গে পৌত্র নরেন্দ্রনাথের আকৃতিগত সাদৃশ্য ছিল।[২] শুধু তাই নয়। দুর্গাপ্রসাদের বিষয়ে একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত উল্লেখ করেছেন,—"পিতামহ দুর্গাপ্রসাদ দত্তের কণ্ঠস্বর অতি মধুর ছিল এবং বেশ গাহিতে পারিতেন।"[৩]

সুতরাং দেখা যায়, নরেন্দ্রনাথের পিতৃপুরুষের ধারায় সঙ্গীতের ঐতিহ্য ছিল। অন্তত তাঁর পিতামহের জীবনকাল থেকে সঙ্গীতচর্চার কথা জানা যায়।

বিশ্বনাথ দত্ত যে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, সে বিষয়ে সমস্ত সংশ্লিষ্ট পুস্তকেই উল্লেখ আছে।

এ সম্পর্কে মহেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন,—"পূজনীয় বিশ্বনাথ দত্ত জীবনের এক সময়ে ওস্তাদ রাখিয়া কিছু সঙ্গীতও অভ্যাস করিয়াছিলেন। মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে অবস্থান কালে তিনি আপনার মনে মাঝে মাঝে বেশ সুস্বরে গাহিতেন।"[৪]

এই উক্তি থেকে জানা গেল যে, দত্ত মহাশয় কিছুকাল ওস্তাদের কাছে নিয়মিত গান শিক্ষা করেছিলেন এবং সুকণ্ঠও ছিলেন। তাঁর সঙ্গীতশিক্ষা সম্পর্কে মহেন্দ্রনাথ দত্তের রচনাবলী কিংবা অন্য কোন পুস্তকে বিস্তৃততর বিবরণ কিছু পাওয়া যায় না। অর্থাৎ তিনি কলকাতা বা পশ্চিমাঞ্চল (যেখানে তিনি অনেককাল আইন-ব্যবসায় উপলক্ষে বাস করেন)—কোথায় সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন এবং কে বা কারা তাঁর সঙ্গীত-গুরু ছিলেন, এ সব তথ্য অজ্ঞাত। তিনি কি রীতির গীত শিক্ষা বা চর্চা করেন তাও জানা যায় না।

তবে একটি পুস্তক থেকে পরোক্ষভাবে বোঝা যায় যে টপ্পা, ঠুংরি ও গজল গানের সঙ্গে বিশ্বনাথের পরিচয় ছিল। কারণ এই তিন ধরণের গান নরেন্দ্রনাথ পিতার কাছে শিখেছিলেন বলে উল্লেখ করা আছে,—

> "সঙ্গীতেও হাতে খড়ি এইখানে হয়।
> পিতৃ-পাশে টপ্পা ঠুংরী গজল আদায়॥"[৫]

উক্ত তিন রীতির গীত তিনি যখন পুত্রকে শিক্ষা দেন, তখন তিনি টপ্পা, ঠুংরী ও গজল জানতেন বা শিখেছিলেন—একথা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। বিশ্বনাথের মানসিকতার যে পরিচয় একাধিক পুস্তক থেকে পাওয়া যায়, তাতে ঠুংরী, গজল শ্রেণীর গানে তাঁর অনুরাগ স্বাভাবিক মনে হয়। যথা, বিশ্বনাথ ছিলেন, "হাফেজী কবিতা -প্রিয়, সঙ্গীতানুরাগী।"[৬]

সঙ্গীতবিষয়ে বিশ্বনাথের ব্যুৎপত্তিলাভ পশ্চিমাঞ্চল থেকে হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। কারণ, তিনি আইনব্যবসায়ীরূপে উত্তর পশ্চিমের বহু স্থানে বাস করেছিলেন এবং তার মধ্যে কয়েকটি ছিল সঙ্গীতচর্চার বিখ্যাত কেন্দ্র। যেমন, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, লাহোর, রাজপুতানা, ইন্দোর, রায়পুর, বিলাস-পুর ইত্যাদি।

তাঁর প্রবাসজীবন সম্পর্কে মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত বিবরণ, কিছু বিস্তারিত হলেও, এখানে উদ্‌ধৃত করা হল,—"বিশ্বনাথ দত্ত কলিকাতা হইতে মোগলসরাই পর্য্যন্ত ট্রেণে গমন করেন। তখন (১৮৭১ খৃষ্টাব্দ—বর্তমান লেখক) ঐ পর্য্যন্ত ট্রেণ হইয়াছিল। তাহার পর টঙ্গা ও অন্যান্য যানাদি করিয়া লক্ষ্ণৌ, দিল্লী অনেক স্থলে যান ও ওকালতী করেন। তখন মিউটিনির পর পশ্চিমে ইংরেজী-জানা লোক খুব কম ছিল। তখনকার দিনে দিল্লী ও পাঞ্জাব আদালতে উর্দ্দু ভাষা প্রচলিত ছিল। বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয় উর্দ্দু, ফার্সি ও আরবি ভাষা ভাল রকম জানিতেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাটর্নি হওয়ায় তাঁহার পশার শীঘ্রই জমিয়া গিয়াছিল।...দিল্লী হইতে টঙ্গা করিয়া লাহোর যান এবং সেখানে গিয়াও ওকালতি করেন।... বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয়, প্রথম যে দশজন এ্যাডভোকেট হন, তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। কোর্টের ভাষা উর্দ্দু ছিল। তখন অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারির লোকেরা জজ হইত। সিভিলিয়ান জজ বা ম্যাজিষ্ট্রেট তত হইত না। সেইজন্য উকিলের এত আবশ্যক ছিল। বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয় বলিতেন, 'পাঞ্জাবে তখন উকিলের কদর খুব' ;...তিনি আইনজ্ঞ, মিষ্টভাষী ও ধীর স্বভাবের লোক ছিলেন, সেইজন্য জজেরা তাঁহাকে বড় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। তখনকার দিনে আদালতে একটি বা দুটি উকিল ছিল। আইনটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ায় মিলিটারি জজেদের বড় সুবিধা হইত। এইজন্য তাঁহারা তাঁহাকে বিশেষ খাতির করিতেন।...তিনি এখনকার দিনের মত নকড়া ছকড়া উকিল ছিলেন না। তখন উকিলের সম্মান ইজ্জত খুব ছিল।"[৭]

সম্ভবত ওই সব জায়গায় বাসের সময় দত্ত মহাশয় একাধিক ওস্তাদের সাহায্যে ঠুংরী, গজল, টপ্পা ইত্যাদি গানের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাঁর পশ্চিম থেকে গান শিক্ষা করবার সম্ভাবনা আরো একটি কারণে মনে হয়। তাঁর সময়ে কল্‌কাতায় ঠুংরীর প্রচলন থাকবার কথা নয়। ঠুংরী গায়কও কল্‌কাতার কোন বাঙ্গালী গৃহের গানের আসরে তখন নিতান্তই দুর্লভ বলা যায়। লক্ষ্ণৌর নির্বাসিত নবাব ওয়াজেদ আলীর মেটিয়াবুরুজে আগমনের পূর্বে কল্‌কাতায় ঠুংরী এক রকম অজ্ঞাত ছিল। নবাবের মেটিয়াবুরুজ দরবারের সূচনা হয় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে। তারপর থেকে নবাব (তিনি উৎকৃষ্ট ঠুংরী-গান-রচয়িতা ছিলেন) কল্‌কাতায় যে ঠুংরী আমদানি করলেন লক্ষ্ণৌ থেকে, তা প্রধানতঃ তাঁর দরবারেই সীমাবদ্ধ ছিল। অন্তত ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের (যখন বিশ্বনাথ পশ্চিমে যাত্রা করেন) আগে কল্‌কাতার কোন সাধারণ সঙ্গীতাসরে ঠুংরী-গায়কের অস্তিত্ব সম্ভব মনে হয় না। কল্‌কাতার রাগ-সঙ্গীতের আসরে তখন ধ্রুপদের একাধিপত্য এবং তারপরে টপ্পার স্থান। বিশ্বনাথের ঠুংরীর সঙ্গে পরিচয় ঘটে থাকলে তা পশ্চিমে, বিশেষ করে লক্ষ্ণৌতেই, হবার সম্ভাবনা।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম যাত্রা করে বিশ্বনাথ কয়েক বছর পূর্বোল্লিখিত স্থানগুলিতে বাস করেন। তারপর ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে অবস্থান করবার সময়ে নরেন্দ্রনাথকে সঙ্গীতশিক্ষা দিয়েছিলেন। পূর্বাপর এই সব বিষয় থেকে অনুমান হয় যে, বিশ্বনাথের নিজের সঙ্গীতচর্চা হয়েছিল পশ্চিমাঞ্চলে প্রবাসের সময়। তাঁর মতন সঙ্গীত-প্রিয় এবং মজলিসী ব্যক্তি যখন লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, লাহোর, ইন্দোর ইত্যাদি সঙ্গীত-কেন্দ্রগুলিতে বাস করেছিলেন, তখন স্থানীয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটা স্বাভাবিক মনে হয়। লক্ষ্ণৌ-এর ঠুংরী, পাঞ্জাবের টপ্পা, দিল্লীর গজল ইত্যাদি সঙ্গীত-রীতির অভিজ্ঞতা তাঁর তত্তৎস্থান থেকে হওয়া সম্ভব।

স্বামীজীর আর একটি প্রামাণিক জীবনীতে বিশ্বনাথের সঙ্গীত বিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায়,—"বিশ্বনাথ অতিশয় সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন এবং তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল চমৎকার। তিনিই সাগ্রহে স্থির করেন যে, নরেনের সঙ্গীত শিক্ষা করা উচিত। কারণ সঙ্গীতকে তিনি অনাবিল আনন্দের উৎস মনে করতেন।"[৮]

বিশ্বনাথের কনিষ্ঠ পুত্র ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও একাধিক স্থানে পিতার সঙ্গীতজ্ঞতার কথা লিখেছেন,—"আমার পিতার সঙ্গীত বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা

ছিল। তিনি নিজে কিছুদিন সঙ্গীত চর্চা করিয়াছিলেন।"[৯] অন্যত্র ডঃ দত্ত উল্লেখ করেছেন,—"বিশ্বনাথের আতিথেয়তা ও সঙ্গীতপ্রিয়তার কথা এখনো কল্‌কাতার কোন কোন ব্যক্তির স্মরণ আছে। জনৈক অশীতিপর বৃদ্ধ তাঁর পিতার মুখে শোনা এই কথা লেখককে বলেছিলেন :—বিশ্বনাথ দত্ত অপরিমিত অর্থব্যয়ের জন্যে শিমলা অঞ্চলে বিখ্যাত ছিলেন। প্রতি শনি ও রবি বারে তিনি সঙ্গীতের মজলিস বসাতেন এবং তাঁর অতিথিদের পোলাও-ভোজে আপ্যায়িত করতেন।"[১০]

নরেন্দ্রনাথের গানের প্রসঙ্গে ডঃ দত্ত আর এক স্থানে তাঁর পিতার সঙ্গীত-শিক্ষার কথা বলেছেন,—"নরেন্দ্র ক্লাসিকাল সঙ্গীতে একজন সুদক্ষ গায়ক ছিলেন। এই রুচি তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেন তাঁর পিতার কাছ থেকে।—পিতাও যৌবনে কিছুকাল সঙ্গীতচর্চা করেছিলেন।"[১১]

এই পর্যন্ত বিশ্বনাথের কথা। এবারে নরেন্দ্রনাথের জননীর বিষয়ে উল্লেখ করে বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করা হবে।

তাঁর মাতা ছিলেন শিমুলিয়ার বসুবংশের নন্দলাল বসুর একমাত্র কন্যা শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী। এই বংশের রামতনু বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র মনীষী কৈলাসচন্দ্র বসু—যাঁর নামে সুকিয়াস স্ট্রীটের নতুন নামকরণ হয়েছে—নরেন্দ্রনাথের মাতুল সম্পর্কীয় ছিলেন।

মহেন্দ্রনাথ দত্ত জননীর সঙ্গীত-প্রিয়তার কথা একাধিক বার বলেছেন। "পূজনীয় মাতা ভুবনেশ্বরীর······স্মরণশক্তি অতি বিখ্যাত ছিল। গান বা কবিতা একবার মনোযোগ দিয়া শুনিলেই তাঁহার বেশ স্মরণ থাকিত।······

"মাতা শ্রদ্ধেয়া ভুবনেশ্বরীর কণ্ঠস্বরও খুব মিষ্ট ছিল। কৃষ্ণ-যাত্রার গান তিনি আপন মনে বেশ গাহিতেন, ইহা আমরা শুনিয়াছি। এইরূপ নানা দিক হইতে শক্তি আসায় স্বামীজীর সঙ্গীতের ইচ্ছা খুব প্রবল হইয়াছিল এবং তিনি কলিকাতায় ধ্রুপদ-গায়ক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আমরা না জানার দরুণ বলি যে,······হঠাৎ বংশ হইতে এক প্রসিদ্ধ লোক উদ্ভূত হইল। কিন্তু বংশের অন্তঃসলিলা স্রোত অনবরত চলিয়া থাকে, সেই শক্তি নানা কারণে পরিবর্ধিত হইয়া হঠাৎ একটা বিরাট রূপ ধারণ করে। হঠাৎ কোন জিনিষ প্রায় হয় না। বংশের মনস্তত্ত্বটা বিশেষ করিয়া জানা উচিত, তাহা না হইলে একটা বিশেষ লোকের মনস্তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝা যায় না।"[১২]

এই সমস্ত পূর্ববৃত্তান্ত থেকে ধারণা করা যায় যে, নরেন্দ্রনাথ পিতা ও মাতা দুদিক থেকেই সঙ্গীতের উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গীত-প্রবণতা পূর্ণতা পেয়েছিল তাঁর জীবনে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ—

১ ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত-লিখিত "নরেন্দ্রনাথের পিতৃবংশের পরিচয়", পৃ: ৮৶; স্বামী শ্যামানন্দ প্রণীত "শ্রীবিবেকানন্দ-কাব্যগীতি" গ্রন্থের অন্তর্গত।

২ স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী, পৃঃ ৯ —মহেন্দ্রনাথ দত্ত।

৩ " " " পৃঃ ৫৪ " "

৪ " " " পৃঃ " "

৫ শ্রীবিবেকানন্দ-কাব্যগীতি, পৃঃ ৫৪ —স্বামী শ্যামানন্দ।

৬ " " পৃঃ ২৩ " "

৭ স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী, পৃঃ ৪৮-৫০—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।

৮ Life of Swami Vivekananda, p. 6—By his Eastern and Western Disciples. 4th Ed দ্রষ্টব্য।

৯ নরেন্দ্রনাথের পিতৃবংশের পরিচয়, পৃঃ ১।৯। শ্রীবিবেকানন্দ-কাব্যগীতি।

১০ Swami Vivekananda—Patriot-Prophet, p. 105 —Dr. B. N. Datta দ্রষ্টব্য।

১১ " " " p. 155—Dr. B. N. Datta দ্রষ্টব্য।

১২ স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী পৃঃ ৫৭, ৫৪-৫৫ —মহেন্দ্রনাথ দত্ত।

সূচনা

প্রভাত যেমন দিনের সূচনা করে, বাল্যও তেমনি মানুষের জীবন-দর্পণ। উত্তরজীবনে যে গুণাবলী একজনকে বৈশিষ্ট্য ও অসাধারণত্ব দান করে, অনেক সময়ে শিশুকালে সে সব লক্ষণ প্রকাশ পায়। অন্তত নরেন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে তাঁর নানা গুণের আভাস পাওয়া যেতে থাকে।

তাঁর অপূর্ব মেধা ও স্মরণশক্তি, তাঁর নেতৃত্বের ক্ষমতা ও উপস্থিতবুদ্ধি, ঋজু ও তেজী স্বভাব, সন্ন্যাসীদের প্রতি আকর্ষণ এবং কখনো কখনো আপনার ভাবে উন্মনা হয়ে থাকা—এই সব বৈশিষ্ট্যই তাঁর ছেলেবেলায় আত্মপ্রকাশ করে। আর সেই সঙ্গে তাঁর সঙ্গীতপ্রীতি এবং সঙ্গীতের নৈপুণ্যও।

শিশুকাল থেকেই তাঁর সুকণ্ঠ এবং শোনা গান অনুকরণ করে গাইবার ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছিল। এ বিষয়ে মহেন্দ্রনাথ দত্তের লেখায় যে সব বিবরণ পাওয়া যায় তা উল্লেখযোগ্য—এ সমস্ত অবশ্য নরেন্দ্রের রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষা করবার আগেকার এবং নিতান্ত শিশুবয়সের কথা। তার থেকে প্রয়োজনীয় অংশ এখানে উদ্‌ধৃত করা হল :—

"নরেন্দ্রনাথের বা বীরেশ্বরের (বীরেশ্বরের আরাধনায় পুত্র হইয়াছিল এইজন্য সন্তানের নাম বীরেশ্বর হইল।) যখন ৫।৬ বৎসর বয়স হইল তখন তাঁহার পিতা অধ্যয়নের জন্য বাড়ীর ঠাকুরদালানে এক গুরুমহাশয় আনাইয়া পাঠশালা বসাইয়া দিলেন। বাড়ীর ছোট ছেলেরা এবং পাড়ার অনেক ছেলেরা সেই পাঠশালায় পড়িতে আসিত।…প্রায় পঞ্চাশ ষাটটি ছেলে হইল। বীরেশ্বর যদিও বয়সে অনেকের অপেক্ষা ছোট ছিল কিন্তু অল্পদিনের ভিতর বেশ লিখিতে পড়িতে শিখিল এবং অনেকের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বালক বলিয়া পরিগণিত হইল।…তখনকার দিনে পাঠশালায় মকর সংক্রান্তির দিন গঙ্গাবন্দনা গাহিয়া গঙ্গার পূজা করিয়া আসার প্রথা ছিল। মকর সংক্রান্তির দিনে অর্থাৎ পৌষ মাসের ৩০শে পিতা বিশ্বনাথ নূতন কাপড় জামা ইত্যাদি গুরুমহাশয়কে এবং কয়েকজন ছাত্রকে দিতেন এবং তাঁহাদের বাজনা-বাদ্যসহ গঙ্গাপূজা করিয়া আসিতে অনুমতি দিতেন। গুরুমহাশয় আনন্দে দলবল লইয়া গাঁদা ফুলের মালা, নিশান এবং বাদ্যকর লইয়া গঙ্গায় পূজা করিয়া আসিতেন। সকলে ফিরিয়া আসিলে পিতা বিশ্বনাথ সকলকে রীতিমত মিষ্টিমুখ করাইতেন। সেই দিন ছাত্রদিগের ভিতর মহা আনন্দ

উৎসব হইত। কিন্তু বিশেষ এক বক্তব্য সকল বালক মিলিত হইয়া সুর করিয়া গাহিত—

বন্দে মাতা সুরধুনী
পুরাণে মহিমা শুনি।
ইত্যাদি

কিন্তু বীরেশ্বরের স্বাভাবিক কণ্ঠের মিষ্টতা বিশেষভাবে সকলের লক্ষ্য হইয়াছিল এবং কথাগুলি অতি স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বালক যে সুকণ্ঠ এবং তাহার সঙ্গীতের যে শক্তি ছিল তাহা সেইদিনই প্রকাশ পাইয়াছিল।”[১]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নরেন্দ্রনাথ অল্প বয়স থেকেই গান শুনে অনুকরণ করতে পারতেন। এ বিষয়েও মহেন্দ্রনাথ দত্ত দুটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে একটি হ'ল বিখ্যাত যাত্রাগায়ক গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা এবং আর একটি যাত্রার (নাম জানা যায়নি) অভিনয় ও গানের কথা। প্রথম যাত্রার আসরটি যখন হয়, নরেন্দ্রের তখন বছর দশেক বয়স। দ্বিতীয়টির তারিখ গ্রন্থকার দেননি, তবে মনে হয় প্রথমোক্ত যাত্রার কাছাকাছি সময়ের। মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন,

“গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা।

“মহেন্দ্র গোস্বামীর গলিতে বা ডোমপাড়াতে আগে একটা বড় পুকুর ছিল। তাহার ধারে অনেক গয়লার বাস ছিল। এখন পুকুর বুজাইয়া মাঠ হইয়াছে এবং সেখানে অনেক ভদ্রলোক বাস করিতেছেন। ইংরাজি ১৮৭১ বা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে গয়লাদের মাঠে বারোয়ারী পূজা হইল এবং সেখানে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হইয়াছিল। আমরা দুই ভাই তখন খুব ছোট। শেষরাত্রে কাপড় পরিয়া গয়লাপাড়ায় যাত্রা শুনিতে গেলাম।···একজন হরবোলা আসিয়া নানারকম পাখীর আওয়াজ করিতে লাগিল। তার পরে কতকগুলি গান হইল। তারপর একটি সঙ্‌ আসিল···এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানারকম নাচ দেখাইল।···

“বীরেশ্বর বাড়ীতে আসিয়াই এই যাত্রা সুরু করিয়া দিল। কাপড়খানি যাত্রাওয়ালাদের মত করিয়া পরিয়া যাত্রায় যাহা যাহা শুনিয়াছিল তাহারই আবৃত্তি চলিল। এই লইয়া দিন কতক বেশ খেলা চলিল।”

আর একটি যাত্রার কথা।—

"...কোন্ যাত্রায় ঠিক মনে নাই। এক যমদূত আসিয়াছিল, সে পায়ে ঘুঙুর পরিয়া গাইতে গাইতে বাহির হইল,

'তোমায় যম এসেছে নিতে।
তুমি দেরী কোরো না যেতে ॥'

বীরেশ্বর ত বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সেই যাত্রা স্থরু করিল আর মেঝেতে পা ঠুকিয়া ঠুকিয়া নাচ আর ঐ গান আরম্ভ হইল। যাহার উপর রাগ হইত তাহাকেই বলিত,

'তোমায় যম এসেছে নিতে।
তুমি দেরী কোরো না যেতে!' "[২]

স্বামী শ্যামানন্দও নরেন্দ্রনাথের বাল্যকালে অপরের মুখে শোনা গান শিখে নেবার পটুতার কথা বর্ণনা করেছেন। এগুলি যাত্রার গান নকল করবারও আগেকার কথা। নরেন্দ্রকে "শ্রুতিধর" বলে অভিহিত করে "শ্রীবিবেকানন্দ-কাব্যগীতি"-কার স্বামী শ্যামানন্দ বলেছেন,

"গান গেয়ে ভিক্ষা করে বৈষ্ণবের গণ।
সব শিখে বিলু* গায় যখন তখন ॥
এখন বয়স তার ছয় সাত হবে।
সর্দার পালের গোদা হইল সে তবে ॥"[৩]

উক্ত পুস্তকের অন্যত্র আছে,

"মার কাছে বসি বিলে* পুরাণ শুনিত।
শুনিয়া তখনই তাহা বলিতে পারিত ॥
গায়কের দল যবে ভিক্ষা করে যায়।
শুনে বিলে স্থির হয়ে সব শিখে নেয় ॥
রামায়ণ গান কালে গায়কের দল।
খেই হারাইয়া করে সব গণ্ডগোল ॥
নরেন ধরিয়া খেই দিল তাহাদের।
................................."[৪]

নরেন্দ্রের যে ক'টি গান গাইবার দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত করা হল, সবই নিতান্ত শিশুবয়সের কথা। পাঁচ ছ' বছর থেকে আরম্ভ করে দশ এগারো বছর

* 'বীরেশ্বর' থেকে ডাক নাম হয়েছিল—বিলে বা বিলু।

বয়সের ঘটনা। পাঁচ ছ' বছর বয়সে মকর সংক্রান্তির দিন গঙ্গাবন্দনার গান গাইবার সময় তাঁর সুকণ্ঠের বিশিষ্টতা অন্য ছেলেদের মধ্যে থেকে পরিস্ফুট হয়েছিল। তার দু' এক বছরের পরের কথায় জানা গেল, বৈষ্ণব ও অন্যান্য ভিখারী গায়কদের মুখে শোনা গান গাইবার কথা। তারপর গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা ও অন্য একটি যাত্রার গান শুনে তা শিখে নেবার বিবরণ। এই সব বিবৃতিই প্রামাণিক। কারণ উক্ত দুই গ্রন্থকারই স্বামীজীর জীবনকথার সঠিক তথ্যাদি অবগত ছিলেন এবং স্বামীজীর বয়ঃকনিষ্ঠ সমসাময়িক। একজন ত তাঁর সাক্ষাৎ অনুজ। অপর জন, অর্থাৎ স্বামী শ্যামানন্দ, প্রথমযৌবনে, স্বামীজীর জীবিতকাল থেকেই, বেলুড়মঠে যাতায়াত করতেন। স্বামীজীর প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধা ভক্তিপরায়ণ হলেও তাঁর সম্পর্কে কল্পিত কাহিনী প্রচার করবার মতন ব্যক্তি তাঁরা ছিলেন না।

বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার কথা যে, নরেন্দ্রনাথের অতি শিশুবয়সেই সঙ্গীতে প্রবণতা ও নিপুণতা প্রকাশ পায়। সঙ্গীত-বিষয়ে এ তাঁর সহজাত প্রতিভার লক্ষণ। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সঙ্গীত-প্রীতির সঙ্গে তাঁর অসামান্য মেধা যুক্ত হয়েছিল। পরে পদ্ধতি-গত শিক্ষা ও চর্চার ফলে তিনি কৃতবিদ্য ও কলাকুশলী গায়করূপে গণ্য হয়েছিলেন। সে প্রসঙ্গ পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। এখানে কথা এই যে, উত্তরজীবনে যাঁরা সঙ্গীতজ্ঞরূপে প্রতিভার পরিচয় দেন, তাঁদের অনেকের বাল্যকালেই এই ধরণের পটুত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, যদুভট্ট প্রভৃতি।

উত্তরজীবনে, মহা শক্তিমান এবং ধীমান বিবেকানন্দ স্বামীর প্রতিভা একাধিক বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছিল এবং সঙ্গীত তার মধ্যে অন্যতম। প্রথম যৌবনেই তিনি বিশেষভাবে এবং রীতি-অনুসারে সঙ্গীতশিক্ষা করেছিলেন এবং সঙ্গীতবিষয়ে সম্ভাবনাকে পূর্ণরূপে বিকশিত করেছিলেন। সঙ্গীত-বিষয়ে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা উত্তরকালে কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সে সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে যথাসময়ে আলোচনা করা হবে। এখানে শুধু বক্তব্য যে, প্রতিভাধর সঙ্গীতজ্ঞের লক্ষণাদি তাঁর বাল্য ও কৈশোরেই দেখা দিয়েছিল এবং প্রথম জীবনের এই সম্ভাবনাকে তিনি যৌবনে সার্থকতার পথে পরিচালিত করেছিলেন।

যৌবনে তিনি সঙ্গীতসাধনা সবিশেষ করেছিলেন বটে, কিন্তু একান্তভাবে নয়। তাঁর নানা-মুখী মানসিক প্রবণতার একটি ধারা সঙ্গীতের খাতে

প্রবাহিত হয়েছিল। যদি তা না হত, অর্থাৎ যদি তিনি একান্তভাবে সঙ্গীতসাধনায় মগ্ন হতেন; সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, পরিব্রাজক ও দেশহিতে উৎসর্গীকৃত-দেহ-মন-প্রাণ না হয়ে যদি সঙ্গীতচর্চাকে জীবনের অন্যতম অবলম্বনরূপেও রাখতেন—তাহলে ভারতের একজন প্রথম শ্রেণীর তত্ত্বজ্ঞ সঙ্গীতসাধকরূপে কীর্তিত হতেন। অঙ্কুরের সম্ভাবনা বিচিত্র পরিণতিতে সুসম্পূর্ণ হত।

তাঁর সঙ্গীতচর্চার মূল্যায়ন করতে গেলে এই রকম মতামত এসে পড়ে। নচেৎ এ প্রসঙ্গে কোন মন্তব্য বর্তমানে অবান্তর। প্রথম যৌবনে তিনি যে প্রথমশ্রেণীর সঙ্গীতপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার সূত্রপাত দেখা যায় ছেলেবেলায়। শিশুকালের এই সঙ্গীত-প্রবণতা তাঁর কৈশোর ও প্রথম যৌবন-কাল ধরে উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়ে যায়। পরে দেখা যাবে, পরিব্রাজক-জীবনের প্রারম্ভ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গীতচর্চায় দীর্ঘদিনের বিরতি ছিল না। এমন কি পরিব্রাজক-জীবনের নানা বিরুদ্ধ পরিবেশেও তা একেবারে লুপ্ত হতে পারেনি। কারণ, সঙ্গীত ছিল তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত—বাহ্য অভ্যাসের বস্তু নয়। সে সব প্রসঙ্গ যথাস্থানে বিবৃত করা হবে।

এখানে এত পুনরুক্তির উদ্দেশ্য হল—তাঁর সঙ্গীত-সূচনার প্রতি যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া। আমাদের দেশে সঙ্গীতক্ষেত্রে যাঁরা প্রতিভার পরিচয় দিয়ে স্বনামপ্রসিদ্ধ হয়েছেন, তাঁদের বালকবয়সের গীতপটুত্ব এই ধরণেরই ছিল; এর চেয়ে খুব বেশি কিছু নয়।

গ্রন্থপঞ্জী :—

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী, পৃঃ ১২-১৪—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।
২ " " " পৃঃ ৬১-৬৩ " "
৩ শ্রীবিবেকানন্দ-কাব্যগীতি, পৃঃ ৩৪—স্বামী শ্যামানন্দ।
৪ " " পৃঃ ৪০ " "

রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষা

বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রসঙ্গে ইতোপূর্বে তাঁর পশ্চিম প্রবাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে তাঁর রায়পুরে বাসের কথাও আছে। রায়পুরে তিনি ছিলেন সপরিবারে। সেখানে যাবার আগে নরেন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপোলিটান স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন।

পিতার সঙ্গে সেবার রায়পুর বাস করবার সময়ে তাঁর সঙ্গীতশিক্ষার সূত্রপাত হয়। তখন তাঁর বয়স তের চোদ্দ বছর।* সঙ্গীতপ্রেমী বিশ্বনাথ দত্ত প্রবাসজীবনে সন্তানদের ঘনিষ্ঠতর সংস্পর্শে আসেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গীতপ্রবণতা নিশ্চয় তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেখানে অবসরকালে নরেন্দ্রকে তিনি নিজে সঙ্গীতশিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন স্নেহ ও কর্তব্য-বশে। সঙ্গীতে পুত্রের স্বভাবজ প্রীতি ও পটুত্ব তাঁকে সঙ্গীতশিক্ষা দিতে অনুপ্রাণিত করে, একথা অনুমান করা যায়। কারণ, প্রথম পরিচ্ছেদের একটি উদ্‌ধৃতিতে দেখা গেছে যে, দত্ত মহাশয় মনে করতেন —সঙ্গীত অনাবিল আনন্দের উৎস এবং নরেন্দ্রের সঙ্গীতশিক্ষা করা অবশ্যই উচিত।

এমনিভাবে সঙ্গীতবোদ্ধা পিতার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এবং শিক্ষাধীনে নরেন্দ্রের সঙ্গীতের প্রথম পাঠ আরম্ভ হয়। কতদিন তিনি পিতার কাছে সঙ্গীতশিক্ষা করেছিলেন তা অবশ্য জানা যায়নি। তবে রায়পুরে তাঁরা দেড় বছর ছিলেন একথা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের পুস্তকে পাওয়া যায়—"The family stayed there for a year and a half."[১]

নরেন্দ্রনাথের গান-শেখা যে তাঁর পিতার কাছে প্রথমে আরম্ভ হয়েছিল এবং তা যে রায়পুরে ঘটে, একথা স্বামী শ্যামানন্দের পুস্তক থেকে স্পষ্ট জানা যায়। বিশ্বনাথের সপরিবারে রায়পুরপ্রবাসের বর্ণনায় লিখেছেন,

"কোনরূপ বিদ্যালয় সেথায় ছিল না।
দিন রাত পিতাপুত্রে নানা আলোচনা॥

* রায়পুরে অবস্থানের তারিখ ভিন্ন ভিন্ন পাওয়া যায়। "শ্রীবিবেকানন্দ-কাব্যগীতি"তে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ (৫২ পৃষ্ঠা), "স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী"তে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ (৫০ পৃষ্ঠা) এবং Swami Vivekananda—Patriot-Prophet পুস্তকে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দ আছে!

সঙ্গীতের হাতেখড়ি এইখানে হয়।
পিতৃপাশে টপ্পা ঠুংরী গজল আদায় ॥
তাহার গানের ঝোঁক দেখি পিতা ভাবে।
সুরের সাধনা তারে করাবে কিভাবে ॥
ফিরে কলিকাতা গিয়ে কলাবত রেখে।
সঙ্গীত শিখাবে তারে বিশুদ্ধতা দেখে ॥" ২

পিতার কাছে তাঁর প্রথম সঙ্গীতশিক্ষার কথা একটি লক্ষণীয় তথ্য। অথচ স্বামীজীর অন্যান্য জীবনীতে এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় না, আর একটি-মাত্র গ্রন্থ ছাড়া। এই পুস্তকে বিশ্বনাথের কাছে নরেন্দ্রের সঙ্গীতশিক্ষার প্রসঙ্গে আছে, "পিতার নিকট তিনি বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতশিক্ষা করিয়াছিলেন এবং গীতবাদ্যেও তাঁহার অধিকার ঐকালে নিতান্ত কম ছিল না।"৩

স্বামীজীর সম্পর্কে তাঁর দুই ভ্রাতার লিখিত বহু তথ্যপূর্ণ গ্রন্থাদিতেও এই মূল্যবান তথ্যটি নেই। সম্ভবত তাঁরা স্বামীজীর সঙ্গীতশিক্ষার প্রথম অবস্থার কথা জানবার সুযোগ পান নি। কিংবা এই সঙ্গীতশিক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্পদিন হয়েছিল বলে মহেন্দ্রনাথ—যিনি স্বামীজীর জীবনের বহু ঘটনাবলী বিবৃত করেছেন এবং এ বিষয়ে যোগ্যতম অধিকারী—হয়ত অপ্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করেননি।

যাই হ'ক, স্বামীজীর অন্য কোন জীবনকথায় সমর্থন না পাওয়া গেলেও "শ্রীবিবেকানন্দ-কাব্যগীতি"র উক্তিটি আমরা প্রামাণিক বিবেচনা করি। কারণ, এই গ্রন্থের রচয়িতা স্বামী শ্যামানন্দ বিবেকানন্দ স্বামীর জীবনী-বিষয়ে, বিশেষ তাঁর সঙ্গীতজীবন-সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। স্বামীজীর সময় থেকে তিনি বেলুড় মঠে যেতেন এবং পরে দীর্ঘকাল রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদকতা করেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একাধিক গ্রন্থ-প্রণেতা। সব চেয়ে বড় কথা, তিনি প্রথম যৌবনে সঙ্গীতচর্চা করতেন এবং সে সময় তাঁর সঙ্গীতগুরু ছিলেন যন্ত্রসঙ্গীতশিল্পী অমৃতলাল দত্ত। হাবু দত্ত নামে সুপরিচিত অমৃতলাল ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞাতিভ্রাতা এবং তিনি দত্তবংশীয়দের ৩নং গৌরমোহন স্ট্রীটের বাড়ীতে শিশুকাল থেকে মধ্য বয়স পর্যন্ত বাস করেন। অমৃতলাল স্বামীজীর চেয়ে বছর পাঁচেক বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গীতশিক্ষা একই সময়ে একই সঙ্গীতগুরুর কাছে আরম্ভ হয়েছিল বিশ্বনাথের ব্যবস্থাপনায়।

পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে সঙ্গীতচর্চা অনিবার্যভাবেই পশ্চাৎপটে চলে যায়। কিন্তু হাবু দত্তের জীবনে সঙ্গীতই প্রধান অবলম্বনের বিষয় হয় এবং তিনি স্বনামধন্য উজীর খাঁর কাছে কল্‌কাতা ও রামপুরে ভালভাবে তালিম পান। সঙ্গীতসাধক আলাউদ্দিন খাঁ উজীর খাঁর শিষ্যরূপে পরিণত বয়সে প্রসিদ্ধিলাভ করলেও প্রথমজীবনে কিছুকাল উক্ত হাবু দত্তের শিষ্যত্ব স্বীকার করেছিলেন যন্ত্রসঙ্গীতে।

হাবু দত্ত ক্ল্যারিওনেট এবং এস্‌রাজ-বাদকরূপে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-শিল্পীদের অন্যতম বলে পরিগণিত ছিলেন। স্বামীজী যখন আমেরিকা থেকে বিজয়ীরূপে কল্‌কাতায় পদার্পণ করেন, তখন শিয়ালদা ষ্টেশনে তাঁর সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে গিরিশচন্দ্র-রচিত ও সেই সভায় গীত গানটির স্থর দেন অমৃতলাল।[৪] তাঁর বিষয়ে একটি অতি গৌরবের এবং সাধারণ্যে অজ্ঞাত তথ্য প্রকাশ করে তাঁর প্রসঙ্গ শেষ করা হবে। তৎকালীন পাশ্চাত্য জগতের সুপ্রসিদ্ধা—এবং স্বামী বিবেকানন্দের মতে, "সর্বশ্রেষ্ঠা"—গায়িকা মাদাম কাল্‌ভে (অষ্টম অধ্যায়ে স্বামীজী-লিখিত তাঁর বিবরণ পাওয়া যাবে) ১৯১১ খৃষ্টাব্দে কল্‌কাতায় এসেছিলেন এবং বেলুড় মঠে অমৃতলালের এস্‌রাজবাদন শুনেছিলেন। শুনে তিনি অভিভূত হন এবং মন্তব্য করেন যে, সুরশিল্পে তাঁর এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা লাভ হল।

অমৃতলাল সম্পর্কে এত কথা আপাতত অবান্তর মনে হলেও স্বামীজীর সঙ্গীতশিক্ষার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থাকায় উল্লেখ করা হল। স্বামীজীর ওস্তাদী শিক্ষার প্রসঙ্গে অমৃতলালের কথা আবার আসবে।

স্বামী শ্যামানন্দের প্রসঙ্গে আবার ফিরে যাওয়া যাক। তিনি অমৃতলালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন সঙ্গীতশিক্ষার সূত্রে। সেজন্যে অমৃতলালের মুখে বিবেকানন্দের সঙ্গীতশিক্ষার প্রসঙ্গ সবিস্তারে শোনবার সুযোগ তাঁর হয়। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে, পিতার কাছে নরেন্দ্রনাথের প্রথম সঙ্গীতশিক্ষার কথা প্রামাণিক বলে গণ্য করা হল। তা ছাড়া, তাঁর গ্রন্থটি—আদ্যোপান্ত পয়ারে রচিত এবং স্বামীজীর প্রতি ভক্তির উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হলেও—তথ্য-সঙ্কলন ও সন্নিবেশের দিক থেকে আশ্চর্যরকম বস্তুনিষ্ঠ।……

বিশ্বনাথ দত্ত যে পুত্রকে সঙ্গীতের প্রথম পাঠ দিয়েছিলেন তা তাঁর সঙ্গীতজ্ঞানের দিক থেকে গৌরবের বিষয় বলা যায়। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত-নৈপুণ্যের সম্পর্কে যে আশা তিনি পোষণ করেছিলেন, পরবর্তী কালে পুত্র

সে আশা পূর্ণ করেছিলেন। স্বামী শ্যামানন্দের গ্রন্থমতে, পিতার কাছে নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীতশিক্ষার সময়ে টপ্পা, ঠুংরী ও গজল গানের সঙ্গে পরিচিত হন; তা বিশ্বনাথের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য একটি কথা এখানে বলা দরকার। পরবর্তীকালে যখন নরেন্দ্রনাথ গায়করূপে প্রসিদ্ধ হন, তাঁর তখনকার গান সম্পর্কে যত বিবরণ আছে তাতে তাঁর উক্ত তিন রীতির গান করার কথা বিশেষ পাওয়া যায় না। তিনি প্রধানত ধ্রুপদ-গায়করূপে খ্যাতিলাভ করেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণসকাশে কীর্তন ও ভজন গানও করতেন। সে প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে।

প্রথম পর্বে শেখা টপ্পা, ঠুংরী ও গজল হয়ত তিনি বন্ধুবান্ধবদের আসরে কোন কোন সময়ে গাইতেন। কিন্তু সে সম্পর্কে লিখিত বিবরণ তেমন পাওয়া যায় না।

রায়পুরে প্রথম সঙ্গীতশিক্ষার পর তিনি পরিবারের সকলের সঙ্গে কল্‌কাতায় ফিরে আসেন। তারপর ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সেজন্যে পিতার কাছ থেকে উপহার লাভ করেন একটি সুদৃশ্য পকেট-ঘড়ি। তারপর প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হয়ে ফার্স্ট আর্টস্ পাশ করেন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে। এই এফ. এ. পরীক্ষা কিন্তু জেনারেল এ্যাসেমব্লীজ্ ইন্‌স্টিটিউশন (বর্তমানে স্কটীশ চর্চ কলেজ) থেকে দিয়েছিলেন। কারণ, ম্যালেরিয়ার জন্যে পার্সেণ্টেজ কম থাকায় প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পরীক্ষা দেবার অনুমতি পাননি।[৫]

যতদূর জানা যায়, প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার পর কিংবা কলেজজীবনের প্রথম অবস্থায় তাঁর ওস্তাদের কাছে সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল।

কৃতবিদ্য কলাবতের অধীনে তাঁর পদ্ধতিগত সঙ্গীতশিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন বিশ্বনাথ। আগেও বলা হয়েছে, পুত্রের সঙ্গীতে সম্ভাবনার বিষয়ে তাঁর মনে প্রত্যয় ছিল। রায়পুরে গান শেখাবার সময়েও ভেবেছিলেন যে, কল্‌কাতায় ফিরে নরেন্দ্রকে ওস্তাদের কাছে ভালভাবে গান শেখাবার ব্যবস্থা করবেন। সেই ইচ্ছা-অনুসারে এবারে ওস্তাদের কাছে গান শেখানো আরম্ভ হল।

বিশ্বনাথ তাঁর গোষ্ঠীর আর একজনের সঙ্গীত-প্রতিভা লক্ষ্য করে তাঁরও নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে একই ওস্তাদের কাছে শেখবার বন্দোবস্ত করে দিলেন। তানপুরা এস্‌রাজ ইত্যাদি যন্ত্রও তিনি কিনে দেন দুই শিক্ষার্থীকে।

নরেন্দ্রনাথের সহ-শিক্ষার্থী হলেন—বিশ্বনাথের পিতৃব্য কালীপ্রসাদের পৌত্র, পূর্বোক্ত অমৃতলাল (হাবু দত্ত)। বিশ্বনাথ যে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে হাবু দত্তের সঙ্গীতশিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতেন এবং সঙ্গীতযন্ত্রাদি ক্রয় করে দেন, একথা হাবু দত্তের সঙ্গীতশিষ্য স্বামী শ্যামানন্দ বর্তমান লেখককে বলেছিলেন। অমৃতলাল সে সময়ে গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটের দত্তবাড়ীতে বাস করতেন।

নরেন্দ্রনাথের এই শিক্ষাপর্ব বিষয়ে, তাঁর বিভিন্ন জীবনীকারদের মতামত প্রথমে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। তার পরে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

স্বামী শ্যামানন্দ লিখেছেন,—

"কলিকাতা এসে সেই বেণী গুপ্তের কাছে।
সা ঋ গা মা স্বর সাধে তাল লয়ে রচে॥
তাহার সাফল্য দেখে অল্প দিনেতে।
সঙ্গীতের যথাশিক্ষা দিল কালোয়াতে॥
আমেদ খাঁ উজীর খাঁ দুন্নি ছোট বড।
কানাই ঢেঁড়ী জগন্নাথ মিশ্র শঙ্কর॥
মৃদঙ্গ তবলা বাদ্য শিখিল সহজে।
সেতার এস্‌রাজ শুদ্ধ তার হাতে বাজে॥
কণ্ঠসঙ্গীতে তার বড়ই পটুতা।
নৃত্যের মাধুর্য ছিল দেহের লালিতা॥"

স্বামীজীর সর্ববৃহৎ জীবনী-লেখক প্রমথনাথ বসু জানিয়েছেন,—"সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিশারদ আহম্মদ খাঁর শিষ্য বেণী গুপ্ত নামে একজন ওস্তাদের নিকট তিনি সঙ্গীতশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয়বিধ সঙ্গীতেই পারদর্শী ছিলেন। বিশ্বনাথ বাল্যাবধি পুত্রের সঙ্গীত-প্রিয়তা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং উপযুক্ত শিক্ষা না পাইলে উহাতে সম্যক অধিকার জন্মে না জানিয়া ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, নরেন্দ্র ওস্তাদের নিকট হইতে রাগ রাগিণী শিক্ষা করেন ও তাল-মান-লয় সম্বন্ধে বিধিমত উপদেশপ্রাপ্ত হন। তদনুসারে নরেন্দ্র চারি পাঁচ বৎসর ধরিয়া ঐ ওস্তাদের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং কলেজের পড়াশুনা অপেক্ষা উহাতেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। বাজাইতেও তিনি বেশ শিখিয়াছিলেন।...... তাঁহার সঙ্গীতগুরু তাঁহার প্রতিভাদর্শনে মুগ্ধ হইয়া অন্যান্য শিষ্য অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক বিষয় শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং তাঁহা দ্বারা নিজের মুখোজ্জ্বল

হইবে জানিয়া তাঁহাকে শিখাইবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেন। নরেন্দ্র তাঁহার নিকট অনেক হিন্দী, উর্দু এবং ফার্সী গানও শিখিয়াছিলেন।"[৭]

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবিষয়ে লিখেছেন—

"নরেন্দ্রনাথ 'বেণী' নামে একজন ওস্তাদের কাছে সঙ্গীতশিক্ষা করেছিলেন। লেখক তাঁর জননীর মুখে শুনেছিলেন যে, কাশী ঘোষালও তাঁর অন্যতম ওস্তাদ। কথিত আছে যে, কাশী ঘোষাল আদি ব্রাহ্মসমাজে পাখোয়াজ বাজাতেন। সম্ভবত তিনি (নরেন্দ্রনাথ) তাঁর কাছে ঐ যন্ত্রটি এবং তার সঙ্গে বাঁয়া ও তবলা বাজাতে শেখেন।"[৮]

মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রকাশিত স্বামীজীর বৃহৎ জীবনকথায় আছে,—

"তিনি দুজন সুপরিচিত সঙ্গীতজ্ঞ আহম্মদ খাঁ ও বেণী গুপ্তের সুযোগ্য শিক্ষাধীনে চার পাঁচ বছর কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন এবং অনেকগুলি যন্ত্র বাজাতে পারতেন, যদিও গানেই তিনি বেশি পারদর্শিতা দেখান। মুসলমান ওস্তাদের কাছে তিনি অনেক হিন্দী, উর্দু ও ফার্সী গান শেখেন, তার মধ্যে বেশির ভাগই ভক্তিমূলক।"[৯]

উদ্ধৃত বিবৃতিগুলির মধ্যে যথাক্রমে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং প্রমথনাথ বসু বলেছেন যে, নরেন্দ্রনাথ "বেণী" নামক ওস্তাদের কাছে ও বেণী গুপ্তের কাছে সঙ্গীতশিক্ষা করেন। ইংরেজী জীবনীর মতে, তিনি সঙ্গীতশিক্ষা করেন আহম্মদ খাঁ ও বেণী গুপ্তের কাছে এবং স্বামী শ্যামানন্দ-রচিত গ্রন্থমতে, বেণী গুপ্ত, আহম্মদ খাঁ, উজীর খাঁ, বড় ও ছোট দুন্নি খাঁ, কানাইলাল ঢেঁড়ী, জগন্নাথ মিশ্র, শঙ্কর প্রভৃতির কাছে।

স্বামীজীর সঙ্গীতশিক্ষা বিষয়ে অনুসন্ধানে যতদূর জানা গেছে তাতে মনে হয় যে উক্ত বেণী ওস্তাদই ছিলেন তাঁর প্রথম ও প্রধান সঙ্গীতগুরু। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও প্রমথনাথ বসু-প্রদত্ত বিবরণে একথার সমর্থন পাওয়া যায়। স্বামী শ্যামানন্দও এ প্রসঙ্গে বর্তমান লেখককে বলেছিলেন যে, বিবেকানন্দ স্বামীর প্রথম সঙ্গীতশিক্ষা হয়েছিল বেণী-ওস্তাদের কাছে।

বেণী ওস্তাদের সঙ্গীতজীবনের সম্পূর্ণ পরিচয় এবং তাঁর জীবনকালের সন তারিখ জানা যায় না। ওস্তাদ কথাটি তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকায় বোঝা যায় যে, তিনি সঙ্গীত-বিষয়ে বিশেষ কৃতবিদ্য ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে কিছু তথ্য এখানে দেওয়া হ'ল। তিনি ছিলেন উত্তর কলকাতার

দর্জিপাড়া অঞ্চলের বাসিন্দা, মসজিদবাড়ী স্ট্রীটে তিনি বাস করতেন। তাঁর বাসস্থলের অতি নিকটে ছিল বিখ্যাত সৌখিন কুস্তিগীর অম্বিকাচরণ গুহ (সুপ্রসিদ্ধ গোবরবাবুর পিতামহ) মহাশয়ের কুস্তির আখড়া। নরেন্দ্রনাথ অম্বু গুহের এই আখড়ায় ব্যায়ামচর্চা করতে যেতেন। সেখান থেকেই তিনি সম্ভবত বেণী ওস্তাদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং নিয়মিতভাবে ওস্তাদের কাছে যাতায়াত করতেন। বেণী ওস্তাদের বাড়ীতে পশ্চিম থেকে কলকাতায় আগত বহু হিন্দু ও মুসলমান কলাবতের আগমন হত। তিনি তৎকালীন কল্‌কাতাপ্রবাসী সুপ্রসিদ্ধ খেয়ালগায়ক আহম্মদ খাঁর সব চেয়ে বিখ্যাত শিষ্য।

আহম্মদ খাঁ নামে একাধিক খেয়াল-সাধক কল্‌কাতায় এসেছিলেন। ইনি কোন্ আহম্মদ খাঁ বলা কঠিন। তবে মনে হয়, বেহালার বিখ্যাত খেয়ালগায়ক বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে আহম্মদ খাঁর শিষ্য ছিলেন, ইনি সেই ব্যক্তি।

বেণী ওস্তাদ শুধু সঙ্গীতের আসরেই খ্যাতনামা ছিলেন না। থিয়েটার-জগতেও তিনি ছিলেন সুপরিচিত। গিরিশচন্দ্র যখন স্টার থিয়েটারে অধ্যক্ষ সে সময় তিনি স্টার থিয়েটারের সঙ্গে বহুদিন সঙ্গীতাচার্যরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং গিরিশচন্দ্রের "দক্ষযজ্ঞ" (১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম অভিনয়), "নল-দময়ন্তী" (১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম অভিনয়) "চৈতন্যলীলা (১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম অভিনয়), "হীরার ফুল" (১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম অভিনয়), প্রভৃতি নাটকের গানে সুরসংযোজনা করেন।

পিতার কাছে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পরে নরেন্দ্রনাথ যে সব কলাবতের অধীনে শিক্ষালাভ করেন তাঁদের মধ্যে তাঁর প্রথম সঙ্গীতশিক্ষা হয় বেণী ওস্তাদের কাছে। বিশ্বনাথ দত্ত নরেন্দ্রনাথ এবং অমৃতলালকে একসঙ্গে বেণী ওস্তাদের কাছে সঙ্গীতশিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। অপর কলাবতদের তুলনায় বেণী ওস্তাদের কাছেই নরেন্দ্রনাথ বেশীদিন তালিম পেয়েছিলেন। পরে এই ওস্তাদ থিয়েটারের সঙ্গে ক্রমে অধিকতর সময় যুক্ত হয়ে পড়ায় নরেন্দ্রনাথ সম্ভবত আহম্মদ খাঁর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করতে পারেন। কিংবা বেণী ওস্তাদ হয়ত নরেন্দ্রনাথের প্রতিভাদর্শনে স্বেচ্ছায় আহম্মদ খাঁর কাছে তাঁর সঙ্গীতশিক্ষার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন, এমনও হতে পারে।

আহম্মদ খাঁর কাছে নরেন্দ্রনাথ কতদিন তালিম পেয়েছিলেন সে সব কথা সবিশেষ জানা যায় না। তিনি বেণী ওস্তাদের শিষ্য ছিলেন, এ কথাই সমধিক পরিচিত।

স্বামী শ্যামানন্দ উজীর খাঁকেও নরেন্দ্রনাথের অন্যতম সঙ্গীতগুরু বলে উল্লেখ করেছেন। তানসেনের কন্যা-বংশীয় সঙ্গীতসাধক—আমীর খাঁর পুত্র এবং দবীর খাঁর পিতামহ—রামপুর ঘরানার উজীর খাঁ কল্‌কাতার সঙ্গীতজ্ঞ-মহলে সুপরিচিত ছিলেন। গত শতকের চতুর্থ পাদে তিনি এখানে এসে প্রায় দু বছর অবস্থান করেছিলেন। তাঁর তৎকালীন বাঙ্গালী শিষ্যবর্গের মধ্যে ছিলেন—সুরশৃঙ্গার-বাদক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভবানীপুর), সুর-বাহার বাদক যাদবেন্দ্র নন্দন মহাপাত্র (পঞ্চেৎগড়), ক্লারিওনেট-বাদক অমৃতলাল দত্ত (শিমুলিয়ার হাবু দত্ত) প্রভৃতি। সম্ভবত জ্ঞাতিভ্রাতা অমৃতলালের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথও উজীর খাঁর কাছে কখনো কখনো গিয়েছিলেন। কিন্তু উজীর খাঁর যে তিনি শিষ্য ছিলেন, তা অন্য কোন সূত্রে জানা যায় না। উজীর খাঁর শিষ্যসংখ্যা মুষ্টিমেয় এবং তাঁর মণ্ডলী অতি সীমাবদ্ধ ছিল। সে কারণে, তাঁর কাছে যাঁরা সঙ্গীত শিক্ষা করেন তাঁরা চিহ্নিত থাকতেন উজীর খাঁর শিষ্য বলে। নরেন্দ্রনাথের নাম তাঁর শিষ্যরূপে সঙ্গীতজ্ঞ-মহলের শ্রুতিস্মৃতিতে নেই। তা ছাড়া, উজীর খাঁ সম্ভবত ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কল্‌কাতা আসেন নি। এই সব কারণে মনে হয়, নরেন্দ্রনাথ উজীর খাঁর শিষ্য ছিলেন না।

নরেন্দ্রনাথের আর একজন সঙ্গীতশিক্ষক বলে কথিত কানাইলাল ঢেঁড়ী ছিলেন গয়ার বিখ্যাত এস্‌রাজ-বাদক এবং সেনী ঘরানার বাসৎ খাঁর শিষ্য-বংশীয়। তিনি শিমলা অঞ্চলে আপন গৃহে দীর্ঘকাল বাস করেন এবং সে সময় কল্‌কাতায় তাঁর অনেক বাঙ্গালী শিষ্য গঠিত হয়েছিল। হাবু দত্তও তাঁর কাছে এস্রাজে সঙ্গীতশিক্ষা করেছিলেন বলে প্রকাশ। কানাইলাল ঢেঁড়ীর আর একজন কৃতী শিষ্য ছিলেন (মধু রায় লেন-নিবাসী) কালিদাস পাল, পরে ইনি স্বরদী করমতুল্লা খাঁ সাহেবের শিষ্যরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর অবনীন্দ্রনাথ, অরুণেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরও প্রথম যৌবনে ঢেঁড়ীজীর কাছে এস্রাজ-বাদন শিক্ষা করেছিলেন।[২০] নরেন্দ্রনাথ হাবু দত্তের সঙ্গে হয়ত কানাইলাল ঢেঁড়ীর কাছে যেতেন। ঢেঁড়ীজীর কাছে তিনি নিয়মিত শিক্ষা করেছেন এমন মনে হয় না। কারণ, তিনি এস্রাজ-বাদক ছিলেন না, যদিও এস্রাজযন্ত্র-বিষয়ে তাঁর ধারণা ছিল,

এ কথা তাঁর রচিত পুস্তিকা (পরিশিষ্টে উদ্‌ধৃত) থেকে বোঝা যায়। এস্রাজসম্পর্কে তাঁর এই জ্ঞান অমৃতলালের এস্রাজচর্চা থেকেও তিনি লাভ করে থাকতে পারেন।

বড় ও ছোট দুন্নি খাঁর সম্পর্কেও একই কথা মনে হয়। অর্থাৎ দুই দুন্নি খাঁও হাবু দত্তের অন্য ওস্তাদ ছিলেন এবং সেই সূত্রে নরেন্দ্রনাথ সম্ভবত দুন্নি খাঁদের কাছে যাতায়াত করেছেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, বিখ্যাত টপ্পাগায়ক (রাণাঘাটের) নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বড় ও ছোট দুন্নি খাঁর কাছে কিছু গান পেয়েছিলেন।

এমনি ভাবে দুন্নি খাঁ, জগন্নাথ মিশ্র, শঙ্কর প্রভৃতির কাছে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীতশিক্ষার বিষয়ে "শ্রীবিবেকানন্দ-কাব্যগীতি"র উক্তির কোন সমর্থন অন্য কোন সূত্রে পাওয়া যায় না। মনে হয় উক্ত ওস্তাদদের কাছে তিনি উল্লেখ-যোগ্য সঙ্গীতশিক্ষা করেন নি।

বেণী ওস্তাদের কাছে যখন নরেন্দ্রনাথ নিয়মিত সঙ্গীতশিক্ষা করতেন, সে সময় হয়ত কল্‌কাতার নানা কলাবতদের কাছে নরেন্দ্রনাথ যাতায়াত করতেন। সে জন্যে তাঁর এত গুণীদের কাছে সঙ্গীতশিক্ষার কথা উক্ত গ্রন্থের লেখকের মনে হয়েছে। আসলে, নরেন্দ্রনাথ বেণী ওস্তাদ ও আহম্মদ খাঁ ভিন্ন পূর্বোক্ত কারুরই রীতিমত সঙ্গীতশিষ্য ছিলেন এমন কোন প্রমাণাদি পাওয়া যায় নি।

তবে স্বামী শ্যামানন্দ যে তাঁর একাধিক সঙ্গীতযন্ত্রে অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন, সে কথায় সত্য আছে। নরেন্দ্রনাথ মৃদঙ্গবাদনে পারদর্শী ছিলেন এবং তবলা ও খোল বাজাতে পারতেন। এ প্রসঙ্গে কিছু পরেই আলোচনা করা হবে।

তাঁর লিখিত (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) সঙ্গীতবিষয়ক রচনাটি থেকেও বোঝা যায় যে, সেতার, এস্‌রাজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে তাঁর প্রাথমিক জ্ঞান ছিল। তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা অমৃতলাল এবং শেষোক্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ (তমু বাবু) দুজনেই বাদ্যযন্ত্র-বিশারদ ছিলেন। অমৃতলাল ক্ল্যারিওনেট ও এস্‌রাজ ভিন্ন সুরবাহার ও বীনও বাজাতেন এবং তমুবাবুরও (সুরেন্দ্রনাথ দত্ত) একাধিক তারের যন্ত্রে পারদর্শিতা ছিল। আর তাঁরা দুজনেই থাকতেন গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটের দত্তবাড়ীতে। সেজন্যে নরেন্দ্রনাথের বিভিন্ন তারের যন্ত্র-বিষয়ে জ্ঞানলাভে সহায়তা হয়েছে, একথা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না।

এবার নরেন্দ্রনাথের সঙ্গত-যন্ত্রের অর্থাৎ পাখোয়াজ, বাঁয়া-তবলা ইত্যাদি চর্চার বিষয়ে উল্লেখ করতে হয়। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথের একটি (৮ সংখ্যক) উদ্‌ধৃতি থেকে দেখা গেছে যে, তিনি তাঁর জননীর মুখে শুনেছিলেন যে, নরেন্দ্রনাথের অন্যতম সঙ্গীতগুরু ছিলেন কাশীচন্দ্র ঘোষাল।

কিন্তু কাশীচন্দ্রের পাখোয়াজবাদন-সম্পর্কে কিংবা তাঁর সংগীতগুরু প্রভৃতি বিষয়ে কিছু জানা যায় না। তবে একজন কাশীচন্দ্র ঘোষালের পরিচয় পাওয়া যায় ব্রহ্মসঙ্গীত-রচয়িতারূপে। তিনি অনেকগুলি ধ্রুপদাঙ্গের ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন এবং তাঁর কয়েকটি গান প্রসিদ্ধি লাভ করে ও ব্রহ্মসঙ্গীত-সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। যথা, "শিবসুন্দর অমিয়সাগর হৃদয়ানন্দকারী" (দেশ মিশ্র, একতালা), "দিয়েছ নিয়েছ ভালই করেছ" (কানাড়া একতালা), "ব্রহ্ম নাথপ্রেমসুধাসাগরে", ইত্যাদি। কিন্তু তিনি আদি সমাজের ছিলেন না, ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। তা ছাড়া, এই ব্যক্তির কল্‌কাতায় আসবার যে সময় (১৮৯২ খৃষ্টাব্দে) শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উল্লেখ করেছেন, তাতে তাঁর কাছে নরেন্দ্রনাথের পাখোয়াজশিক্ষা সম্ভব হতে পারে না এবং ইনি পাখোয়াজবাদকরূপেও পরিচিত ছিলেন না।[১১] এই সব কারণে, কাশীচন্দ্র ঘোষালের কাছে নরেন্দ্রনাথের পাখোয়াজশিক্ষা-সম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভব নয়। তাঁর পাখোয়াজশিক্ষার কথা অন্যত্র যা পাওয়া যায়, কিছু পরেই তা উল্লেখ করা হবে।

নরেন্দ্রনাথ যে ভাল পাখোয়াজ-বাদক ছিলেন, একাধিক পুস্তকে তার উল্লেখ আছে। জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত তিনি সঙ্গীতচর্চা একেবারে ত্যাগ করেন নি, এ কথা সুবিদিত। গান গাইতেই তিনি বেশি ভালবাসতেন এবং বেলুড় মঠে জীবনের শেষ পর্বেও মাঝে মাঝে গান করতেন। তেমনি কখনো কখনো অপরের গানের সঙ্গতে পাখোয়াজও বাজাতেন। তাঁর হাতের সেই পাখোয়াজটি বেলুড় মঠে তাঁর স্মৃতিমন্দিরে রক্ষিত আছে তাঁর পাখোয়াজবাদনের স্মারক -রূপে।

গ্রন্থশেষে মুদ্রিত নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীতবিষয়ক সুদীর্ঘ রচনাটিতে পাখোয়াজ ও তবলা -বিষয়ে তাঁর রীতিমত অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাল, লয়, সঙ্গত এবং সঙ্গতের বোল্ ইত্যাদি বিষয়ে যে বিস্তৃত কারিকা ও নির্দেশ দিয়েছেন তাতে পরিষ্কার ধারণা হয় যে, সঙ্গত-বিষয়ে তাঁর তত্ত্বজ্ঞান ও ক্রিয়াসিদ্ধ অভিজ্ঞতা দু-ই ছিল।

তাঁর পাখোয়াজশিক্ষা-সম্বন্ধে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত কাশীচন্দ্র ঘোষালকে তাঁর সম্ভাব্য সঙ্গীতশিক্ষক বলেছেন (উল্লিখিত ৮ সংখ্যক উদ্ধৃতি)। কিন্তু অন্যত্র তিনিই আবার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন,— "শ্রীমহেন্দ্রনাথ বলেন যে, নরেন্দ্রনাথ বেণী ওস্তাদের বাড়ীতে পাখোয়াজ শিখতেন। সেজন্যই তাঁর কোন পাখোয়াজ আমরা আমাদের বাড়ীতে দেখিনি।"[১২]

এখানে বেণী ওস্তাদের বাড়ীতে নরেন্দ্রনাথের পাখোয়াজ শেখবার কথা বলা হয়েছে। বেণী ওস্তাদের বাড়ীতে শেখা বলতে বেণী ওস্তাদের কাছেই বোঝায়। কিন্তু বেণী পাখোয়াজ-বাদক ছিলেন না, গায়ক বলেই তিনি সুপরিচিত। সেজন্যে তাঁর কাছে নরেন্দ্রনাথের পাখোয়াজশিক্ষা হয়েছিল কি না সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে অনেক গায়কও পাখোয়াজ-বাদক হতে পারেন এবং বেণী পাখোয়াজ-বাদক হলে নরেন্দ্রনাথের তাঁর কাছে পাখোয়াজশিক্ষা হতেও পারে। অন্য কোন সূত্রে নরেন্দ্রনাথের পাখোয়াজ-শিক্ষকের নাম জানা যায় না।

তাঁর প্রথম সঙ্গীতগুরুর নামের প্রসঙ্গে একটু বক্তব্য আছে। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ তাঁকে উল্লেখ করেছেন "বেণী" ও "বেণী ওস্তাদ" বলে এবং অপর তিনটি জীবনীতে রয়েছে—"বেণী গুপ্ত"। বেণী ওস্তাদের এই পদবীটি যথার্থ কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হয়।

গিরিশচন্দ্রের একটি নিবন্ধের প্রয়োজনীয় অংশ এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা হল: "স্টারে 'চৈতন্যলীলা'র সময় থেকে যতগুলি ধর্মসম্বন্ধীয় নাটক অভিনীত হয়, তাহার গীতগুলি সুর তালে সংযোজিত করিবার ভার সঙ্গীতাচার্য স্বর্গীয় বেণীমাধব অধিকারী গ্রহণ করেন। ইনি রামায়েৎ বৈষ্ণব; সুপ্রসিদ্ধ গায়ক আহম্মদ খাঁর প্রধান ছাত্র ও শহরে একজন উচ্চশ্রেণীর গায়ক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বৈষ্ণবী ঢঙ্‌য়ে নৃত্য ইঁহার দ্বারাই প্রথম প্রবর্তিত হয়। খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী বিনোদিনী, নিম্নশ্রেণীর অভিনেত্রীগণের শিক্ষাপ্রদানে অধিকারী মহাশয়ের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।"[১৩]

বেণী ওস্তাদের নামের বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের উক্তি সব চেয়ে গ্রহণযোগ্য। কারণ, তিনি বেণীমাধবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। বেণীমাধব অধিকারী নামটিই যথার্থ মনে হয়। এ বিষয়ে আরো একটি সমর্থক বিবৃতি দিয়ে বেণীমাধবের প্রসঙ্গ শেষ করা হবে। গিরিশচন্দ্রের নাটকরচনার শ্রুতিলিপিকার, তাঁর প্রামাণিক জীবনী-রচয়িতা এবং গিরিশচন্দ্রের থিয়েটার

জীবনের সঙ্গে দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন,—"সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য বেণীমাধব অধিকারী 'দক্ষযজ্ঞে'র গানগুলির সুমধুর সুর সংযোজনা করিয়াছিলেন।"[১৪]

এই অধ্যায়ের উপসংহারে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীতশিক্ষার বিষয়ে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত করা হল :—

১। তাঁর ওস্তাদের কাছে নিয়মিত সঙ্গীতশিক্ষা তিন চার বছর হয়েছিল। সম্ভবত ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ থেকে তাঁর এই সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ হয়।

২। রায়পুরে থাকবার সময় কিশোরবয়সে (১৩।১৪ বছরে) পিতার কাছে সঙ্গীতের প্রথম পাঠ নেন। পরে কল্‌কাতায় এসে রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষা করেন। প্রথম সঙ্গীতগুরু ছিলেন বেণীমাধব অধিকারী, ওস্তাদ আহম্মদ খাঁর শিষ্য। তাঁর দ্বিতীয় ওস্তাদ্ হলেন—উক্ত আহম্মদ খাঁ।

৩। বেণীমাধবের কাছে ও আহম্মদ খাঁর কাছে কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষা করলেও সঙ্গীতবিষয়ে কৌতূহলী হয়ে কানাইলাল ঢেঁড়ী, বড় ও ছোট দুন্নি খাঁ প্রভৃতির কাছে তাঁর যাতায়াত ছিল এবং তার ফলে সঙ্গীতে তাঁর ব্যুৎপত্তিলাভে সহায়তা হতে পারে।

৪। শিক্ষার সময় প্রতিভার পরিচয় দেন ও শিক্ষকের প্রিয়পাত্র হন।

৫। পাখোয়াজ তিনি ভালভাবে শিক্ষা করলেও কার কাছে পাখোয়াজ শিক্ষা করেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না।

৬। বিভিন্ন যন্ত্রসঙ্গীতে পারদর্শী দুই জ্ঞাতিভ্রাতা অমৃতলাল ও সুরেন্দ্রনাথ (তমুবাবু) তাঁর সঙ্গে একই গৃহে অবস্থান করায় সঙ্গীতের যে পরিবেশ সৃষ্ট হয়, তাতে তাঁর সঙ্গীতচর্চায় বহুদর্শিতা জন্মায় এবং বিশেষ করে বিভিন্ন যন্ত্রসঙ্গীত -বিষয়ে জ্ঞানলাভে সহায়তা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী :—

(১) Swami Vivekananda—Patriot-Prophet, page 89, footnote —Dr. B. N. Datta দ্রষ্টব্য।

(২) শ্রীবিবেকানন্দ-কাব্যগীতি, পৃঃ ৫৪—স্বামী শ্যামানন্দ।

(৩) বিবেকানন্দ-চরিত, পৃঃ ৩৫, ৪র্থ সং—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

(৪) Swami Vivekananda—Patriot-Prophet, p. 138—Dr. B. N. Datta দ্রষ্টব্য।

(৫) Swami Vivekananda—Patriot-Prophet. p. 153—Dr. B. N. Datta দ্রষ্টব্য।

(৬) শ্রীবিবেকানন্দ-কাব্যগীতি, পৃঃ ৭৫—স্বামী শ্যামানন্দ।

(৭) স্বামী বিবেকানন্দ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৭৫—প্রমথনাথ বসু।

(৮) Swami Vivekanada—Patriot-Prophet, p.155—Dr. B. N. Datta দ্রষ্টব্য।

(৯) Life of Swami Vivekananda by his Eastern & Western Disciples, 4th ed., p. 25—Published by Advaita Ashram, Mayavati দ্রষ্টব্য।

(১০) ঘরোয়া, পৃঃ ৪—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(১১) আত্মজীবনী, তৃতীয় সংস্করণ, ৪৪৮ পৃঃ—শিবনাথ শাস্ত্রী।

(১২) Swami Vivekananda—Patriot-Prophet, appendix, p 419—Dr. B. N. Datta দ্রষ্টব্য।

(১৩) নাট্যমন্দির (মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত) পৃঃ ৭-৮, ভাদ্র ১৩২১। গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখিত "দেশীয় নাট্যশালায় নৃত্যলীলা"।

(১৪) গিরীশচন্দ্র, পৃঃ ২৭৮—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

গায়করূপে খ্যাতিপ্রতিপত্তি

রীতিমত চর্চা ও সাধনায় মেধাবী নরেন্দ্রনাথ কৃতবিদ্য সঙ্গীতজ্ঞ হলেন। তিনি সঙ্গীতশাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞ এবং ক্রিয়াসিদ্ধ দুই হয়েছিলেন। প্রথমোক্ত গুণের পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর (পরিশিষ্টে পঠিতব্য) সঙ্গীতবিষয়ক রচনাটিতে।

ওস্তাদ্‌দের কাছে যখন তাঁর শিক্ষা ও যাতায়াত চল্‌চে, তখন থেকেই তিনি পরিচিতমহলে গায়করূপে সুনাম অর্জন করেন। ১৮৮০।৮১ খৃষ্টাব্দেই তিনি যে ধ্রুপদগায়ক-রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করতে আরম্ভ করেন তার উল্লেখ একাধিক স্থানে পাওয়া যায়। সে সময়ে তাঁর সঙ্গীতশিক্ষাপর্ব শেষ হয় নি. দু'এক বছর আগে আরম্ভ হয়েছে। তখন তাঁর বয়স আঠারো উনিশ বছর মাত্র। অন্যান্য বিষয়ের মতন সঙ্গীতক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করেছিল।

আগের অধ্যায়ে বলা হয়েছে, তাঁর শিক্ষাপর্ব খুব সম্ভব ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই শেষ হয়। ১৮৮৩র আগে থেকেই তাঁর অন্তর্জীবনের গতি ভিন্ন পথে ধাবিত হ'তে থাকে। তাঁর জীবনের এই পর্বটির কথা চিন্তা করলে বেশ বোঝা যায় যে, ওই সময়ের পর তাঁর পক্ষে সঙ্গীতশিক্ষায় নিবিষ্ট থাকা আর সম্ভব ছিল না। তবে সঙ্গীত-চর্চা যে একেবারে ত্যাগ করেন নি, সেকথা বলা বাহুল্য। তাঁর জীবনের এই গতিপরিবর্তনের কথা পরে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে। এখন তাঁর কলেজ-জীবনের সঙ্গীতপ্রসঙ্গ।

কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে তিনি পাখোয়াজ ও তবলাও শিক্ষা করেছিলেন বটে, কিন্তু গানেই তাঁর প্রতিভা সমধিক স্ফূর্তিলাভ করে।

তাঁর জীবনীলেখক যথার্থই বলেছেন, "তিনি বাজাইতেও বেশ শিখিয়াছিলেন। কিন্তু সঙ্গীতেই তাঁহার বিশেষ দক্ষতাপ্রকাশ পাইয়াছিল।"[১]

এখানে "সঙ্গীত" বলতে কণ্ঠসঙ্গীতই বোঝানো হয়েছে। পূর্ব অধ্যায়ের ৯ সংখ্যক উদ্‌ধৃতিতেও দেখা গেছে—"Naren. ··· could play many instruments, though he excelled in songs."

সঙ্গীতজীবনের প্রায় প্রথম থেকেই তিনি পরিচিত ও বন্ধুবান্ধব মহলে গায়করূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তাঁর গানের গুণ-মুগ্ধ চক্রের পরিধি ক্রমে বিস্তৃত হতে থাকে। এমন কি অনেক স্থলে এ সময়ে তাঁর প্রধান পরিচয় ছিল তাঁর গান। শ্রোতৃবৃন্দ তাঁর গান শুনে পরিতৃপ্ত এবং অভিভূত হয়েছে

এমন অনেক উদাহরণ পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে দেখতে পাওয়া যাবে। বর্তমান অধ্যায়েও এ বিষয়ে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হবে।

তাঁর গান যে শ্রোতাদের পরিতৃপ্ত করত তার কারণ, তিনি সঙ্গীতে রসসঞ্চার করতে পারতেন। সঙ্গীতের মূল কথা যে রসসৃষ্টি তা তিনি বিলক্ষণ অনুভব করতেন এবং সেজন্যেই তাঁর গান শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করত। তাঁর গানে গভীর আন্তরিকতা প্রকাশ পেত। তিনি গান গাইতেন যথোচিত ভাব দিয়ে, সেজন্যে তাঁর সঙ্গীত উৎসারিত হত অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে। পরের অধ্যায়ে তাঁর গানের প্রসঙ্গে নানা বিবরণ থেকে তার দৃষ্টান্ত দেওয়া হবে। তাঁর গানের বিষয়ে যত বিবৃতি পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁর গান শ্রোতাদের মন গভীরভাবে স্পর্শ করেছে।

তাঁর কণ্ঠস্বরও বিশেষ হৃদয়গ্রাহী ছিল। তিনি সুকণ্ঠ ছিলেন এই বললেই তাঁর কণ্ঠের সম্যক পরিচয় দেওয়া হয় না। তাঁর কণ্ঠস্বর কী প্রকৃতির ছিল, সে বিষয়ে দুটি নির্ভরযোগ্য মন্তব্য ও বিবরণও পাওয়া যায়। একটি হল পাশ্চাত্য জগতের স্বনামধন্য মনীষী ও সঙ্গীতবিদ্ রমাঁ রলাঁর এবং আর একটি—স্বামীজীর সহোদর মহেন্দ্রনাথ দত্ত -কথিত।

এই দুটি বিবৃতি দেবার আগে স্বামীজীর কণ্ঠস্বর সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ আছে। তাঁর কণ্ঠস্বর সেকালে প্রচলিত ফনোগ্রাফ রেকর্ডে গৃহীত হয়েছিল। আমেরিকা ও ইউরোপ থেকে বিজয়গৌরবে প্রত্যাগমনের পর রামনাদে স্বামীজীর কণ্ঠস্বর রেকর্ড করা হয়েছিল রামনাদ-রাজের ব্যবস্থাপনায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই অতিশয় মূল্যবান ও ঐতিহাসিক রেকর্ডখানি সংরক্ষণের যথোপযুক্ত প্রচেষ্টা হয় নি। সে রেকর্ডটির বিলুপ্তি ঘটেছে! নচেৎ আজ স্বামীজীর কণ্ঠধ্বনির বর্ণনামাত্র পাঠ করে তৃপ্ত থাকতে হত না।

রমাঁ রলাঁ সাধারণভাবে স্বামীজীর কণ্ঠস্বর কেমন ছিল, তার বর্ণনা করেছেন—তাঁর গানের গলার কথা নয়। তা হলেও তাঁর মন্তব্য থেকে স্বামীজীর কণ্ঠের বৈশিষ্ট্য-বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা করা যায়। আরো একটি কারণে রমাঁ রলাঁর এই বিবৃতি উল্লেখযোগ্য। তা হল, মাদাম কাল্ভের মতন গায়িকার মন্তব্যও এই বিবরণের মধ্যে আছে। মাদাম কাল্ভে নিশ্চয় স্বামীজীর গান শুনেছিলেন, নচেৎ তাঁর কণ্ঠস্বরের এমন সাঙ্গীতিক ধরণের বর্ণনা করতেন না!

মহেন্দ্রনাথ দত্তের বিবরণ থেকে স্বামীজীর গান গাইবার সময়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। সেজন্যে এই দুটি বিবৃতি যুক্ত করে দেখলে ধারণা করা যায় যে, স্বামীজীর গানের কণ্ঠ কেমন ছিল। গায়কমহলে যাকে বলে 'জোয়ারীদার" গলা, স্বামীজীর ছিল তাই। তাঁর কণ্ঠে—গায়কের অন্যতম প্রধান সম্পদ—জোয়ারী ছিল এবং তাঁর স্বর ছিল পুরুষোচিত গম্ভীর ও গভীর।

স্বামীজী যখন চিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনে প্রথম বক্তৃতা (১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর) করতে দাঁড়ান, সেই প্রসঙ্গ-বর্ণনায় রমাঁ রলাঁ তাঁর কণ্ঠস্বরের উল্লেখ করেছেন। রলাঁর লেখার প্রয়োজনীয় অংশটুকুমাত্র এই স্থানে অনূদিত অবস্থায় উদ্‌ধৃত করা হল ঃ—

"…বক্তৃতা আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ঐশ্বর্যময়, গভীর* কণ্ঠস্বর অধিকার করে ফেল্‌লে বিপুল মার্কিনী এ্যাংলো-স্যাক্সন্ শ্রোতৃমণ্ডলীকে, যারা তাঁর বর্ণের জন্যে প্রথমে তাঁর প্রতি বিরাগ পোষণ করেছিল।…"

রমাঁ রলাঁ এবং বিশেষ করে মাদাম কাল্‌ভের এই পুঙ্খানুপুঙ্খ স্বর-পরিচিতি থেকে বোঝা যায় যে, যাকে 'জোয়ারীদার' কণ্ঠ বলে, স্বামীজী তারই অধিকারী ছিলেন।…

মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর গান গাইবার সময়ের একটি সংক্ষিপ্ত ও মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন। এ হল ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের কথা। তার এক বছর আগে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছে। তার ফলে, সাংসারিক ও আর্থিক বিপর্যয়ে নরেন্দ্রনাথ বিশেষ বিপন্ন। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় বৌবাজারে আর একটি (মেট্রোপোলিটান) স্কুল স্থাপন করেন এবং মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের ("শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত"-প্রণেতা "শ্রীম" বা "মাস্টারমশায়") উদ্‌যোগে নরেন্দ্র তার প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। কিন্তু আইন কলেজে পাঠ, বাড়ীর

* তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল (মিস্ জোসেফাইন ম্যাক্‌লিয়ড এ কথা আমায় বলেছিলেন) ভায়লেনসেলোর মতন চমৎকার, গম্ভীর হলেও তার মধ্যে প্রবল বিসদৃশ কিছু ছিল না—তা ছিল গভীর স্পন্দনে ভরা, যা সভাস্থল এবং শ্রোতৃবৃন্দের অন্তঃস্থল পূর্ণ করে তুলত। শ্রোতাদের একবার শোনাবার সুযোগ পেলে তিনি কণ্ঠস্বরকে এমন গভীর খাদে নিমগ্ন করতে পারতেন যে তাঁর শ্রোতৃবর্গের অন্তর পর্যন্ত বিদীর্ণ হত! এম্মা কাল্‌ভে, যিনি তাঁর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তাঁর কণ্ঠধ্বনির এইভাবে বর্ণনা করেন যে, তা ছিল খাদ ও তীব্র স্বরের চমৎকার মধ্যবর্তী এবং চীনা কাঁসরের মতন কম্পনময়।"

অধিকার নিয়ে জ্ঞাতিদের সঙ্গে মামলা এবং আরো নানা দায়দায়িত্বের জন্যে সময়াভাবে প্রধান শিক্ষকের কার্যটি কিছুদিন পরে ত্যাগ করেন। এই কার্য ছেড়ে দেবার পর তিনি অনেক সময় বিষণ্ণ হয়ে থাকতেন। সে সময় 'মাস্টার মহাশয়' অর্থাৎ (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্যামপুকুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক) মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে তাঁর কাছে আসতেন তাঁর মন প্রফুল্ল রাখবার জন্যে।

সেই সময় তাঁরা দুজনে গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটের বাড়ীর বাইরের ঘরে বসে গীতগোবিন্দের গানগুলি ও অন্যান্য ভজন গাইতেন। মহেন্দ্রনাথ বলেন, "মাষ্টার মশায়ের বাড়ী অনতিদূরে, এইজন্য মাষ্টার মশায় নরেন্দ্রনাথের কাছে সর্বদাই আসিতেন এবং বাহিরের ঘরটিতে তক্তাপোষের উপর বসিয়া দুজনে ভজন গান সুরু করিতেন। নরেন্দ্রনাথের গলার-স্বর মোটা ও খাদে, মাষ্টার মশায়ের গলার স্বর মৃদু ও ললিত, অর্থাৎ একজনের হইল 'খাদ সুর', অপরের হইল 'মেয়েলী সুর'। দুইজনের কণ্ঠস্বর মিশ্রিত হইয়া এক মধুর শব্দ নিঃসৃত হইত এবং তক্তপোষ থাপড়াইয়া নরেন্দ্রনাথ তাল দিত।"[৩]

এই দুটি বিবরণ থেকে তাঁর কণ্ঠস্বরের মোটামুটি পরিচয় পাওয়া গেল।

আগে বলা হয়েছে, নিয়মিত সঙ্গীতচর্চা করবার সময় থেকেই তিনি গায়করূপে চিহ্নিত হয়েছিলেন। নানাপ্রকার জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি সঙ্গীতেও তিনি অল্প বয়স থেকে প্রতিভার পরিচয় দেন। শিক্ষাপর্ব অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে সুকণ্ঠ গায়ক রূপে তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হতে দেখা যায়। বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত -মহলে, কলেজে এবং ব্রাহ্মসমাজে, সর্বত্র তিনি প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করতে থাকেন শিক্ষার্থীজীবনেই। তিনি প্রধানত ধ্রুপদ-গায়করূপে সুপরিচিত ও সম্মানিত হয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে তাঁর এক জীবনী-লেখক বলেছেন,—"যেখানে যাইতেন সেখানেই গান গাহিতে অনুরুদ্ধ হইতেন, সকলেই তাঁহাকে ওস্তাদের ন্যায় খাতির যত্ন করিত এবং সঙ্গীতসম্বন্ধে তাঁহাকে একজন 'অথরিটি' (প্রমাণ-স্বরূপ) বলিয়া গণ্য করিত।......

"জেনারেল এ্যাসেম্ব্লীজ্ কলেজের ছাত্রেরা প্রায়ই দল বাঁধিয়া তাঁহার গান শুনিতে বসিত। একদিন একজন ইংরাজ অধ্যপক ক্লাসে আসিতে কিছু দেরি করিয়া ফেলিয়াছিলেন, ক্লাসে প্রায় দুইশত ছাত্র ছিল। অধ্যাপক আসিতে বিলম্ব আছে মনে করিয়া তাহারা নরেন্দ্রকে একটি গান গাহিতে

অনুরোধ করিল, কারণ সময়টা তাহা হইলে বেশ কাটে। নরেন্দ্র গাহিতে আরম্ভ করিলেন আর সকলে নীরব হইয়া শুনিতে লাগিল। ইতিমধ্যে অধ্যাপক ক্লাসের নিকটে আসিয়া মনোহর সঙ্গীত-শ্রবণে স্তব্ধ হইয়া দরজার পার্শে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং গান থামিলে সহর্ষবদনে ক্লাসে প্রবেশ করিলেন। ক্লাসে প্রবেশ করিয়া তিনি গায়কের খুব প্রশংসা করিলেন, অবশ্য তাঁহার নাম কেহ তাঁহাকে বলিল না।···

"পাঠক দেখিবেন স্বয়ং পরমহংসদেবও নরেন্দ্রের এই সুকণ্ঠের সঙ্গীতে একদিন মুগ্ধ হইয়া ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন ও সমাধিস্থ হইয়াছিলেন।······

"বন্ধুবর্গের নিকট অবস্থানকালে নরেন্দ্র প্রায়ই সঙ্গীত দ্বারা তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিতেন। তাহারাও 'এন্‌কোর' 'এন্‌কোর' ('চলুক চলুক') ধ্বনিতে তাঁহাকে এক মুহূর্ত বিশ্রামের অবকাশ দিতেন না। তিনি উৎসাহে অধীর হইয়া ক্রমশঃ গানে তন্ময় হইয়া পড়িতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোথা দিয়া চলিয়া যাইত কেহ টের পাইতেন না।"[৪]

তাঁর গায়কজীবনের প্রথম সময়কার একটি সংবাদ আছে। তাঁদের গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটের বাড়ীতে বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার বাস করায়, তাঁর লেখাপড়া ও সঙ্গীতচর্চা করবার অসুবিধা হ'ত। সেজন্যে তিনি মাতামহীর ৭, রামতনু বসু লেনের বাড়ীর দোতলার একটি ছোট ঘরে থাকতেন গান ও লেখাপড়া করবার সুবিধার জন্যে। তাঁর একটি প্রমাণিক জীবনীতে এই ঘরখানির বিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায়:—"বি. এ. পড়িবার সময় নরেন্দ্র রামতনু বসুর লেনের স্বীয় মাতামহীর ভবনে তাঁহার পাঠগৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিলেন। আত্মীয়, পরিজন ও অন্যান্য লোকের সমাগমে পিতৃভবন সর্বদা কলরবে মুখরিত থাকিত বলিয়া তাঁহার পড়াশুনার বিশেষ ব্যাঘাত হইত। এই কক্ষে ধনীর সন্তান হইয়াও নরেন্দ্রনাথের সামান্য শয্যায় কতকগুলি পাঠ্য পুস্তক. একটি তানপুরা ও তামাক খাইবার সরঞ্জাম ব্যতীত অন্য কোন তৈজসপত্র ছিল না।"[৫]

নরেন্দ্রনাথের অনেক দিনের বাস ও সঙ্গীতচর্চার স্মৃতি এই ঘরখানির সঙ্গে জড়িত। শ্রীরামকৃষ্ণ রামতনু বসুর লেনের এই দোতলার ঘরখানিতে একাধিকবার পদার্পণ করেছিলেন। সে সময় নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হত। নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ কতখানি স্নেহ করতেন, কোন কারণে কয়েক দিন দক্ষিণেশ্বরে

উপস্থিত না হলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দেখ্‌বার জন্যে কি রকম ব্যাকুল হতেন এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে কল্‌কাতায় চলে আসতেন—এসব কথা তাঁদের জীবনী -পাঠকদের সবিশেষ জানা আছে। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

নরেন্দ্রনাথ ওই ঘরখানিতে থাকবার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ যে কয়েকবার এসেছিলেন, তার মধ্যে এক দিনের বিবরণে গানের প্রসঙ্গ আছে। সময়টি সম্ভবত ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে হবে, কারণ, নরেন্দ্রনাথের বি. এ. পরীক্ষা দেবার অব্যবহিত পূর্বের কথা এখানে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন সেখানে পদার্পণ করেন, তখন নরেন্দ্রনাথ তাঁর দুই বন্ধুর—হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও দাশরথি সান্যালের—সঙ্গে ঘরে বসে গল্প করছিলেন। এই বিবরণীর প্রয়োজনীয় অংশ উদ্‌ধৃত করা হল :—

"একদিন সকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন অনেক দিন তাঁহার নিকটে না যাওয়ায় তাঁহাকে দেখিবার জন্য রামলালের সঙ্গে কলিকাতায় নরেনের 'টঙে' আগমন করেন।"……নরেন্দ্রের কুশল সংবাদ নিয়ে, সঙ্গে-আনা সন্দেশ তাঁকে খাইয়ে "শ্রীরামকৃষ্ণ তৎপরে বলিলেন, 'ওরে তোর গান অনেকদিন শুনিনি, গান গা।' অম্‌নি তানপুর লইয়া তাহার কাণ মলিয়া সুর বাঁধিয়া নরেন্দ্রনাথ গান আরম্ভ করিলেন—

জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী,
(তুমি) ব্রহ্মানন্দস্বরূপিনী।
(তুমি) নিত্যা—নন্দস্বরূপিনী,
প্রসুপ্ত ভুজগাকারা আধার পদ্মবাসিনী। ইত্যাদি

গানও আরম্ভ হইল, শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবস্থ হইতে লাগিলেন। গানের সুরে সুরে মন ঊর্ধ্বে উঠিল, চক্ষে পলক নাই, বক্ষে স্পন্দন নাই…… ক্রমে মর্মর মূর্তির ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া নির্বিকল্প সমাধিস্থ হইলেন। নরেনের বন্ধুরা পূর্বে কোন মানুষের এরূপ ভাব দেখেন নাই। তাঁহারা এই ব্যাপার দেখিয়া মনে করিলেন, বুঝি বা শরীরে সহসা কোন পীড়া হওয়ায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা মহা ভীত হইলেন। দাশরথি জল আনিয়া তাঁহার মুখে সিঞ্চন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া নরেন্দ্র তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, 'জল দেবার দরকার নেই, উনি অজ্ঞান হন নি, ওঁর ভাব হয়েছে। আবার গান শুনতে শুনতেই জ্ঞান হবে এখন।'

"নরেন্দ্র এইবার শ্যামাবিষয়ক গান ধরিলেন, 'একবার তেম্‌নি তেম্‌নি

তেম্‌নি ক'রে নাচ মা শ্যামা।' শ্যামাবিষয়ক অনেক গানই হইল। গান শুনিতে শুনিতে রামকৃষ্ণ কখনও ভাবাবিষ্ট হইতেছেন, আবার কখন বা সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন। নরেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া গান গাহিলেন, অবশেষে গান শেষ হইলে রামকৃষ্ণ কহিলেন, 'দক্ষিণেশ্বরে যাবি? কদিন ত' যাসনি, চল্ না, আবার এখনি ফিরে আসিস।' নরেন্দ্র তখনই সম্মত হইলেন। পুস্তকাদি যেমন অবস্থায় পড়িয়াছিল তেম্‌নি পড়িয়া রহিল, কেবলমাত্র তানপুরাটি যত্নপূর্বক তুলিয়া রাখিয়া গুরুদেবের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন। বন্ধুরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।"[৬]

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাতে নরেন্দ্রনাথের গানের প্রসঙ্গ এত বেশি পাওয়া যায় যে, তার বিবরণ একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে দেওয়া হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয় হবার আগে থেকেই নরেন্দ্রনাথ শিমলা অঞ্চলে গায়করূপে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁদের প্রথম সাক্ষাতের সময় নরেন্দ্রনাথ গায়করূপেই তাঁর সামনে আনীত হন। সে সব কথা পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে।

কলেজ ও পরিচিত পরিপার্শ্বের গণ্ডীর বাইরে নরেন্দ্রনাথ সুগায়ক বলে যশ অর্জন করেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পর থেকে। তখন তাঁর নিয়মিত সঙ্গীতশিক্ষা খুব বেশিদিন আরম্ভ হয় নি। ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াতও তিনি কম বয়স থেকেই করেন। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল রচিত "নববৃন্দাবন" নাটকে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে অভিনয়ও করেছিলেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে তিনি তিনটি ব্রাহ্মসমাজেই—আদি, নববিধান ও সাধারণ—যাতায়াত করতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং সেখানকার রবিবারের উপাসনার সময় ধ্রুপদাঙ্গের গান গাইতেন।

নরেন্দ্রনাথ যখন ব্রাহ্ম-আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন, তখন বাংলা দেশে এক ঘোর আলোড়নের যুগ। উনিশ শতকের সেই দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় ভাবধারার ঘাত-প্রতিঘাতে বাঙ্গালী সমাজের একাংশে, বিশেষ শিক্ষিত যুবকদের মনোজগতে, যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটছে। সেই আলোড়নের অন্যতম ফল-স্বরূপ ব্রাহ্মসমাজের অগ্রগতি এবং শিক্ষা ও সামাজিক বিষয়ে আধুনিক চেতনালাভ হতে থাকে। দেশের শিক্ষিত তরুণসমাজের মধ্যে বৃদ্ধি পায় ব্রাহ্ম-আন্দোলনের জনপ্রিয়তা। এই যুগধর্মের প্রেরণায় ছাত্র নরেন্দ্রনাথ ও যুবসমাজে বিপুল

প্রভাবশালী কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসেন। প্রথমে কেশবচন্দ্রের দ্বারা আকৃষ্ট হলেও, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর তিনি তার সদস্য হন।

ব্রাহ্ম-আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগের কথা তাঁর অনুজ মহেন্দ্রনাথ দত্ত কয়েকস্থলে উল্লেখ করেছেন। যথা,—"কেশববাবু…'ব্যাণ্ড্ অব্ হোপ' (Band of Hope) নামে একটি দল গঠন করিলেন।…নরেন্দ্রনাথ সেই ব্যাণ্ড্ অব্ হোপ বা আশার দল-এ নাম লিখাইয়াছিল।"[৭]

"নরেন্দ্রনাথ ধ্রুপদ গান শিখিলে পর, সাধারণ সমাজের উপাসনার দিন, রাত্রে, মাঝে মাঝে ধ্রুপদ গান গাহিত। ব্রহ্মসঙ্গীতেও সে অল্পবয়সে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সাধারণ সমাজের কর্তৃপক্ষের সহিত নরেন্দ্রনাথের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী মশাই এক একদিন সকালে আমাকে গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটের বাড়ীর দরজায় আসিয়া আমায় ডাকিয়া বলিতেন,— তোমার দাদা নরেনকে, এই সব কথা বলো, ওখানে যেতে বলো, ইত্যাদি।"[৮]

"সাধারণ সমাজ, কেশববাবুর সমাজ প্রভৃতি অনেক জায়গায় সে যাতায়াত করিত।"[৯]

নরেন্দ্রনাথের বাড়ীতেও ব্রাহ্মসমাজের এক বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। তিনি হলেন তাঁর পিতার খুল্লতাত পুত্র তারকনাথ দত্ত। তারকনাথ একসময়ে উমানাথ গুপ্তের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। কেশবচন্দ্র যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে মতবিরোধিতার ফলে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন, তখন নরেন্দ্রনাথও কেশবচন্দ্রের সঙ্গে যোগ দেন।[১০]

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত একবার বর্তমান লেখককে বলেছিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও শিমলার এই দত্ত-বাড়ীতে এসেছিলেন এবং এবাড়ীর ঠাকুর-দালানে তাঁর তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং দেখা যায়, ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে তিনি প্রায় কিশোর বয়স থেকেই পরিচিত ছিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে নরেন্দ্রনাথের গায়করূপে সবিশেষ পরিচিতি ছিল। সেখানকার রবিবারের উপাসনা অনুষ্ঠানে তাঁর গান শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করত। প্রধানত তিনি ধ্রুপদাঙ্গের বাংলা গান (ব্রহ্মসঙ্গীত) গাইতেন।

তাঁর সাধারণ সমাজে যোগদান প্রসঙ্গে কনিষ্ঠ সহোদর ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ

দত্ত লিখেছেন,—"He became a member of the Sadharan Brahmo Samaj. . . . . .He used to sing in the choir of the church."[১১]

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে নরেন্দ্রনাথের কথায় স্বামী শ্যামানন্দ লিখেছেন,

"তাই যায় ব্রাহ্মদলে উপাসনা-কালে।
কিন্নরকণ্ঠেতে গান গায় সভাস্থলে ॥···
উপাসনা করিবারে সমাজেতে যায়।
ধ্যানস্থ হইয়া গান সকলে শুনায় ॥
উপাসনাকালে তারে বেদীতে বসায়ে।
ব্রাহ্মেরা সঙ্গীত শুনে লোচন মুদিয়ে ॥"[১২]

স্বামীজীর অপর দুজন জীবনীকারের বিবরণ থেকেও দুটি প্রাসঙ্গিক উক্তি এখানে উদ্‌ধৃত করা হ'ল :—

"ব্রাহ্মসমাজে···নরেন্দ্রনাথ রবিবাসরীয় উপাসনাকালে মধুরকণ্ঠে ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিয়া সভ্যগণের চিত্তবিনোদন করিতেন।"[১৩]

"স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম জীবনে ব্রাহ্মসমাজের একজন সুগায়ক ছিলেন। পরমহংসদেব তাঁহার গান শুনিয়া সমাধিলাভ করিতেন। বাস্তবিক তাঁহার গানের খ্যাতি অল্প নহে। তাঁহার স্বভাবের মধ্যেই এমন একটা মুক্ত সদাশিব ভাব বিরাজ করিত যাহাকে তাঁহার বন্ধু ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল শিল্পরসবোধসম্পন্ন সদাশিব ভাব বলিয়া নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন (artist nature and bohemian temperament)। যখন দার্শনিক সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়া তিনি সংশয়বাদে সমাচ্ছন্ন, তখন কেবল এক সঙ্গীতই তাঁহার নিকট অতীন্দ্রিয় রাজ্যের বার্তা বহন করিত।[১৪]

কলেজজীবনে সঙ্গীতচর্চা সম্বন্ধে আর দুটি বিবরণ পাওয়া যায়। প্রথমটি হল—একটি কৌতুককর ঘটনার উপসংহারে জনৈক বন্ধুর গৃহে অতি ভোরে তাঁর গান গাইবার কথা। এখানে তাঁর কণ্ঠে সময়োপযোগী রাগে ধ্রুপদাঙ্গ গানের উল্লেখ পাওয়া যায়—

"পরদিন প্রত্যুষে বন্ধুর বাসায় সূর্যোদয়ের পূর্বেই উপস্থিত হইয়া বন্ধুর ঘরের দ্বারে করাঘাত করিয়া গান ধরিলেন—

ভয়রোঁ—ঝাঁপতাল

অনুপম মহিমপূর্ণ ব্রহ্ম কর ধ্যান,
নিরমল পবিত্র উষাকালে।

ভানু নব তাঁর প্রেমমুখছায়া,
দেখ ঐ উদয়গিরি শুভ্র ভালে ॥
মধু সমীরণ বহিছে আজ শুভদিনে
তাঁর নাম গান করি অমৃত ঢালে ॥
চল সবে ভক্তিভাবে ভগবত-নিকেতনে
প্রেম-উপহার লয়ে হৃদয়-থালে ॥

নরেনের মধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া সহপাঠী শয্যা পরিত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিলেন।"[১৫]

আর একটি দিনের বিবরণ থেকে একদিকে যেমন জানা যায় যে সঙ্গীত তাঁর পাঠ্য পুস্তকের চেয়ে বহুগুণ প্রিয় ছিল, তেমনি তাঁর সেতারযন্ত্রে হাত দেবার, তবলা বাজাবার এবং নানা শ্রেণীর গান গাইবার প্রসঙ্গ এখানে আছে। এটি সেই রামতনু বসু লেনের ঘরখানির কথা।

"নরেন্দ্র আজ মনোনিবেশপূর্বক পাঠ করিতেছেন, এমন সময়ে কোন বন্ধুর আগমন হইল, বেলা তখন এগারটা। আহারাদি করিয়া নরেন্দ্র পাঠ করিতেছেন। বন্ধু আসিয়া নরেনকে বলিলেন 'ভাই, রাত্তিরে পড়িস, এখন দুটো গান গা' অমনি নরেন পড়িবার বই মুড়িয়া একধারে ঠেলিয়া রাখিলেন। তানপুরার জুড়ির তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে; সেতারের সুর বাঁধিয়া নরেন গান ধরিবার আগে বন্ধুকে বলিলেন, 'তবে বাঁয়াটা নে।' বন্ধু কহিলেন, 'ভাই আমি ত বাজাতে জানিনি, ইস্কুলে টেবিল চাপড়ে বাজাই বলে কি তোমার সঙ্গে বাঁয়া বাজাতে পারবো?' অমনি নরেন আপনি একটু বাজাইয়া দেখাইলেন ও বলিলেন, 'বেশ করে দেখে নে দিকি? পারবি বই কি, কেন পারবিনি? কিছু শক্ত কায নয়, এমনি করে কেবল ঠেকা দিয়ে যা, তা হলেই হবে।' সঙ্গে সঙ্গে বাজনার বোলটাও বলিয়া দিলেন। বন্ধু দুই একবার চেষ্টা করিয়া কোন রকমে ঠেকা দিতে লাগিলেন, গান চলিল। তান-লয়ে উন্মত্ত হইয়া ও উন্মত্ত করিয়া নরেনের হৃদয়স্পর্শী গান চলিল—টপ্‌পা, খেয়াল, টপখেয়াল, ধ্রুপদ; বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত। নূতন ঠেকার সময় নরেন এমনি সহজভাবে বোল সহ ঠেকাটি দেখাইয়া দেন যে একদিনে কাওয়ালী, একতালা, আড়াঠেকা, মধ্যমান, এমন কি সুর ফাঁকতাল পর্যন্ত তাহার দ্বারা বাজাইয়া লইলেন।...নরেন্দ্রের কিন্তু গানের কামাই নাই।

হিন্দী গান হইলে নরেন তাহার মানে বলিতেছেন ও তাহার অন্তর্নিহিত ভাবতরঙ্গের সহিত সুরলয়ের অপূর্ব ঐক্য দর্শাইয়া বন্ধুকে বিমোহিত করিতেছেন। দিন কোথা দিয়া চলিয়া গেল, সন্ধ্যা আসিল, বাড়ীর চাকর আসিয়া একটি মিট্‌মিটে প্রদীপ দিয়া গেল, ক্রমে রাত্রি দশটার সময় দুইজনের হুঁস হইলে সেদিনকার মত পরস্পর বিদায় লইয়া নরেন্দ্র পিত্রালয়ে ভোজনার্থ চলিয়া গেলেন, বন্ধু স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।"[১৬]

নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীতপ্রাণতা এবং সঙ্গীতে পারদর্শিতার এটি একটি সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নানা কারণে এই বিবরণী নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

জেনারেল এ্যাসেম্বলীজ্‌ ইনষ্টিটিউশন্‌-এ বি, এ, পাঠের সময় থেকে তাঁর মানসলোকে বিচিত্র এবং অভূতপূর্ব পরিবর্তনের সূচনা হয়। ব্রাহ্মসমাজ থেকে তিনি ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাবান্বিত হন এবং তাঁর জীবন সন্ন্যাসের পথে অগ্রসর হতে থাকে অনিবার্য গতিতে! তাঁর সেই মানসিক উদ্‌বর্তনের আলোচনা এই নিবন্ধের বিষয়-বহির্ভূত।

এখানে শুধু একটি কথা উল্লেখ করা হবে, যার উদাহরণ পরবর্তী অধ্যায় দুটিতে অপর্যাপ্ত পাওয়া যাবে। তা হল, তাঁর জীবনের এই সংঘাতসঙ্কুল পর্বের সমস্ত আলোড়ন ও উদ্বেলতার মধ্যেও সঙ্গীতকে তিনি কখনো পরিত্যাগ করেন নি। বরং সঙ্গীত অনেক সময় তাঁর অন্তরঙ্গ জীবনের বাণীরূপে আত্ম-প্রকাশ করেছে—দেখা দিয়েছে তাঁর আন্তর ভাবের বাহনরূপে।

তাই দেখা যায়, একদিকে তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছেন কিন্তু অপর দিকে গান করেছেন ধ্রুপদাঙ্গের ব্রহ্মসঙ্গীত, ভজন, কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত। রচনা করেছেন তাঁর মনোজগতের ভাব-প্রকাশক বাংলা রাগাত্মক গান। সঙ্গীতের মূল তত্ত্ব বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করে আলোচনা-গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

কারণ, সঙ্গীত ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ জীবনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

(১) স্বামী বিবেকানন্দ, প্রথম ভাগ, ৭৫ পৃষ্ঠা—প্রমথনাথ বসু।

(২) The Life of Vivekananda and Universal Gospel, p. 5—Romain Rolland দ্রষ্টব্য।

(৩) মাষ্টার মশায়ের অনুধ্যান, পৃষ্ঠা ১০—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।

(৪) স্বামী বিবেকানন্দ, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা ৭৫-৭৬—প্রমথনাথ বসু।

(৫) বিবেকানন্দ-চরিত, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১০০—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

(৬) উদ্বোধন, ১৩১৭ সালের ফাল্গুন সংখ্যা, "স্বামীজীর স্মৃতি"—প্রিয়নাথ সিংহ।

(৭) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান, ২য় সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১৭—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।

(৮) " " পৃঃ ২০— "

(৯) " " পৃঃ ২৫— "

(১০) Swami Vivekananda—Pariot-prophet. p. 152—Dr. B. N. Dutta.—দ্রষ্টব্য।

(১১) " " " p. 154— দ্রষ্টব্য।

(১২) শ্রীবিবেকানন্দ-কাব্যগীতি, পৃষ্ঠা ৬১, ৬৩—স্বামী শ্যামানন্দ।

(১৩) বিবেকানন্দ-চরিত, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ৮১—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

(১৪) স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলায় ঊনবিংশ শতাব্দী, নূতন সংস্করণ, পৃঃ ১৭২—গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

(১৫) স্বামী বিবেকানন্দ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৮৮-৮৯—প্রমথনাথ বসু।

(১৬) "স্বামীজীর স্মৃতি" উদ্বোধন, ফাল্গুন, ১৩১৭—প্রিয়নাথ সিংহ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সন্নিধানে

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে নরেন্দ্রনাথের জীবনে যে অভাবিত গতি-পরিবর্তনের সূচনা হয়, তা ঘটে নিতান্ত ঘটনাচক্রে এবং সঙ্গীতই সেই প্রথম সাক্ষাৎকারের উপলক্ষ্য হয়েছিল।

একজন গায়করূপে নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের সকাশে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁকে আহ্বান করে আনা হয় শ্রীরামকৃষ্ণকে গান শোনাবার জন্যে। নরেন্দ্রনাথ তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের এফ্, এ, ক্লাসের ছাত্র, উদীয়মান গায়ক, ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত, ধনীর দুলাল, রহস্যালাপী কিন্তু ঘোর তার্কিক; দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে গভীর অধ্যয়নশীল, চিন্তাশীল ও নবযুগের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ।

তাঁদের দুজনের এই সাক্ষাৎকারের হেতু হন সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহী শিষ্য, সেবক এবং নরেন্দ্রনাথের প্রতিবেশী। তাঁর যে বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-নরেন্দ্রর এই প্রথম পরিচয় ঘটে, তা ছিল গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটের দত্তবাড়ীর দক্ষিণে, পুরনো শিমলা স্ট্রীটে। সেখান দিয়ে সি. আই. টির নতুন রাস্তাটির (বিবেকানন্দ রোড) নির্মাণের সময় সেই বাড়ী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। উক্ত মিত্র মশায় সম্পর্কে মহেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন—"সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ইঁহার নাম, পাড়ার লোকে 'সুরেশ মিত্তির' বলিয়া ডাকিতেন। শুনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবও ইঁহাকে আদর করিয়া 'সুরেশ' বলিয়া ডাকিতেন।"[১]

তাঁদের এই প্রথম সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথের একটি প্রামাণিক জীবনী থেকে উদ্ধৃত করা হল :—

"কলিকাতাস্থ শিমলা পল্লীর সুরেন্দ্রনাথ্ মিত্র মহাশয় একদিন স্বালয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে লইয়া আসেন এবং একটি আনন্দোৎসবের আয়োজন করেন। সুকণ্ঠ গায়কের অভাব হওয়ায় স্বীয় প্রতিবেশী নরেন্দ্রনাথকে আহ্বান করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ঠাকুরের সহিত নরেন্দ্রনাথের এই প্রথম পরিচয়। উক্ত দিবসে তিনি নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীতশ্রবণে প্রীত হইয়াছিলেন ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আগ্রহের সহিত তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বিদায়কালে নরেন্দ্রনাথকে একদিবস দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া যান।"[২]

"আমাদের প্রতিবেশী সুরেশচন্দ্র মিত্র তাঁর বাড়ীতে রামকৃষ্ণের আগমন উপলক্ষ্যে নরেন্দ্রকে গান গাইবার জন্যে আমন্ত্রণ জানান এবং এইভাবে (তাঁদের) পরিচয়ের সূত্রপাত হয়।"[৩]

স্বামীজীর একটি প্রামাণ্য ইংরাজী জীবনীগ্রন্থে এই দিনটির কথা লিখিত আছে,—"১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে যখন তিনি এফ্, এ, ক্লাসের ছাত্র, সেই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়।"[৪]

নরেন্দ্র-জীবনের কথা বর্ণনা-প্রসঙ্গে এই জীবনীগ্রন্থের আরও এক জায়গায় এই দিনটির কথা উল্লিখিত হয়েছে,—"হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল শ্রীরামকৃষ্ণকে, যাঁকে তিনি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে সুরেন্দ্রনাথ মিত্র নামে এক ভক্তের বাড়ীতে সর্বপ্রথম দেখেন। তিনি গিয়েছিলেন সেখানে গান গাইতে। আচার্যদেব নরেনের গানে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন, তাঁর সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেন, এমন কি তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন।"[৫]

শ্রীরামকৃষ্ণ-নরেন্দ্রনাথের এই সাক্ষাৎকারের বিবরণে স্বামীজীর জীবনী-গ্রন্থগুলির মধ্যে বৎসর-ঘটিত একটি অমিল রয়ে গেছে। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের (২ সংখ্যক উদ্‌ধৃতি) মতন স্বামী গম্ভীরানন্দও বলেছেন,—১৮৮০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর।[৬] অথচ ইংরেজী জীবনীগ্রন্থে আছে,—১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর। ঘটনাদৃষ্টে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর সঠিক বলে মনে হয়।

যাই হোক, মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে সেদিন নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে দু'টি বিখ্যাত ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিয়েছিলেন। গান দুটির রচয়িতা হলেন—অযোধ্যানাথ পাকড়াশী এবং বেচারাম চট্টোপাধ্যায়। সে দুখানি গানের প্রথম পঙক্তি হ'ল, যথাক্রমে—"মন, চল নিজ নিকেতনে" (সুরট মল্লার, একতালা) এবং "যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে" (মূলতান, একতালা)।

শ্রীরামকৃষ্ণ গান ভালবাসেন, গান শোনবার সুযোগ পেলে তিনি সাগ্রহে শুনতে চান—সেজন্যেই নরেন্দ্রনাথকে নিয়ে আসা হয় তাঁকে গান শোনাতে। সেদিন তাঁর কণ্ঠে ওই দুটি গান শুনে এবং গায়ককে লক্ষ্য করে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিলেন। গান শুনে তিনি পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন, একথা ত বলাই বাহুল্য।

এমনিভাবে তাঁদের পরস্পরের পরিচয়লাভের মধ্যস্থতা করেছিল—সঙ্গীত।

তার পর থেকে তাঁদের জীবনী পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় বেশ লক্ষ্য করা যায়। তা হল,—সেই প্রথম সাক্ষাৎকারের দিনটি থেকে আরম্ভ

করে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের কিছু আগে পর্যন্ত তাঁদের দুজনের যতবার দেখা হয়েছে তার মধ্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে—সঙ্গীত।

তাঁদের সাক্ষাৎকারের যত দিনের বিবরণ পাওয়া যায় তার প্রায় প্রত্যেক দিনেই নরেন্দ্রনাথের গানের প্রসঙ্গ আছে। দক্ষিণেশ্বরে কিংবা বলরাম বসুর বাড়ীতে যেখানেই নরেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন, সেখানেই তাঁর অনুরোধে নরেন্দ্রনাথকে গান গাইতে হয়েছে। নরেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হলে তিনি তাঁর গান অবশ্যই শুনবেন, এই ছিল যেন রীতি। সেজন্যে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীতের সরঞ্জাম রাখতেন—তানপুরা, পাখোয়াজ, তবলা ইত্যাদি। কারণ নরেন্দ্রনাথ সুর-সহযোগিতা ভিন্ন শুধু গলায় গান গাইতে সম্মত হতেন না।

তাঁদের দুজনের দেখা হয়েছে, অথচ গানের প্রসঙ্গ আসেনি কিংবা শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে গান শোনাতে বলেননি, এমন বিবরণ কদাচিৎ পাওয়া যায়। তবু ত তাঁদের প্রত্যেক সাক্ষাৎকারের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ নেই এবং যেসব দিনের বিবৃতি পাওয়া যায় তাও সব সম্পূর্ণ নয়। সেসব বিবরণে সঙ্গীত-প্রসঙ্গ অনেক সময়ে উল্লেখ করা হয়নি, সম্ভবত অনাবশ্যক বোধেই করা হয়নি।

নরেন্দ্রের গান শুধু শোনা নয়, সে গান শোনবার ফলে প্রায়ই শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবস্থ হয়ে যেতেন। নরেন্দ্রের গান শুনে তাঁর মনে কতখানি অনুরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যেত তার বহু উদাহরণ শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে বহু গ্রন্থে উল্লেখ আছে। এই অধ্যায়েও তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা হবে।

তাঁদের পরস্পর দেখা সাক্ষাতের দিনে অনেক সময় এক বিচিত্র ও অপূর্ব সাঙ্গীতিক পরিবেশের সৃষ্টি হত। নরেন্দ্রনাথের গান শোনবামাত্র অনুরূপ ভাবের দ্যোতনা সৃষ্টি হত শ্রীরামকৃষ্ণের মনে। তাঁর গানে শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র সত্তা যেন সাড়া দিত। গান জাগাত গান। সুর জাগাত সুর। ভাব মেলাত ভাব।

সঙ্গীত যেন ছিল তাঁদের আত্মিক সম্মিলনের সেতু।

শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন গান শুনতে অত্যন্ত ভালবাসতেন, তেমনি নিজেও ভাবে বিভোর হয়ে মাঝে মাঝে গান করতেন। কীর্তন, রামপ্রসাদী, ব্রহ্ম-সঙ্গীত, সুরদাস প্রভৃতির ভজন, গিরিশ ঘোষের কয়েকটি গান, সাধক কমলাকান্তের শ্যামাসঙ্গীত প্রভৃতি। সব চেয়ে প্রিয় ছিল তাঁর নরেন্দ্রের

কণ্ঠে শোনা গান, যা শুনে তিনি আত্মহারা হতেন, ভাবস্থ হতেন। আবার নিজেও কখনো কখনো নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ভাবে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে গান আরম্ভ করতেন।

নরেন্দ্রের গান তাঁর প্রাণের আরামের বস্তু ছিল। তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন ভালবাসতেন, তেমনি ভালবাসতেন তাঁর গান। তাঁর একটি গান শুনে তিনি কখনো তৃপ্ত হতেন না। বার বার গান শোনাবার জন্যে অনুরোধ করতেন।

নরেন্দ্রনাথ যে ভাল গান গাইতে পারেন, সেইটিই তাঁর একটি প্রধান গুণ বলে শ্রীরামকৃষ্ণ গণ্য করতেন। তিনি বলতেন, "নরেন্দ্র খুব ভাল আধার। একাধারে কত গুণ—গাইতে, বাজাতে, লিখতে, পড়তে।"[৭]

শ্রীরামকৃষ্ণসকাশে তাঁর গানের প্রসঙ্গ বিবৃত করবার আগে তাঁদের প্রথম সাক্ষাতের দিনটির বিষয়ে আর একবার উল্লেখ করতে হচ্ছে।

গানের মাধ্যমে প্রথম দিনের প্রথম পরিচয়ের কথা তাঁদের দুজনেরই স্মৃতিপটে কেমন উজ্জ্বল বর্ণে আঁকা ছিল, তার দু'টি চমৎকার বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ করা হল। প্রথমটি শ্রীরামকৃষ্ণের কথা···স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীগ্রন্থ থেকে অনুবাদ। দ্বিতীয়টি স্বামীজীর উক্তি—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম) লিখিত অনুলিপি।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা প্রসঙ্গে বলেছেন—"নিজের শরীর আর বেশভূষার দিকে তার একেবারেই লক্ষ্য ছিল না। চোখ দুটি দেখে মনে হল মন তার অন্তর্মুখী। যেন তার এক অংশ সদাই ভেতরে নিবিষ্ট হয়ে আছে······কল্‌কাতার এই জড় আবহাওয়ার মধ্যে এমন একটা আধ্যাত্মিক প্রাণ দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলুম।··· আমার অনুরোধে সে কয়েকটি বাংলা গান গাইলে। তার মধ্যে একটি ছিল ব্রাহ্মসমাজের গান, তার আরম্ভটা হল—

মন, চল নিজ নিকেতনে।
সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে।

এই গানটা সে তার সমস্ত মন ঢেলে দিয়ে গাইলে আর তাতে এমন করুণ ভাব দিলে যে আমার আর নিজের উপর কোন জোর রইল না, আমার ভাব হল।"[৮]

নরেন্দ্রনাথ সেদিনটির কথা উল্লেখ করেন শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের এক

বছর পরে। তখন তিনি গুরুভাইদের সঙ্গে বরাহনগর মঠে কঠোর তপশ্চর্যার দিন যাপন করতেন। সে সময় একদিন (৯, এপ্রিল, ১৮৮৭ খৃঃ) মাস্টার মশায় তাঁকে জিজ্ঞেস করেন—

"প্রথম দেখার দিনটি তোমার বেশ স্মরণ পড়ে ?

নরেন্দ্র—সে দিন দুটি গান গেয়েছিলাম—

"মন চল নিজ নিকতনে"···আর "যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।"

মাস্টার—গান শুনে কি বললেন ?

নরেন্দ্র—তাঁর ভাব হয়ে গিছলো। রামবাবুদের জিজ্ঞেস করলেন, 'এ ছেলেটি কে ? আহা কি গান !' "৯

এই দুই মহামানবের পরিচয় স্থাপনে গানের যে একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল তা দেখাবার জন্যেই এত বিস্তৃত বিবরণের অবতারণা।

শ্রীরামকৃষ্ণসন্নিধানে তাঁর গানের নানা প্রসঙ্গ থেকে তাঁর সঙ্গীতবিষয়ে কতকগুলি তথ্য পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণসকাশে নরেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ আরম্ভ করবার আগে, বিভিন্ন সূত্র থেকে সেগুলি চয়ন করে এখানে উল্লেখ করা হল :—

(১) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মতন এখানেও তিনি প্রধানত ধ্রুপদাঙ্গের (ব্রহ্মসঙ্গীত) গায়ক। শ্রীরামকৃষ্ণ বা কারো কোন নির্দিষ্ট গান গাইবার অনুরোধ না থাকলে, অর্থাৎ তিনি নিজে গান নির্বাচন করে গাইলে বেশির ভাগই ধ্রুপদাঙ্গের বাংলা গান গেয়েছেন।

(২) কোনদিনই তিনি বিনা তানপুরায় গান করেন নি। অনেকক্ষণ ধরে তানপুরাটি নিজের হাতে মনের মতন করে বেঁধে তবে গান গেয়েছেন। নিখুঁতভাবে তানপুরা বাঁধতে অনেক সময় যেত বলে কখনো কখনো শ্রোতারা, শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত, অধীর হয়ে পড়তেন। কিন্তু তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করতেন না। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তানপুরার চারটি তারে সুর বেঁধে গান আরম্ভ করতেন। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের কথাতেও কোনদিন তার অন্যথা হত না।

(৩) গান ধ্রুপদাঙ্গের হলে পাখোয়াজের সঙ্গতে গাইতেন। তাঁর গানের সঙ্গে অনেক সময় দক্ষিণেশ্বরে পাখোয়াজ বাজাতেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পাখোয়াজ-বাদকরূপে তখন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বেশ নাম ছিল।

(এই তিনটি বিষয়ই তাঁর পদ্ধতিগত সঙ্গীত চর্চার ফল।)

(৪) সুরদাস, কবীর, নানক প্রভৃতি -রচিত ভজন এবং শ্যামাসঙ্গীত, রামপ্রসাদী, ইত্যাদি প্রায় সব রকমেরই গান গেয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরোধে মাঝে মাঝে কীর্তন, আগমনী গানও করেছেন। কীর্তনে তাঁর আঁখর প্রয়োগ করে গাইবার দৃষ্টান্ত দেখে মনে হয় যে প্রণালীবদ্ধ কীর্তনেও তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল। একদিন (১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ১৬ই অক্টোবর) দক্ষিণেশ্বরে তাঁর খোল বাজাবার উল্লেখ পাওয়া যায় অপরের কীর্তন গানের সঙ্গে। পাখোয়াজ ও তবলা ত বাজাতেনই, এখানে খোল বাজাবার কথা জানা গেল। সঙ্গতের প্রায় সব যন্ত্রেই তাহলে তাঁর হাত ছিল।

(৫) রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গানও তিনি গেয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথ যে সময় রবীন্দ্রনাথের গানগুলি গেয়েছেন, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স বাইশ থেকে পঁচিশ বছর। সে সময়েই তাঁর গান যে ঠাকুর বাড়ীর বাইরে গীত হয়েছে, এটি একটি স্মরণীয় সংবাদ। গানগুলি রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত রচনার প্রথম যুগের এবং হিন্দি ধ্রুপদের অনুকরণে (একটি গান নানকের ভজনের বঙ্গানুবাদ) রচিত।

রবীন্দ্রনাথের গান যে সেই যুগে নরেন্দ্রনাথ কয়েকবার গেয়েছেন, একথাটি স্মরণ করে, আশা করি, পাঠকপাঠিকারা বিশেষ আনন্দ লাভ করবেন। সে প্রসঙ্গ যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে। এবারে শ্রীরামকৃষ্ণসন্নিধানে নরেন্দ্রনাথের গানের বৃত্তান্ত যথাসম্ভব কালানুক্রমিক বিবৃত করা হল।

প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। এই সময়ের বিবরণ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে থাকাকালীন আর একদিনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর তারিখের। এদিনে অবশ্য নরেন্দ্রনাথের গানের কথা বিশেষভাবে কিছু পাওয়া যায় না।

"বৃহস্পতিবার, ১৬ই নভেম্বর, ১৮৮২, সন্ধ্যার কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর শিমুলিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত রাজমোহনের বাড়ীতে গাড়ী করিয়া আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর শুনিয়াছেন যে, এখানে নরেন্দ্র প্রভৃতি ছোকরারা মিলিয়া ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা করেন। তাই দেখিতে আসিয়াছেন। ......ঠাকুর নরেন্দ্রকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। আর বলিলেন, "তোমাদের উপাসনা দেখ্‌ব।" নরেন্দ্র গান গাইতে লাগিলেন।"[১০]

ঐ দিনের ঠিক এক মাস আগেকার (অর্থাৎ ১৬ই অক্টোবর, ১৮৮২) কথা। এদিন নরেন্দ্রনাথের চারখানি গান গাইবার উল্লেখ পাওয়া যায়। চারটি গানই কীর্তন। প্রথম ও চতুর্থটির রচয়িতা হলেন তৎকালীন প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসঙ্গীত-রচয়িতা ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (চিরঞ্জীব শর্মা) এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টিও ব্রাহ্মসমাজের আর একজন উচ্চশ্রেণীর গীতরচনাকার পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় -রচিত।

এদিনের বিবরণে একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, নরেন্দ্রনাথের খোলবাদন। কীর্তন খানিকক্ষণ গাইবার পর সঙ্গীতের আবেগে তিনি খোল বাজাতে লাগলেন।—

"দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে নরেন্দ্র আসিয়াছেন।······ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে রাখাল, রামলাল ও হাজরা আছেন। নরেন্দ্রের সঙ্গে আর দু-একটি ব্রহ্মজ্ঞানী ছোকরা আসিয়াছেন।······

বৈকাল হইয়াছে—নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন—রাখাল, লাটু, মাস্টার, নরেনের ব্রাহ্মবন্ধু, হাজরা—সকলে আছেন।

নরেন্দ্র কীর্তন গাইলেন, খোল বাজিতে লাগিল—

চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন ;
অনুপম ভাতি, মোহন মুরতি, ভকতহৃদয়রঞ্জন।
নব রাগে রঞ্জিত, কোটি শশী বিনিন্দিত,
কিবা বিজলী চমকে, সে রূপ আলোকে, পুলকে
শিহরে জীবন।
হৃদি কমলাসনে ভাব তাঁর চরণ ;
দেখ শান্ত মনে, প্রেমনয়নে অপরূপ প্রিয়দর্শন ;
চিদানন্দ রসে, ভক্তিযোগাবেশে হও রে চিরমগন।

নরেন্দ্র আবার গাইলেন—

সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে
নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপসাগরে,
(সেদিন কবে হবে)। (দীনজনের ভাগ্যে নাথ)।
জ্ঞান অনন্তরূপে পশিবে নাথ মম হৃদে
অবাক হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে।···ইত্যাদি

আনন্দবদনে বল মধুর ব্রহ্মনাম।
নামে উছলিবে সুধাসিন্ধু পিয়ো অবিরাম।
(পান কর আর দান কর হে)
যদি হয় কখনো শুষ্ক হৃদয়, করো নাম গান।
(বিষয়-মরীচিকায় পড়ে হে)। (প্রেমে হৃদয়
সরস হবে হে)···ইত্যাদি।

খোল করতাল লইয়া কীর্তন হইতেছে। নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা ঠাকুরকে বেড়িয়া বেড়িয়া কীর্তন করিতেছেন।

অবশেষে নরেন্দ্র নিজে খোল ধরিয়াছেন ও মত্ত হইয়া ঠাকুরের সঙ্গে গাইতেছেন—'আনন্দ বদনে বল মধুর হরিনাম।'

কীর্তনান্তে নরেন্দ্রকে ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া বার বার আলিঙ্গন করিলেন। বলিতেছেন, 'তুমি আমায় আজ যে আনন্দ দিলে।'···

সেই রাত্রে—"নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা আহার করিয়া ঠাকুরের ঘরের মেঝেতে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন ও ঠাকুরের সঙ্গে গল্প করিতেছেন।···কথা কহিতে কহিতে নরেন্দ্রকে ঠাকুর বলিতেছেন, 'চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে', এই গানটি একবার গা না।

নরেন্দ্র গাইতে আরম্ভ করিলেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে খোল করতাল ভক্তগণ বাজাইতে লাগিলেন—

চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেম চন্দ্রোদয় হে।
উথলিল প্রেমসিন্ধু কি আনন্দময় হে।
জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়।
চারিদিকে ঝলমল করে ভক্ত গ্রহদল,
ভক্ত সঙ্গে ভক্তসখা লীলা-রসময় হে।
জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়।
স্বর্গের দুয়ার খুলি, আনন্দ-লহরী তুলি,
নববিধান বসন্ত সমীরণ বয়,
ফুটে তাহে মন্দ মন্দ, লীলারস প্রেমগন্ধ,
ঘ্রাণে যোগিবৃন্দ যোগানন্দে মত্ত হয় হে।
জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়।······ইত্যাদি।[১১]

তার পর যেদিন নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত-প্রসঙ্গ পাওয়া যায় তা দু' মাস পরের কথা। এই সময়ের মধ্যে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি বা তাঁকে গান শোনাননি, তা মনে হয় না। "কথামৃত" গ্রন্থমালাতেই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কথোপকথনের যথাসম্ভব বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আছে যদিও প্রতিদিনের ঘটনা এতে নেই। কারণ, অনুলিপিকার ও সংগ্রাহক মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে যে যে দিন উপস্থিত হয়েছেন, প্রায় সেই দিনগুলিরই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এই গ্রন্থমালায় যতদিনের মুদ্রিত বিবৃতি পাওয়া গেছে, তার প্রতিদিনের সমস্ত সঙ্গীত প্রসঙ্গ যে তার মধ্যে স্থান পেয়েছে, তাও হয়ত নয়। কিন্তু এই অধ্যায়ের উপকরণের জন্যে "কথামৃত"ই আমাদের প্রধান উপজীব্য। সেজন্যে উক্ত গ্রন্থাবলী অনুসরণ করে শ্রীরামকৃষ্ণসকাশে নরেন্দ্রনাথের গানের কথা যা পাওয়া যায় তার ধারাবাহিক বিবরণ এখানে দেওয়া হ'ল।

৭ এপ্রিল, ১৮৮৩। এদিনের গান হয় শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রধান গৃহী ভক্ত বলরাম বসুর বাড়ীতে। বাড়ীটি এখনো বর্তমান আছে—রামকান্ত বসু স্ট্রীট ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ এ্যাভিনিউ এর সংযোগস্থলে। প্রসঙ্গত এই বাড়ীর বিষয়ে দু'একটি কথা বলা আবশ্যক মনে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর সমস্ত সাক্ষাৎ শিষ্যদের স্মৃতি-রঞ্জিত এই বাড়ীটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। বিশেষ শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাসে। শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে আরম্ভ করে বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, ব্রহ্মানন্দ (এখানে তাঁর দেহত্যাগ ঘটে) যোগানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতি তাঁর প্রত্যেক দীক্ষিত শিষ্য এবং গিরিশচন্দ্র, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ অনুরাগীবৃন্দের এ বাড়ীতে বহুবার আগমন ঘটেছে। নরেন্দ্রনাথের সন্ন্যাসজীবনের প্রথম পর্বে, বরাহনগর মঠের সময়ে, বহুদিন তিনি এখানে এসে তাঁর সঙ্গীতে শ্রোতাদের পরিতৃপ্ত করেছেন। শুধু তাই নয়, বলরাম বসুর এই বাড়ীতেই, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের পয়লা মে তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং বিবেকানন্দ তার সাধারণ সভাপতি, ব্রহ্মানন্দ কলিকাতা শাখার সভাপতি এবং যোগানন্দ সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। বলরাম বসু বাড়ীখানির উত্তরাধিকারী করে গেছেন বেলুড়মঠকে।

বলরাম বসুর বাড়ীতে নরেন্দ্রনাথের সেদিনের গানের প্রসঙ্গে আর একটি সংবাদ পাওয়া যায়। তা হল, ওই তারিখের কয়েকদিন আগে ব্রহ্মানন্দ

কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ীতে ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (চিরঞ্জীব শর্মা) প্রণীত "নব বৃন্দাবন" নাটকের অভিনয়। এই নাটকে কেশবচন্দ্র পওহারী বাবার এবং নরেন্দ্রনাথ অভেদানন্দের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং এই নাট্যানুষ্ঠানের অন্যতম দর্শক ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, চারুশিল্পের নানা বিভাগের মতন অভিনয় কলাতেও নরেন্দ্রনাথের নৈপুণ্য ছিল। তাঁর স্বর-কৃতি এবং মুখভাব ও হাতের ভঙ্গিমায় ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা ছিল দক্ষ অভিনেতার মতন। তাঁর এই বৈশিষ্ট্য বক্তৃতাকালে প্রকাশ পেত এবং কথোপকথনেও—একথা তাঁর অনুজ মহেন্দ্রনাথ দত্ত উল্লেখ করেছেন।[১২]

এইদিন নরেন্দ্রনাথ পাঁচটি গান করেন। প্রথমটি পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় -রচিত বাউল সুরের ব্রহ্মসঙ্গীত এবং শেষেরটি ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের কীর্তন। মাঝের তিনটি ধ্রুপদাঙ্গের ব্রহ্মসঙ্গীত। তার মধ্যে প্রথমখানি অর্থাৎ "বিশ্বভুবনরঞ্জন ব্রহ্ম পরমজ্যোতি" (মেঘমল্লার—সুরফাক্তা) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত এবং কাঙ্গালীচরণ সেন প্রণীত "ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি"তে এই গানটির স্বরলিপি মুদ্রিত আছে। ধ্রুপদাঙ্গের শেষ গানটি রবীন্দ্রনাথের। গানটি হল—"গগনের থালে রবিচন্দ্র-দীপক জ্বলে" (জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল)।* রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন বাইশ বছর মাত্র। সে সময় যে তাঁর গান নরেন্দ্রনাথের মতন গুণী গায়ক গাইছেন—এই তার প্রথম উল্লেখ পাওয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথের এই গানখানি তাঁর ব্রহ্মসঙ্গীত-রচনার প্রথম যুগের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথের গান রচনার প্রথম পর্বের অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে এমনি "ভাঙ্গা" গান অর্থাৎ হিন্দী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় রচিত ধ্রুপদ ও ভজন গানের অনুকরণে রচিত বাংলা গান। মূল গানখানি যেমন জয়জয়ন্তী (ঝাঁপতাল), বাংলাটিও তাই। মূল গানের ভাব, ভাষা, সুর ও তাল অনুসরণ করে বাংলায় রূপায়ণ। কিন্তু কোন রকম আড়ষ্টতা বা কষ্টকল্পনা বা ভাষান্তরকরণের কোন বিসদৃশ চিহ্ন তার এই নতুন বাংলা রূপের মধ্যে নেই—এইটিই ছিল রবীন্দ্রনাথের এই ধরণের গান রচনার কৃতিত্ব। এটি নানকের ভজন "গগনময় থাল রবিচন্দ-দীপক বনে" অনুকরণে

* মতান্তরে, গানখানি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত। লেখকের ধারণা, রবীন্দ্রনাথ এ গানের রচয়িতা এবং গীতবিতান (৩য়) গ্রন্থেও এটি অন্তর্ভুক্ত আছে।

বাংলায় রূপান্তরকরণ—"গগনের থালে রবিচন্দ্র-দীপক জ্বলে।" এই গানটি সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের কোন পুস্তকে মুদ্রিত হয়নি।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করতে আরম্ভ করেন ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকে। বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনের (ফেব্রুয়ারী, ১৮৮০) কয়েক মাস পরে তাঁর ব্রহ্মসঙ্গীত রচনার পর্ব আরম্ভ হয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত গানের বই "রবিচ্ছায়া" এই ঘটনার অনেক পরে (সন ১২৯২ সালে) প্রকাশিত হয়েছিল। সুতরাং নরেন্দ্রনাথ এই গানটি নিশ্চয়ই কোন গায়ককে গাইতে শুনে তুলে নিয়েছিলেন। গানটি সম্ভবত আদি ব্রাহ্মসমাজে বা মাঘোৎসবের সময়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে গীত হয় এবং নরেন্দ্রনাথ সেখানে শুনে থাকতে পারেন। কিংবা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে যাতায়াত করবার সময়ে হয়ত শুনেছেন রবীন্দ্রনাথেরই কণ্ঠে। যে ভাবেই হোক, রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি গান তাঁর সংগীতরচনার প্রভাতকালে নরেন্দ্রনাথ গাইতেন এবং এখানে প্রথম তাঁর রবীন্দ্রনাথের গান গাইবার কথা পাওয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথের আরো কয়েকটি গান নরেন্দ্রনাথের গাইবার বিবরণ এই অধ্যায়েই পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথ-রচিত গীতাবলীর সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষার সৌকুমার্য ও উৎকর্ষ সমসাময়িক অন্যান্য গীতরচয়িতাদের ব্রহ্মসঙ্গীত ও অন্য ধরণের গানের সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায়। একথা তাঁর মৌলিক ও "ভাঙ্গা" দুই শ্রেণীর গানের সম্পর্কেই বলা চলে। তাঁর গানগুলির মধ্যে নিহিত এই অপূর্বত্ব ও সৌন্দর্য সঙ্গীতগুণী নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে; এবং তিনি স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠেন। আদি ব্রাহ্মসমাজে এবং মহর্ষিভবনে নরেন্দ্রনাথের যাতায়াতকালে তাঁরা পরস্পর পরিচিত হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথের মধ্যে সম্ভাব্য সঙ্গীতপ্রসঙ্গ নিয়ে বর্তমান বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট লেখক চমৎকার আলোচনা করেছেন।[১৩]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক যোগাযোগের একটি অতি উল্লেখযোগ্য তথ্য ডঃ কালিদাস নাগ মহাশয় প্রকাশ করেছেন। তা হল, কৃষ্ণকুমার মিত্র ("সঞ্জীবনী" সম্পাদক) মহাশয়ের বিবাহ সভায়, সাধারণ

ব্রাহ্মসমাজ গৃহে নরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের রচিত গান গেয়েছিলেন। মনীষী রাজনারায়ণ বসুর কন্যা শ্রীমতী লীলার সঙ্গে কৃষ্ণকুমারের বিবাহ অনুষ্ঠানে নরেন্দ্রনাথ ও ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের এই বিবাহ উপলক্ষ্যে রচিত "দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিল যদি" ও অন্য দুটি গান করেছিলেন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে।* সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ যে পরস্পর পরিচিত ছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ নরেন্দ্রনাথ গানখানি রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ গায়কদের গান তিন খানি উক্ত বিবাহ সভায় গাইবার জন্যে শিক্ষা দেন। পারস্পরিক এই সহযোগিতা না হলে নরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেন না। মনে রাখা দরকার, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন কুড়ি এবং নরেন্দ্রনাথের বয়স আঠারো বছর কয়েক মাস।

এবারে বলরাম বসুর বাড়ীতে (বৈঠকখানার উত্তরপূর্ব ঘরে) নরেন্দ্রনাথের গানের বিবরণ উদ্‌ধৃত করা হল—

"নরেন্দ্রের শরীর তত ভাল নয়, কিন্তু তাঁহার গান শুনিতে ঠাকুরের ভারি ইচ্ছা। তিনি বলিতেছেন—নরেন্দ্র, ওরা বলছে, একটু গা না।

নরেন্দ্র তানপুরা লইয়া গাইতেছেন,—

গান :— ওরে আমার প্রাণপিঞ্জরের পাখী, গাওনা রে।
ব্রহ্মকল্পতরু 'পরে বসে রে পাখী, বিভু গান গাও দেখি,
(গাও গাও) ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, সুপক্ক ফল খাওনা রে।
বল বল আত্মারাম, পড় পড় প্রাণারাম,
হৃদয়মাঝে প্রাণবিহঙ্গ ডাকে অবিরাম,
ডাকো তৃষিত চাতকের মত, পাখী অলস থেকো না রে।...

গান :— বিশ্বভুবনরঞ্জন ব্রহ্ম পরমজ্যোতি।
অনাদিদেব জগ-পতি, প্রাণের প্রাণ।

গান :— ওহে রাজরাজেশ্বর, দেখা দাও।
চরণে উৎসর্গ দান করিতেছে এই প্রাণ,
সংসার-অনলকুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও।

---

* উদ্বোধন, ১৩৬৮ মাঘ, "বিবেকানন্দ জীবনীর উপাদান-সংগ্রহ"—ডঃ কালিদাস নাগ।

কলুষ কলঙ্কে তাহে আবরিত এ হৃদয় ;
মোহে মুগ্ধ মৃতপ্রায়, হয়ে আছি দয়াময়,
মৃতসঞ্জীবনী দৃষ্টে শোধন করিয়ে লও।

গান :— গগনের থালে রবিচন্দ্র-দীপক জ্বলে।

গান :— চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে।

নরেন্দ্রের গান সমাপ্ত হইল।"[১৪]

তার পর তাঁর গানের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় ওই বছরেরই ১৯শে অগষ্ট তারিখে। সেদিন যদিও তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণকে একটি মাত্র গান শোনাবার বিবরণ আছে, তবু তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নরেন্দ্রনাথের গানে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরে কি ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তা এইদিন তিনি অতি মনোরমভাবে বর্ণনা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে নরেন্দ্রের গানের বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন, সত্যকার গীত-শিল্পীর কণ্ঠে শোনা গান ভিন্ন তা করা যায় না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা চলে যে, নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীতে ভাবের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ও মতামত অষ্টম অধ্যায়ে বিশেষভাবে পাওয়া যাবে। সঙ্গীতে ভাব ও রসসৃষ্টি বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। তাঁর গানে ভাবের ও রসসঞ্চারের স্থান কতখানি ছিল, বর্তমান প্রসঙ্গ তার একটি উত্তম উদাহরণ। এখানে তাঁর যে গানখানি গাইবার বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় রচিত খয়রা তালের একটি সুললিত কীর্তন। নরেন্দ্রনাথের গাওয়া এই গানটির প্রভাব সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্তব্য এই উদ্‌ধৃতির শেষ পঙক্তিতে পাওয়া যাবে।

"এমন সময়ে নরেন্দ্র ও বিশ্বনাথ উপাধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।...

"তাঁহারা প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলে, পরমহংসদেব নরেন্দ্রকে গান করিতে অনুরোধ করিলেন। ঘরের পশ্চিম ধারে তানপুরাটি ঝুলান ছিল। সকলে এক দৃষ্টে গায়কের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বাঁয়া ও তবলায় সুর বাঁধা হইতে লাগিল ;—কখন গান হয়।...

"নরেন্দ্র গান আরম্ভ করিলেন। গাইলেন—

"সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদয়মন্দিরে।
নিরখি নিরখি অনুদিন (রূপ) আমরা ডুবিব রূপসাগরে।
(সে দিন কবে বা হবে)
মগন অনন্তরূপে পশিবে নাথ মম হৃদে,
অচল হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে।
শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজরাজচরণে,
বিকাইব ওহে প্রাণসখা সফল করিব জীবনে;
এমন অধিকার কোথা পাব আর,
স্বর্গভোগ জীবনে। (সশরীরে)···

" 'আনন্দ অমৃতরূপে' এই কথা বলিতে না বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন।···

"সমাধি ভঙ্গ হইল। ইতিমধ্যে নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি দৃষ্টে কক্ষ ত্যাগ করিয়া পূর্বদিকের বারান্দায় চলিয়া গিয়াছেন।···শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধি ভঙ্গের পর ভক্তদের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখেন যে নরেন্দ্র নাই; শূন্য তানপুরা পড়িয়া রহিয়াছে। আর ভক্তগণ সকলে তাঁহার দিকে ঔৎসুক্যের সহিত চাহিয়া আছেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—'আগুন জ্বেলে গেছে, এখন থাকলো আর গেল'।"[১৫]

এর পরের বিবরণ হ'ল এক বছর পরে, ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪, তারিখের। সেদিন নরেন্দ্রনাথ ছখানি বাংলা গান শ্রীরামকৃষ্ণকে শোনান। প্রথম দুটি ধ্রুপদাঙ্গের ব্রহ্মসঙ্গীত, যথাক্রমে পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় এবং বেচারাম চট্টোপাধ্যায় -রচিত। কাফী, ঝাঁপতাল ও মুলতান, আড়াঠেকা। তৃতীয়টি ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল -রচিত (আমায় দে মা পাগল করে) এবং সম্ভবতঃ বাউল সুরের। চতুর্থ ও পঞ্চমটিও ত্রৈলোক্যনাথের এবং কীর্তনাঙ্গের। ষষ্ঠটিও কীর্তন—পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় -রচিত। সুতরাং ছখানির মধ্যে তিনখানিই কীর্তন। অথচ, কৌতুকের বিষয় এই যে সেদিন নরেন্দ্র কীর্তনগানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কথায় আপত্তি করেন এবং কীর্তনের স্বপক্ষে যুক্তি দেন।

নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে কীর্তনগানে তাল সম এসব নেই, সেজন্যই তা জনপ্রিয়। এই কথাটি সঠিকভাবে লিখিত হয়েছে কি না বলা যায় না! কারণ, নরেন্দ্রনাথের কীর্তন গান করবার এবং পদ্ধতিগত কীর্তন গান গাইবার (অর্থাৎ কীর্তনের সুলভ সংস্করণ "ঢপ্"-এর গান নয়) একাধিক দৃষ্টান্ত "কথামৃত"তেই আছে। সুতরাং কীর্তন গানের গঠন বিষয়ে তাঁর ধারণা না থাকা আশ্চর্যের কথা। কীর্তনেও যে তাল আছে, যদিও তা ধ্রুপদ খেয়ালের মতন প্রকট নয় এবং গানের মধ্যে অন্তঃসলিলার মতন প্রবাহিত থাকে, একথা তাঁর মতন সঙ্গীতজ্ঞের অজ্ঞাত থাকবার কথা নয়। সেজন্যেই প্রসঙ্গ সন্দেহজনক মনে হয়। আর যদি সত্যই তিনি উক্ত মন্তব্য করে থাকেন, তাহলে তাঁর এই কথাটি কীর্তনের প্রতি ধ্রুপদী বা রাগ-সঙ্গীত-গায়কসুলভ অবজ্ঞার পরিচায়ক। এ যেন শাক্ত ব্যক্তির বৈষ্ণবের প্রতি মনোভাবের সমতুল্য। নরেন্দ্রনাথের চরিত্রে ও ব্যক্তিত্বে শাক্ত-জনোচিত বীরভাবটিই প্রধান ছিল। সেজন্যে বৈষ্ণবধর্মের অচ্ছেদ্য অঙ্গ কীর্তন গানের প্রতি তাঁর অন্তরে অনুরূপ মনোভাব থাকা বিচিত্র নয়।

যাই হোক, সেদিন নরেন্দ্রনাথের তবলা বাঁধারও একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তাঁর সঙ্গীতশিক্ষার অধ্যায়ে তাঁর তবলা শিক্ষার যে উল্লেখ করা হয়েছিল এখানে তার পরোক্ষ সমর্থন পাওয়া গেল।

কিছুদিন পরে আর-এক দিন। এদিনের গান হয় অধরলাল সেনের বাড়ীতে।

"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অধরের বাড়ীতে বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। বৈঠকখানা দ্বিতলের উপর। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, মুখুজ্যে ভ্রাতৃদ্বয়, ভবনাথ, মাস্টার, চুনীলাল, হাজরা প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁর কাছে বসিয়া আছেন।······

"শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র গান গাইবেন, তার আয়োজন হইতেছে। তানপুরা বাঁধিতে গিয়া তার ছিঁড়িয়া গেল। ঠাকুর বলিতেছেন, 'ওরে কি করলি।' নরেন্দ্র বাঁয়া তবলা বাঁধিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন—'তোর বাঁয়া যেন গায়ে চড় মারছে।'

কীর্তনাঙ্গের গান সম্বন্ধে কথা হইতেছে। নরেন্দ্র বলিতেছেন—'কীর্তনে তাল সম এসব নাই—তাই অত popular—লোকে ভালবাসে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি বল্‌লি। করুণ বলে তাই অত লোকে ভালবাসে।

নরেন্দ্র গান গাইতেছেন—

সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে।

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে
আছি নাথ দিবানিশি আশা পথ নিরখিয়ে॥

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি সহাস্যে)—প্রথম এই গান করে।···

ভক্তসঙ্গে অনেকক্ষণ নৃত্যের পর ঠাকুর আবার আসন গ্রহণ করিয়াছেন। এখনও ভাবাবেশ। সেই অবস্থায় নরেন্দ্রকে বলিতেছেন—সেই গানটি—'আমায় দে মা পাগল করে।'

ঠাকুরের আজ্ঞা পাইয়া নরেন্দ্র গান গাইতেছেন—

'আমায় দে মা পাগল করে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর ঐটি, 'চিদানন্দ সিন্ধুনীরে'।

নরেন্দ্র গাইতেছেন—

চিদানন্দসিন্ধুনীরে প্রেমানন্দলহরী।
মহাভাবে রসলীলা কি মাধুরী মরি মরি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি) আর 'চিদাকাশে'?—না, ওটা বড় লম্বা, না? আচ্ছা একটু আস্তে আস্তে।

নরেন্দ্র গাইতেছেন—

চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে।
উথলিল প্রেমসিন্ধু কি আনন্দময় হে॥···

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর ঐটে—'হরিরস-মদিরা'?

নরেন্দ্র—

হরিরস-মদিরা পিয়ে মন মানস মাত রে।
লুটায়ে অবনীতল, হরি হরি বলি কাঁদ রে॥···

ঠাকুর আঁখর দিতেছেন—

প্রেমে মত্ত হয়ে হরি হরি বলি কাঁদ রে।
ভাবে মত্ত হয়ে হরি হরি বলি কাঁদ রে।"[১৬]

তার পর নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে গান শোনান দক্ষিণেশ্বরে, ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে (১৮৮৪ খৃঃ)। এইদিন তিনি অনেকগুলি গান

গেয়েছিলেন। তার মধ্যে কয়েকটি ছিল পুরণো, অর্থাৎ আগে গাওয়া, গান। যেমন, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের "যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে," পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়ের "সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে," ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের "চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে" ও "আমায় দে মা পাগল করে, আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে", ইত্যাদি।

নতুন গানের মধ্যে একটি আগমনী গান করেন শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়। তাঁর আগমনী গান গাইবার দৃষ্টান্ত বিশেষ পাওয়া যায় না। তবে নানা ধরণের গানের সঙ্গে আগমনী বিষয়ও তাঁর জানা ছিল, তার নিদর্শন এখানে পাওয়া গেল।

এইদিন তিনি রবীন্দ্রনাথের আর একখানি নতুন গান গেয়েছিলেন। "দিবানিশি করিয়া যতন, হৃদয়েতে রচেছি আসন……" (ধুন—কাওয়ালী)। এই গানখানি রবীন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্মসঙ্গীতগুলির অন্যতম। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মাঘোৎসবের জন্যে রবীন্দ্রনাথ যে সাতটি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন এ গানখানি তারই একটি,[১২] এবং গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় তার পাঁচ বছর পরে "রবিচ্ছায়া" পুস্তকে। নরেন্দ্রনাথ এই যে দ্বিতীয়বার রবীন্দ্রনাথের গান করেন, তখনও গানটি কোন পুস্তকে প্রকাশ করা হয় নি। সুতরাং এই গানখানিও নরেন্দ্রনাথ সম্ভবত মাঘোৎসবের অনুষ্ঠান থেকে শুনেছিলেন। গানটি "কথামৃত"তে সম্পূর্ণ নেই (যেমন অনেক গানই এই পুস্তকে অসম্পূর্ণ মুদ্রিত আছে), প্রথম দুটি পঙক্তিমাত্র দেখা যায়।

নতুন গানের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ আর একটি ব্রহ্মসঙ্গীত এইদিন গেয়েছিলেন —"মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়" (মূলতান, আড়াঠেকা)। গানখানি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর রচনা। বিজয়কৃষ্ণ প্রথম জীবনে ব্রাহ্মপ্রচারক এবং কেশবচন্দ্রের সমাজভুক্ত ছিলেন।

এবার দক্ষিণেশ্বরে এইদিনের গানের বিবরণ দেওয়া হ'ল।

"নরেন্দ্র গান গাহিবেন। নরেন্দ্র বলিতেছেন, পাখোয়াজটা আনলে না।

কোন্নগরের একটি ভক্ত কালোয়াতী গান গাইতেছেন। গানের সময় ঠাকুর সাধকের অবস্থা এক একবার দেখিতেছেন। (গান শেষে) গায়ক নরেন্দ্রের সহিত গানবাজনা সম্বন্ধে ঘোরতর তর্ক করিতেছেন।…

এবার নরেন্দ্র গান গাইতেছেন—

"যাবে কি হে দিন আমার" ইত্যাদি।

সাধক গান শুনিতে শুনিতে ধ্যানস্থ হইয়াছেন।...

নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন—

মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়।...
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যথায়॥
তুমি পুণ্যের আধার জ্বলন্ত অনলসম।
আমি পাপী তৃণসম, কেমনে পূজিব তোমায়॥
শুনি তব নামের গুণে, তরে মহাপাপী জনে।
লইতে পবিত্র নাম কাঁপে হে মম হৃদয়॥
অভ্যস্ত পাপের সেবায়, জীবন চলিয়া যায়।
কেমনে করিব আমি পবিত্র পথ আশ্রয়॥
এ পাতকী নরাধমে, তার' যদি দয়াল নামে।
বল করে কেশে ধরে, দাও চরণে আশ্রয়॥'

গান— সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে...ইত্যাদি।

নরেন্দ্র যাই গাইলেন—'হৃদয় মধুময় তব গানে', ঠাকুর অমনি সমাধিস্থ।...

নরেন্দ্র গাইতেছেন—

দিবানিশি করিয়া যতন হৃদয়েতে রচেছি আসন
জগৎপতি হে কৃপা করি, সেথা কি করিবে আগমন।

ঠাকুর ভাবাবেশে নীচে নামিয়া মেঝেতে নরেন্দ্রের কাছে বসিলেন।

গান— 'চিদাকাশে হল পূর্ণ'...ইত্যাদি।

'জয় দয়াময়' এই নাম শুনিয়া ঠাকুর দণ্ডায়মান হইয়া আবার সমাধিস্থ।

...নরেন্দ্র গান সমাপ্ত করিয়াছেন—তানপুরা যথাস্থানে রাখা হইয়াছে। ঠাকুরের এখনো ভাবাবেশ রহিয়াছে।...(নরেন্দ্রের প্রতি) "বুঝেছিস? বেদে কেবল আভাস।"

নরেন্দ্র আবার তানপুরা আনিতে বলিলেন।

ঠাকুর বলিলেন, 'আমি গাইব।'

...ঠাকুর গাহিতেছেন—

'আমি ঐ খেদে খেদ করি শ্যামা।
তুমি মাতা থাকতে জাগা করে চুরি গো মা।'

নরেন্দ্র গাহিতেছেন—

আমায় দে মা পাগল করে…"

"অপরাহ্ন হইয়াছে।…ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারান্দায়। শরৎকাল। গেরুয়া রঙে ছোপানো একটি ফ্ল্যানেলের জামা পরিতেছেন ও নরেন্দ্রকে বলছেন, তুই আগমনী গেয়েছিস? গোল বারান্দা হইতে নামিয়া নরেন্দ্রের সঙ্গে গঙ্গার পোস্তার উপর আসিলেন। সঙ্গে মাস্টার। নরেন্দ্র গান গাইতেছেন—

কেমন করে' পরের ঘরে ছিলি উমা বল্ মা তাই।
কত লোকে কত বলে, শুনে প্রাণে মরে' যাই॥
চিতাভস্ম মেখে অঙ্গে, জামাই বেড়ায় মহা রঙ্গে।
তুই নাকি মা তারই সঙ্গে—সোনার অঙ্গে মাখিস ছাই॥
কেমনে মা ধৈর্য ধরে, জামাই নাকি ভিক্ষা করে।
এবার নিতে এলে পরে, বলব উমা ঘরে নাই॥

ঠাকুর দাঁড়াইয়া শুনিতেছেন। শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট। এখনও একটু বেলা আছে। সূর্যদেব পশ্চিম গগনে দেখা যাইতেছেন। ঠাকুর ভাবাশিষ্ট। তাঁহার একদিকে উত্তরবাহিনী গঙ্গা—কিছুক্ষণ হইল জোয়ার আসিয়াছে। পশ্চাতে পুষ্পোদ্যান। ডানদিকে নবৎ ও পঞ্চবটী দেখা যাইতেছে। কাছে নরেন্দ্র দাঁড়াইয়া গান গাহিতেছেন।"[১৮]

তার পর নরেন্দ্রনাথের গানের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় দু'সপ্তাহ পরে—২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে। এই দিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে গান শুনিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রধান গৃহী ভক্ত ও সেবক ডাঃ রামচন্দ্র দত্তের মধু রায় লেনের বাড়ীতে। ডাঃ রামচন্দ্র দত্ত সম্পর্কে প্রসঙ্গত বলা যায় যে তিনি তাঁর কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যান ভবনে শ্রীরামকৃষ্ণের অস্থি রক্ষা করেছেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম জীবনী-লেখক, যদিও যে দৃষ্টিতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছেন ও প্রকাশ করেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ তার সঙ্গে একমত ছিলেন না। যাই হ'ক, যে মধু রায় লেনের বাড়ীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা আর বর্তমান নেই, বিবেকানন্দ রোড নির্মাণের সময় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান অবশ্য বিদ্যমান আছে।

মধু রায় লেনের বাড়ীতে নরেন্দ্রনাথ এই দিন একটি মাত্র গান করেন; "আমায় দে মা পাগল করে…"(ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল-রচিত)।

তার পরের দিন অর্থাৎ ২৯ সেপ্টেম্বর তাঁর দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে গান শোনাবার কথা জানা যায়। এই দিনেও তিনি ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালেরই দু'খানি গান গেয়েছিলেন। একখানি হ'ল—"চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেম-চন্দ্রোদয় হে"। দ্বিতীয়টি ঠুংরী তালের ও কাফীসুরের ব্রহ্মসঙ্গীত—

"এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনে,
চিত্ত সমাধান কর রে,
আদি সত্য তিনি কারণ-কারণ,
প্রাণরূপে ব্যাপ্ত চরাচরে…" ইত্যাদি।[১৯]

এই দুদিনেরই গানের প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য কিছু নেই।…

এর পরের গানের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় প্রায় পাঁচ মাস পরে, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারী তারিখে। এই দিনের বিবরণে নরেন্দ্রনাথের তানপুরা বাঁধার একটি কৌতুহল-উদ্দীপক কথা আছে। বরাবর দেখা গেছে, তিনি বিনা তানপুরায় গান করতেন না। আর তানপুরাটি মনের মতন করে নিখুঁত-ভাবে বাঁধতেন অনেকক্ষণ ধরে। এদিনেও তার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তিনি অনেকক্ষণ ধরে তানপুরার তার বাঁধেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্যান্য শ্রোতৃবর্গ অধৈর্য হয়ে উঠলেও তিনি তারবাঁধা সুসম্পূর্ণ না করে গান আরম্ভ করেন নি। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্তব্য থেকে নরেন্দ্রনাথের গানের প্রসঙ্গে আরো একটি তথ্য পাওয়া যায়।—তিনি গান আরম্ভ করবার আগে "তোম্ তায় নোম্" ইত্যাদি স্বরধ্বনি সহযোগে সামান্য উপক্রমণিকার পর গান করতেন। এটিও তাঁর কলাবতের অধীনে রীতিমত সঙ্গীত-শিক্ষার একটি নিদর্শন বলা যায়। যেমন অনেক ওস্তাদ ওইরকম তেলেনার ধরণের বোল্ খানিক ভেঁজে নিয়ে গান আরম্ভ করেন।

এই দিনের বিবরণে পাওয়া যায় যে তিনি ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল -রচিত তিনটি অতি সুন্দর ব্রহ্মসঙ্গীত গান করেন। "নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি" (বাগেশ্রী, আড়াঠেকা), "অন্তরে জাগিছ ও মা অন্তরযামিনী" (মল্লার, একতালা) এবং "গাওরে আনন্দময়ীর নাম" (লুম্ ঝিঁঝিট, ঠুংরী)।

"ঠাকুর নরেন্দ্রকে একটু গাইতে বলিতেছেন। নরেন্দ্র গাইতেছেন—

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপ রাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী।
অনন্ত আঁধার কোলে, মহানির্বাণ হিল্লোলে,
চিরশান্তি-পরিমল, অবিরত যায় ভাসি।
মহাকাল-রূপ ধরি, আঁধার-বসন পরি,
সমাধি মন্দিরে তুমি কি কর গো একা বসি';
অভয় পদকমলে, প্রেমের বিজলী জ্বলে,
চিন্ময় মুখমণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি॥

"নরেন্দ্র যাই গাইলেন, 'সমাধি মন্দিরে তুমি কি কর গো একা বসি'*—ঠাকুর অমনি সমাধিস্থ।..."

"...এইবার আবার নরেন্দ্রের গান হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারকে তানপুরাটি পাড়িয়া দিতে বলিলেন। নরেন্দ্র তানপুরাটি অনেকক্ষণ ধরিয়া বাঁধিতেছেন। ঠাকুর ও সকলে অধীর হইয়াছেন।

বিনোদ বলিতেছেন, "বাঁধা আজ হবে, গান আর একদিন হবে।" (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতেছেন আর বলিতেছেন, "এমনি ইচ্ছে হচ্ছে যে তানপুরাটি ভেঙ্গে ফেলি। কি টং টং—আবার তানা না না নেরে নুম্ হবে।"

ভবনাথ—যাত্রার গোড়ায় অমনি বিরক্তি হয়।

নরেন্দ্র (বাঁধিতে বাঁধিতে)—সে না বুঝলেই হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ঐ! আমাদের সব উড়িয়ে দিলে।...

...নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন। ঠাকুর ছোট ঘরটিতে বসিয়া শুনিতেছেন।...

১। অন্তরে জাগিছ ও মা অন্তরযামিনী,
কোলে করে আছ মোরে দিবস যামিনী।
২। গাওরে আনন্দময়ীর নাম।
ওরে আমার একতন্ত্রী প্রাণের আরাম।

* কথামৃত (৫ম ভাগ)-তে যে পাঠ আছে "সমাধি মন্দিরে মা কে তুমি গো একা বসি," মনে হয় তা সঠিক নয়। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রকাশিত "ব্রাহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্তন" গ্রন্থ অনুসারে "সমাধি মন্দিরে তুমি কি কর গো একা বসি" দেওয়া হ'ল।—লেখক।

৩। নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।…

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া নীচে নামিয়া আসিয়াছেন ও নরেন্দ্রের কাছে বসিয়াছেন। ভাবাবিষ্ট হইয়া কথা কহিতেছেন।…আনন্দরসে মগ্ন হওয়া নিয়ে কথা।…উদ্দীপনের জন্যে শুনতে হয়।…আগুন জ্বেলে দিলে; সে ত' বেশ।…"

…নরেন্দ্র আগেই চলিয়া গিয়াছেন।…ঠাকুর হঠাৎ মাস্টারকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "আহা, নরেন্দ্রের কি গান।"[২০]

তার কয়েকদিন পরে, ১১ই মার্চ (১৮৮৫) তারিখের কথা। এইদিন শ্রীরামকৃষ্ণ নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে আসেন। নরেন্দ্র প্রভৃতিও উপস্থিত। এখানে সেদিন তিনি একটিমাত্র গান গেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, গিরিশচন্দ্রের এই বাড়ীর বেশির ভাগই সি. আই. টি.-র নতুন রাস্তায় (গিরিশচন্দ্র এ্যাভিনিউ) নিশ্চিহ্ন হয়েছে। তার একটি খণ্ডাংশ মাত্র নব কলেবর ধারণ করে আছে।

"শ্রীরামকৃষ্ণ…বলছেন—'একটা গান (গা)—তাহলে ভাল হব…'

এইবার নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন—

সব দুখ দূর করিলে
দরশন দিয়ে—মোহিলে প্রাণ।
সপ্তলোক ভুলে শোক তোমারে পাইয়ে—
কোথায় আমি অতি দীন হীন॥

গান শুনিতে শুনিতে শ্রীরামকৃষ্ণের বহির্জগৎ ভুল হইয়া আসিতেছে। আবার নিমীলিত নেত্র। স্পন্দহীন দেহ। সমাধিস্থ।…"[২১]

তার দুমাস পরে (৯ মে, ১৮৮৫) আবার নরেন্দ্রনাথের গানের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। এইদিন তিনি গান করেন বলরাম বসুর বাড়ীর দোতলার বৈঠকখানা ঘরে। এখানে তিনি অনেকগুলি গান গেয়েছিলেন। তার বেশির ভাগই বাংলা ধ্রুপদ। তার মধ্যে একটি হল স্বনামধন্য ধ্রুপদী যদুভট্ট -রচিত। যদুভট্ট শুধু অসামান্য গুণী গায়ক ছিলেন না। উচ্চশ্রেণীর গান রচনাও তাঁর সঙ্গীতজীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। বাংলা ও হিন্দী দু' ভাষাতেই তিনি অনেক ধ্রুপদ গান রচনা করেন এবং তাঁর রচিত হিন্দী

ধ্রুপদ আসরে শুনলে বোঝা কঠিন হয় যে তা বাঙ্গালীর রচনা। এমনই তার রচনা ও গঠন-নৈপুণ্য অর্থাৎ 'বন্দেস্'। প্রসঙ্গত একটি কথা উল্লেখ করা যায়, যদুভট্টের গান সম্পর্কে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীতরচনার একটি বিশেষ পর্বে হিন্দী ধ্রুপদের আদর্শে বাংলায় ধ্রুপদাঙ্গের গান রচনা করতেন, সে সময় যদুভট্ট-রচিত একাধিক হিন্দী গানের অনুকরণে বাংলা গান রচনা করেন। যেমন, "আজু বহুত সুমন্দ পবন" থেকে রবীন্দ্রনাথের "আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ তোমার সুগন্ধ হে"; "কৌন রূপ বনি হো রাজাধিরাজ" থেকে রবীন্দ্রনাথের "মধুর রূপে বিরাজো হে বিশ্বরাজ" ইত্যাদি।

নরেন্দ্রনাথ যদুভট্টের যে গানখানি গেয়েছিলেন, সেটি তাঁর একটি বিখ্যাত বাংলা ধ্রুপদ – "বিপদ ভয় বারণ যে করে ওরে মন" (ছায়ানট, ঝাঁপতাল)।*

রবীন্দ্রনাথের "গগনের থালে রবিচন্দ্র-দীপক জ্বলে" গানখানিও সেদিন নরেন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি ব্রহ্মসঙ্গীত তিনি গান করেন —"দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে" (বাহার, একতালা)। এই গানটি রবীন্দ্রনাথ শিশুবয়সে গাইতেন। সেকথা তিনি "জীবনস্মৃতি"-তে উল্লেখ করেছেন।

নরেন্দ্রনাথ এই দিন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি ধ্রুপদ ব্রহ্মসঙ্গীতও গেয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ একটি হিন্দী ধ্রুপদ 'ভেঙ্গে' এটি রচনা করেছিলেন মূলের গঠন, রাগ, তাল প্রভৃতি হুবহু অনুসরণ করে। "চমৎকার দেদার রজ পর্‌বর্‌ দিগার"··· (সুহা কানাড়া, ঝাঁপতাল) এই বিখ্যাত ধ্রুপদের অনুকরণে দ্বিজেন্দ্রনাথ রচনা করেন—"চমৎকার অপার জগৎ রচনা তোমার" (কানাড়া, ঝাঁপতাল)। হিন্দী ধ্রুপদকে বাংলা ব্রহ্মসঙ্গীতে রূপান্তরিত করবার এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। দ্বিজেন্দ্রনাথ যে বৈঠকী ধ্রুপদ থেকে বাংলায় নিরঙ্কুশভাবে কেমন ভাষান্তরিত করতে পারতেন এখানে তার চমৎকার নিদর্শন পাওয়া গেল। এই মূল হিন্দী ধ্রুপদটিকে বাংলার সঙ্গীতাসরে প্রসিদ্ধ করেছিলেন তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী রসুল বক্স। তিনি ছিলেন বাংলার ধ্রুপদগুণী রামদাস গোস্বামীর সঙ্গীতগুরু এবং বিখ্যাত গায়ক আলী বক্সের (অঘোরনাথ চক্রবর্তীর প্রধান সঙ্গীতগুরু) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। "চমৎকার দেদার" গানখানি সম্ভবত

* গানটির স্বরলিপি কালীচরণ সেন প্রণীত "ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি", প্রথম ভাগে ১৩৮ পৃষ্ঠায় আছে।

রামদাস গোস্বামী ও আলী বক্সের শিষ্যধারায় বাংলার সঙ্গীতসমাজে রক্ষিত হয় এবং গানটি এখনও লুপ্ত হয়নি। দ্বিজেন্দ্রনাথ এই বাংলা গানটি হয়ত আদি ব্রাহ্মসমাজের জন্যে রচনা করেছিলেন।

এ ছাড়াও নরেন্দ্রনাথ সেদিন নিম্নলিখিত গানগুলি শ্রীরামকৃষ্ণকে শুনিয়েছিলেন। পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়ের তিনটি গান—"সুন্দর তোমার নাম" (কাফী, ঝাঁপতাল) ব্রহ্মসঙ্গীত। মিশ্র প্রভাতী সুরের একতালা—"সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে" এবং একটি কীর্তন— "হরিরস-মাদিরা পিয়ে।" ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের দু'টি গান—একটি ব্রহ্মসঙ্গীত— "এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনে···" (কাফী, ঠুংরী) ও একটি কীর্তন—"চিন্ময় মম মানস হরি চিদঘন নিরঞ্জন।"

এই দিনের সঙ্গীতপ্রসঙ্গেসংশ্লিষ্ট ঘটনা কথামৃতে যেমনটি আছে;—

"এইবার নরেন্দ্র গান গাইবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তেরা শুনিবেন। নরেন্দ্র গাইতেছেন—

গান— পরবত পাথার।
ব্যোমে জাগ রুদ্র উদ্যতবাজ।···
দেব দেব মহাদেব, কাল কাল মহাকাল,
ধর্মরাজ শঙ্কর শিব, তার হর পাপ।

গান— সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে,
বহিছে অমৃতধার, জুড়ায় শ্রবণ, প্রাণরমণ হে।

গান— বিপদ ভয় বারণ, যে করে ওরে মন,
তাঁরে কেন ডাক না।
মিছে ভ্রমে ভুলে সদা রয়েছ ভবঘোরে মজি
এ কি বিড়ম্বনা॥
এ ধন জন না রবে হেন, তাঁরে যেন ভুল না।
ছাড়ি অসার ভজহ সার, যাবে ভব-যাতনা॥
এখন হিত বচন শোন, যতনে করি ধারণা।
বদন ভরি নাম হরি সতত কর ঘোষণা॥

যদি এ ভবে পার হবে ছাড় বিষয়বাসনা।
সঁপিয়ে তনু হৃদয় মন তাঁর কর সাধনা॥

পল্টু—সেই গানটি গাইবেন?

নরেন্দ্র—কোন্‌টি?

পল্টু—দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে, কি ভয় সংসার শোক ঘোর বিপদ-শাসনে।

নরেন্দ্র সেই গানটি গাইতেছেন—

দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে,
কি ভয় সংসার শোক ঘোর বিপদশাসনে।
অরুণ-উদয়ে আঁধার যেমন যায় জগত ছাড়িয়ে,
তেমনি দেব, তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে;
ভকত-হৃদয় বীতশোক তোমার মধুর সান্ত্বনে।
তোমার করুণা, তোমার প্রেম, হৃদয়ে প্রভু ভাবিলে,
উথলে হৃদয়, নয়ন-বারি রাখে কে নিবারিয়ে;
জয় করুণাময়, জয় করুণাময়, তোমার গুণ গাইয়ে,
যায় যদি যাক্ প্রাণ তোমার কর্ম সাধনে॥

মাস্টারের অনুরোধে আবার গাইতেছেন। মাস্টার ও অনেকে হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন।

গান— হরিরস-মদিরা পিয়ে মম মানস মাত রে।
একবার লুঠহ অবনীতল, হরি হরি বলে কাঁদ রে।
(গতি কর কর বলে)।

গভীর নিনাদে হরি-নামে গগন্ ছাও রে;
নাচো হরি বলে, দুবাহু তুলে, হরিনাম বিলাও রে।
(লোকের দ্বারে দ্বারে)।

হরি প্রেমানন্দ-রসে, অনুদিন ভাস রে;
গাও হরিনাম, হও পূর্ণকাম, নীচ বাসনা নাশ রে।
(নাম সুধা পিয়ে)॥

গান— চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন।

গান— চমৎকার অপার জগৎ রচনা তোমার।

গান— গগনের থালে রবিচন্দ্র-দীপক জ্বলে,
তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে।
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুটন্ত জ্যোতি রে।
কেমন আরতি হে ভবখণ্ডনে তব আরতি,
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে॥

গান— সেই এক পুরাতন, পুরুষ নিরঞ্জনে, চিত্ত সমাধান কররে।

নারাণের অনুরোধে আবার গাইতেছেন—

এস মা এস মা ও হৃদয়-রমা, পরাণপুতলি গো।
(এস মা, পাপী তাপীর গতি কর গো)
হৃদয়াসনে একবার হও মা আসীন, নিরখি তোরে গো।
জন্মাবধি তব মুখপানে চেয়ে, আমি ধরি এ জীবন যে যাতনা সয়ে,
তা'তো জানো মাগো;
একবার হৃদয়কমল বিকাশ করিয়ে, প্রকাশো তাহে,
আনন্দময়ী গো॥"[২২]

তার পর ১৪ই জুলাই-এর (১৮৮৫ খৃঃ) গানের কথা। এইদিনও বলরাম বসুর বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ আসেন এবং নরেন্দ্রনাথ তাঁকে কয়েকটি ধ্রুপদাঙ্গের ব্রহ্মসঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত, ইত্যাদি শোনান। তার মধ্যে একটি রবীন্দ্রনাথের গান আছে। এই নিয়ে তাঁর তৃতীয়বার রবীন্দ্রনাথের গান গাইবার কথা পাওয়া গেল। "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা" (আলাইয়া, ঝাঁপতাল) গানখানি—যা পরে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে—নরেন্দ্রনাথ সেদিন বলরাম বসুর বাড়ীতে গেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, এই গানটি রবীন্দ্রনাথ আমেদাবাদ-বাসকালে রচনা করেন। পরে কিছু সংস্কার করে তাঁর বৌঠাকুরাণী শ্রীমতী কাদম্বরী দেবীকে "ভগ্নহৃদয়" কাব্য-গ্রন্থ উৎসর্গের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ-পত্র স্বরূপ মুদ্রিত হয়। আরও পরে পরিবর্তিত আকারে রবীন্দ্রনাথ গানখানি ব্রহ্মসঙ্গীতরূপে প্রচার করেন। এই গানটি প্রকাশিত হয় "রবিচ্ছায়া" পুস্তকে।[২৩]

এই দিনে নরেন্দ্রনাথ ত্রৈলোক্যনাথের "নিবিড় আঁধারে মা তোর" নামে পূর্বে গীত গানটি, নীলকান্ত মুখোপাধ্যায় রচিত "কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার" (সুরটমল্লার, একতালা), ইত্যাদি গানও করেন। এই দিনের বিবরণে দেখা যায় যে তিনি বিনা তানপুরায় গাইতে ইচ্ছুক ছিলেন না।—

…"শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রকে)—একটু গা না।

…নরেন্দ্র…বলছেন, যন্ত্র নাই শুধু গান—

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমাদের বাছা যেমন অবস্থা। এইতে পার তো গাও। তাতে বলরামের বন্দোবস্ত।…

…এইবার নরেন্দ্র গাইতেছেন—

(১) কত দিনে হবে সে প্রেমসঞ্চার।
হয়ে পূর্ণকাম বলবো হরিনাম, নয়নে বহিবে প্রেম-অশ্রুধার॥

(২) নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান করে হয়ে গিরি গুহাবাসী॥…

নরেন্দ্র ভাব-পূর্ণ হইয়া তানপুরা লইয়া আবার গান গাহিতেছেন—

(১) এস মা এস মা ও হৃদয়-রমা, পরাণপুতলি গো।
(এস মা পাপী তাপীর গতি কর গো)

(২) মা ত্বং হি তারা, তুমি ত্রিগুণধারা পরাৎপরা।
আমি জানি গো ও দীন দয়াময়ী, তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা॥
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা।
তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী, সদাশিবের মনোরমা॥
তুমি জলে তুমি স্থলে তুমি আদ্য মূলে গো মা।
তুমি সর্ব ঘটে অর্ঘপুটে, সাকার আকার নিরাকার॥

(৩) তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা।

নরেন্দ্র গান গাইতেছেন—

কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা, সুধাতরঙ্গিণী।
তুমি রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দাও জননী॥

ভাবোন্মত্ত হইয়া নরেন্দ্র বার বার গাইতে লাগিলেন—

'কভু কমলে কমলে থাকো মা পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী।'

……নরেন্দ্র ভাবাবিষ্ট হইয়া সাশ্রুনয়নে গান গাহিতেছেন দেখিয়া ঠাকুর অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।" ২৪

দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন শ্রীরামকৃষ্ণকে নরেন্দ্রনাথের গান শোনাবার এই শেষ প্রসঙ্গ। কারণ এর কিছু পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্যে।

এই সময় থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের গলায় ক্যান্সার রোগের সূত্রপাত হয়। দক্ষিণেশ্বরে থেকে চিকিৎসার অসুবিধা হবে দেখে তাঁর ভক্ত ও সেবকেরা তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসেন ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে (২রা আশ্বিন)। কলকাতায় তাঁকে ৫৫, শ্যামপুকুর স্ট্রীটে (গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্যের) বাড়ীতে রাখা হয়। এই বাড়ীটিই শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনীতে এবং "কথামৃত" গ্রন্থাবলীতে "শ্যামপুকুর বাটী" নামে উল্লিখিত আছে।

শ্যামপুকুরের এই বাড়ীতে বাস করবার আগে বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখার্জী স্ট্রীটে একটি বাড়ীতে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু বাড়ীটি বদ্ধ বলে শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে থাকতে পারেন নি এবং তাঁর শ্যামপুকুরে উক্ত ঠিকানার বাড়ীতে বাসের ব্যবস্থা হয়। সেখানে মাস তিনেক থাকবার পরে তাঁকে অধিকতর মুক্তস্থানে রাখবার জন্যে নিয়ে আসা হয় কাশীপুরে। কাশীপুরের এই উন্মুক্ত বাগানবাড়ীতে তিনি আসেন ১১ই ডিসেম্বর (১৮৮৫ খৃঃ)। রামকৃষ্ণ অনুরাগীদের নিকট এইটিই "কাশীপুরের বাগানবাড়ী" নামে সুপরিচিত। বাড়ীখানির তৎকালীন মালিক ছিলেন শরৎচন্দ্র ঘোষ, পাইকপাড়ার সিংহ পরিবারের বিখ্যাত সাধক লালাবাবু ও রাণী কাত্যায়নীর জামাতা। ঘোষ মহাশয়ের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবকেরা বাড়ীখানি মাসিক ৮০৲ টাকায় ভাড়া নেন। ৯০, কাশীপুর রোডের সেই বাড়ী "কাশীপুর উদ্যানবাটী" নামে শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিমন্দিররূপে বর্তমান স্বত্বাধিকারী বেলুড় মঠ কর্তৃক সুরক্ষিত আছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুর বাড়ীতে বাসের সময় থেকে স্বনামধন্য চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেছিলেন। তার আগে বলরাম বসুর বাড়ীতে অবস্থানের সময় কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ তাঁর চিকিৎসা করেন। ইংরেজ ডাক্তাররাও তাঁকে দেখেছিলেন।

শ্যামপুকুর বাড়ীতে যে তিনমাস শ্রীরামকৃষ্ণ বাস করেছিলেন, তার মধ্যে নরেন্দ্রনাথের তাঁকে চারদিন গান শোনাবার কথা "কথামৃত"তে পাওয়া যায়। সেই চারদিনের বিবরণ এবারে কালানুক্রমিক উদ্‌ধৃত করা হবে।

শ্যামপুকুর বাড়ীতে নরেন্দ্রনাথের প্রথম গানের প্রসঙ্গ আছে ২৪ অক্টোবর, ১৮৮৫ তারিখে। এইদিনে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে অনেকগুলি গান শুনিয়েছিলেন। সেদিনে সাতটি এবং তার তিনদিন পরে, অর্থাৎ ২৭ অক্টোবর, তিনটি। প্রথম দুটির মধ্যে বেশীর ভাগই ধ্রুপদাঙ্গের এবং শুধু একটিমাত্র কীর্তন (পুণ্ডরীকাক্ষের "হরিরস মদিরা পিয়ে")।

এদিনেও নরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা" ও দ্বিজেন্দ্রনাথের "চমৎকার অপার জগৎ রচনা তোমার" গান দুটি গেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আর একখানি নতুন ধ্রুপদাঙ্গের গান গাইবার কথাও জানা যায়। এই চতুর্থবার নরেন্দ্রনাথ তাঁর গান গাইবার কথা পাওয়া গেল। গানটি হ'ল—"মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতা"। এই গানখানিও রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগে রচিত আটটি ব্রহ্মসঙ্গীতের অন্যতম এবং প্রথমে "রবিচ্ছায়া" ও পরে "গানের বহি"তে প্রকাশিত হয়। [২৫]

এইদিন নরেন্দ্রনাথের গানের শ্রোতাদের মধ্যে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারও ("ডাক্তার" নামে উল্লিখিত) উপস্থিত ছিলেন এবং গান শুনে তিনি "মুগ্ধ-প্রায়" হয়েছিলেন বলে' প্রকাশ।

"ঠাকুর নরেন্দ্রকে গান গাইতে বলিতেছেন। নরেন্দ্র গাইতেছেন"—

(১) তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা···

(২) অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা।

(৩) চমৎকার অপার জগৎ রচনা তোমার।
শোভার আগার বিশ্বসংসার।

(৪) মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিত,
তোমারই রচিত ছন্দ, মহান্‌ বিশ্বের গীত।
মর্তের মৃত্তিকা হয়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে
আমিও দুয়ারে তব হয়েছি হে উপনীত।
কিছু নাহি চাহি, দেব, কেবল দর্শন মাগি।
তোমারে শুনাব গীত, এসেছি তাহার লাগি।

গাহে যেথা রবি শশী, সেই সভা-মাঝে বসি,
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত।

(৫) ওহে রাজ রাজেশ্বর দেখা দাও।
করুণাভিখারী আমি করুণাকটাক্ষে চাও॥
চরণে উৎসর্গ দান করিয়াছি এই প্রাণ,
সংসার অনল কুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও॥
কলুষকলঙ্কে তাহে অবারিত এ হৃদয়;
মোহে মুগ্ধ মৃতপ্রায়, হয়ে আছি দয়াময়,
মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রে শোধন করিয়ে লও॥

(৬) হরিরস মদিরা পিয়ে মম মানস মাত রে।
লুটায়ে অবনীতল, হরি হরি বলি কাঁদ রে॥

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর যো কুচ হায় সব তুহি হায়;

ডাক্তার—আহা।

গান সমাপ্ত হইল। ডাক্তার মুগ্ধপ্রায় হইয়াছেন। [২৬]

এখানে ২৪ অক্টোবর নরেন্দ্রনাথ আরো তিনখানি ব্রহ্মসঙ্গীত গেয়েছিলেন। (১) যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে···। (২) অন্তরে জাগিছ ওমা অন্তর যামিনী···। (৩) কি সুখ জীবনে ওহে নাথ দয়াময়···। এই তিনখানি গানই তিনি আগেও গেয়েছিলেন। সেজন্য পুনরুক্তি করা হল না।

তার পরদিন (২৫ অক্টোবর, ১৮৮৫ খৃঃ)। এইদিন নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরোধে তাঁকে দুটি পুরণো গান শোনান, "তানপুরা সঙ্গে। অন্য বাজনাও হইতে লাগিল।" গান দুটি হল—"সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে" এবং "আমায় দে মা পাগল করে।"

···"গানের পরে আবার অদ্ভুত দৃশ্য। সকলেই ভাবে উন্মত্ত।"··· [২৭]

তার একদিন পরের (২৭ অক্টোবর) বিবরণে দেখা যায় যে শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর খুবই অসুস্থ। সেজন্যে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার জানালেন যে নরেন্দ্রনাথের গান শোনা শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে ভয়ের কারণ। নরেন্দ্রনাথের গানের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর যে ভাবের উত্তেজনা হয় তাতে তাঁর ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু তিনি নরেন্দ্রনাথের গান না শুনে থাকতে পারেন না।

সেজন্যে ডাঃ মহেন্দ্রলালের আপত্তি সত্ত্বেও নরেন্দ্রনাথের গান হ'ল এবং শ্রীরামকৃষ্ণ তা শুনলেনও।

এদিনেও নরেন্দ্রনাথ কয়েকটি আগেকার গাওয়া গান শ্রীরামকৃষ্ণকে শুনিয়েছিলেন। যেমন, দ্বিজেন্দ্রনাথের "চমৎকার অপার", ত্রৈলোক্যনাথের "নিবিড় আঁধারে মা তোর" এবং নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়ের "কত দিনে হবে সে প্রেমসঞ্চার।" প্রসঙ্গত বলা যায় যে এই তিনটির মধ্যে প্রথম দু'খানি নরেন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিল, কারণ তিন চার দিন গান দু'খানি তিনি গেয়েছিলেন বলে "কথামৃত"তেই উল্লেখ রয়েছে। হয়ত আরো বেশিবার গেয়েছেন, কারণ তাঁর সব দিনের গানের বিবরণ অবশ্যই লিপিবদ্ধ হয়নি।

নতুন গানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আর একটি গান পাওয়া যায়।

"একি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ।"

এ গানখানিও রবীন্দ্রনাথের সেই আটটি ব্রহ্মসঙ্গীতের অন্যতম "রবিচ্ছায়া" ও "গানের বহি"তে প্রকাশিত হয়েছিল। এই নিয়ে নরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের পাঁচখানি গান গাইলেন।

নরেন্দ্রনাথ এইদিন পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় রচিত একটি কীর্তনাঙ্গের গানও গেয়েছিলেন—"কি সুখ জীবনে মম—" (খয়রা তাল)।

এবারে তাঁর গানের বিবরণ উদ্ধৃত হল :—

"ডাক্তার আবার বসিলেন। তখন নরেন্দ্রনাথ মধুরকণ্ঠে গান করিতেছেন। তৎসঙ্গে তানপুরা ও মৃদঙ্গ ঘন ঘন বাজিতেছে। গাইতেছেন—

(১) চমৎকার অপার জগৎ রচনা তোমার···

(২) নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি···

ডাক্তার মাস্টারকে বলিলেন, "It is dangerous for him"—এ গান ঠাকুরের পক্ষে বিপজ্জনক—ভাবসমাধি ঘটতে পারে এবং তাতে বিপদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল্‌লে ?"

তিনি উত্তর করিলেন, "ডাক্তার ভয় করছেন পাছে আপনার ভাবসমাধি হয়।" বলিতে বলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ একটু ভাবস্থ হইয়াছেন ; ডাক্তারের মুখপানে তাকাইয়া করজোড়ে বলিলেন, "না না, কেন ভাব হবে ?" কিন্তু কথা বলিতে বলিতে তিনি গভীর ভাবসমাধিতে মগ্ন হইলেন। শরীর স্পন্দনহীন, নয়ন স্থির।···আর সে মানুষ নয়। নরেন্দ্রের মধুরকণ্ঠে গান চলিতেছে—

"একি এ সুন্দর শোভা! কি মুখ হেরি এ!
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়নাথ, প্রেম উৎস উথলিল আজি।
বলো হে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী, কি ধন তোমারে দিব উপহার।
হৃদয় প্রাণ লহো লহো তুমি, কি বলিব—
যাহা কিছু আছে মম, সকলই লও হে নাথ।"

গান— কি সুখ জীবনে মম, ওহে নাথ দয়াময় হে।
যদি চরণ সরোজে পরাণ মধুপ চিরমগন না রয় হে।
অগণন ধনরাশি তায়, কিবা ফলোদয় হে;
যদি লভিয়ে সে ধনে, পরম রতনে, যতন না করয় হে।
সুকুমার কুমার মুখ, দেখিতে না চাই হে;
যদি সে চাঁদ বয়ানে, তব প্রেমমুখ দেখিতে না পাই হে।
কি ছার শশাঙ্কজ্যোতি, দেখি আঁধারময় হে;
যদি সে চাঁদ প্রকাশে, তব প্রেমচাঁদ, নাহি হয় উদয় হে।
সতীর পবিত্র প্রেম তাও মলিনতাময় হে;
যদি সে প্রেমকণাতে, তব প্রেমমণি, নাহি জড়িত রয় হে।
তীক্ষ্ণ-বিষা ব্যালী-সম, সতত দংশায় হে;
যদি মোহ পরমাদে নাথ তোমাতে ঘটায় সংশয় হে।
কি আর বলিব নাথ, বলিব তোমায় হে;
তুমি হে আমার হৃদয়রতনমণি আনন্দ নিলয় হে।

"সতীর পবিত্র প্রেম" এই অংশ শুনিতে শুনিতে ডাক্তার অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিয়া উঠিলেন—আহা, আহা,

নরেন্দ্র আবার গাইতেছেন—

কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার··· ।" ২৮

তার চারদিন পরে (৩১ অক্টোবর) নরেন্দ্রনাথের গানের প্রসঙ্গ আবার পাওয়া যায়। এই দিনের বিবরণে আছে, নরেন্দ্রনাথের গান শোনবার জন্যে শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করছেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁকে তিনখানি পুরনো গান শোনালেন তাঁর অনুরোধে। "হরিরস মদিরা পিয়ে", "চিদানন্দ সিন্ধুনীরে" এবং "চিন্তয় মম মানস হরি।" গান তিনটি এখানে আর সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করবার প্রয়োজন নেই।—

"এত অসুখের উপর ঠাকুরের ভাবাবেশ হইতেছে দেখিয়া ভক্তেরা চিন্তিত হইয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন— ঐ গানটি হলে আমি থাম্‌বো— "হরিরস মদিরা।"

নরেন্দ্র কক্ষান্তরে ছিলেন। তাঁকে ডাকানো হইল। তিনি তাঁহার দেবদুর্লভ কণ্ঠে গান শুনাইতেছেন—

হরিরস মদিরা পিয়ে মম মানস মাত রে······

নরেন্দ্র গাইতেছেন—

(১) চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দ লহরী······

(২) চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন। [২৯]

শ্যামপুকুর বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ সন্নিধানে নরেন্দ্রনাথের গানের প্রসঙ্গ এই খানেই শেষ। তার পরে শ্রীরামকৃষ্ণকে কাশীপুরের বাগান বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়। রোগ নিরাময়ের আশা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। শ্যামপুকুরের চেয়ে উন্মুক্ত পরিবেশে তাঁকে রাখবার জন্যে আনা হ'ল এই বাগান বাড়ীতে।

এখানে শ্রীরামকৃষ্ণকে নরেন্দ্রনাথের চারদিন গান শোনাবার কথা জানা যায়। তিনদিনের বিবরণ আছে "কথামৃত" গ্রন্থাবলীতে এবং একদিনের কথা মহেন্দ্রনাথ দত্ত উল্লেখ করেছেন।

কাশীপুরে নরেন্দ্রনাথের প্রথম গানের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন করবার প্রায় চারমাস পরে—১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ মার্চ তারিখে। সেদিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে দুটি কীর্তন এবং শঙ্করাচার্যের একটি স্তোত্র গান করে শোনান।—

"ঠাকুর নরেন্দ্রকে একটু গান গাইতে বলিতেছেন। নরেন্দ্র সুর করিয়া গাহিতেছেন—

"নলিনীদলগত জলমতিতরলম্ তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্ ;
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা।"

দুই এক চরণ গানের পরেই ঠাকুর নরেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন, "ও কি! ওসব ভাব অতি সামান্য।"

নরেন্দ্র এইবার সখী-ভাবের গান গাহিতেছেন—

কাহে সই জিয়ত মরত কি বিধান!
ব্রজকি কিশোর সই, কাঁহা গেল ভাগই, ব্রজজন টুটায়ল পরাণ॥

মিলি সই নাগরী, ভুলি গেই মাধব, রূপবিহীন গোপকুঙারী।
কো জানে পিয়া সই, রসময় প্রেমিক, হেন বঁধু রূপ কি ভিখারী ॥
আগে নহি বুঝনু, রূপ হেরি ভুলনু, হৃদি কৈনু চরণ যুগল।
যমুনা সলিলে সই, অব তনু ডারব, আন সখি ভখিব গরল ॥
(কিবা) কানন বল্লরী গল বেঢ়ি বাঁধই, নবীন তমালে দিব ফাঁস।
নহে শ্যাম নাম জপই, ছার তনু করিব বিনাশ ॥

গান শুনিয়া ঠাকুর ও ভক্তেরা মুগ্ধ হইয়াছেন। ঠাকুর ও রাখালের নয়ন দিয়া প্রেমাশ্রু পড়িতেছে। নরেন্দ্র আবার ব্রজগোপীর ভাবে মাতোয়ারা হইয়া কীর্তনের সুরে গাহিতেছেন—

তুমি আমার, আমার বঁধু (কি বলি তোমায় বলি নাথ)।
(কি জানি কি বলি আমি অভাগিনী নারী জাতি)।
তুমি হাতোকি দর্পণ, মাথোকি ফুল,
(তোমায় ফুল করে কেশে পরব বঁধু)।
(তোমায় কবরীর সনে লুকায়ে লুকায়ে রাখব বঁধু)
(শ্যামফুল পরিলে কেউ নখ্‌তে নারবে)।
তুমি নয়নের অঞ্জন বয়ানের তাম্বুল
(তোমায় শ্যাম অঞ্জন করে এঁকে পরব বঁধু)
(শ্যাম অঞ্জন পরেছি বলে কেউ নখ্‌তে নারবে)
তুমি অঙ্গকি মৃগমদ গিমকি হার।
(শ্যামচন্দন মাখি শীতল হব বঁধু)
তোমার হার কণ্ঠে পরব বঁধু। তুমি দেহ কি সর্বস্ব গেহ কি সার ॥
পাখীকো পাখ্‌ মীনকো পাণি। ত্যৈয়সে হাম বঁধু তুয়া মানি ॥ ৩০

তার একমাস পরে, ১৭ এপ্রিল, নরেন্দ্রনাথের গানের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। সেদিন তিনি একটিমাত্র গান করেন এবং সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন না।

"নরেন্দ্র নীচে আসিয়াছেন। আপনা আপনি গান গাহিতেছেন—

"সব দুখ দূর করিলে
দরশন দিয়ে মোহিলে প্রাণ।
সপ্ত লোক ভুলে শোক তোমারে পাইয়ে
কোথা আমি অতি দীন হীন।" ৩১

শ্রীরামকৃষ্ণকে নরেন্দ্রনাথের শেষ গান শোনাবার যে বিবরণ "কথামৃত"তে পাওয়া যায় তার তারিখ হ'ল—২২ এপ্রিল (১৮৮৬ খৃঃ)। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের প্রায় চারমাস আগেকার কথা। এইদিন তিনি নির্বাণষটক ও কৌপীনপঞ্চক গান করে শুনিয়েছিলেন। তা' ছাড়া অন্য দুখানি গান গেয়েছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সংস্কৃত ভাষায় (রচিত)—"পরিপূর্ণমানন্দা" (দেশ, তেওট) ও একটি ভজন*—"তুঝ সে হাম্ নে দিল্‌কো…" (পাহাড়ী, আদ্ধা)।

"ঠাকুর মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নরেন্দ্র আছে? তাকে ডেকে আন।"

নরেন্দ্র উপরে আসিলেন ও ঠাকুরের কাছে বসিলেন।

… … … …

নরেন্দ্র নির্বাণষটক সুর করিয়া বলিতেছেন—

"ওঁ মনোবুদ্ধ্যাহঙ্কারচিত্তানি নাহং, ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণ নেত্রে……"

নরেন্দ্র সুর করিয়া কৌপীনপঞ্চক গাহিতেছেন—

বেদান্ত বাক্যেষু সদা রমন্তো ভিক্ষান্ন মাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।……"

নরেন্দ্র আবার গাহিতেছেন—

পরিপূর্ণমানন্দম্।
অঙ্গবিহীনং স্মর জগন্নিধানম্।
শ্রোত্রস্য শোত্রং মনসোমন যদ্বাচোহ বাচং বাগতীতং,
প্রাণস্য প্রাণং পরং বরেণ্যম্।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—আর ঐটে "যে কুছ্ হ্যায় সব তুঁ হি হ্যায়।"

নরেন্দ্র ঐ গানটি গাহিতেছেন—

তুঝসে হাম্‌নে দিল্‌কো লাগায়া যে কুছ হ্যায় সব তুঁহি হ্যায়।
এক তুঝ কো আপনা পায়া যে কুছ হ্যায় সব তুঁহি হ্যায়।
দেল্‌কী মকা সব কী মকী তু, কোন্ সা দিল্ হ্যায় যিস্ মে নাহি তু,
হরি এক দিল্ মে তুনে সমায়া, যে কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।……" ৩২

* কোন কোন সঙ্গীত সংকলন গ্রন্থে এই ভজনটিকে গুরু নানকের রচনা বলা হয়েছে। কিন্তু গানটির যথার্থ রচয়িতা হলেন, শেষ মোগল বাদশা বাহাদুর শাহ্। গানখানি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করলে দেখা যাবে যে, শেষে ভণিতা আছে—'জাফর'। দিল্লীর বাদশা বাহাদুর শাহ্ তাঁর রচিত গানে 'জাফর' ভণিতা দিতেন।

কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথের শেষ সঙ্গীত প্রসঙ্গ মহেন্দ্রনাথ দত্তের বিবরণী থেকে উদ্ধৃত ক'রে দেওয়া হ'ল—

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পীড়া ক্রমেই বাড়িতে লাগিল এবং আরোগ্যের কোন আশা রহিল না। নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি রাত্রিতে উদ্দাম কীর্তন শুরু করিলেন। চীৎকার ধ্বনিতে বাড়ী কাঁপিতে লাগিল। অনেকে মনে করিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ অল্পদিনের মধ্যেই দেহরক্ষা করিবেন। এই সব ছোঁড়াদের আমোদ আহ্লাদ স্ফূর্তি দেখ, বয়সটা জোয়ান কিনা, তাই বুদ্ধিশুদ্ধি কম। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কীর্তনীর দলের ভিতর থেকে একজনকে ডাকালেন এবং ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন, "তোরা ত' বেশ রে, কেউ মরে আর কেউ হরি হরিবোল বলে।" উপস্থিত লোকটি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইল। কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরক্ষণেই অতি আহ্লাদ করিয়া বলিলেন, "ওর সুরটা এইরকম, অমুক জায়গায় এক কলি তোরা ভুলেছিলি। ঐখানে এই কলিটা দিতে হয়।" উপস্থিত যুবকটি প্রত্যাগমন করিয়া ভ্রাতৃবৃন্দকে সেই বিষয় বলিলেন ও সুর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া ও কলিটি সংশোধন করিয়া উদ্দাম কীর্তন শুরু করিলেন। কীর্তনের আনন্দে সকলে বিভোর হইয়া অনেকরাত্রি অতিবাহিত করিলেন। মহাশোকের ভিতরও মনটাকে কিরূপে বৈরাগ্যভাব দিয়া ভগবানে লইয়া যাওয়া যায় ইহা তাহার দৃষ্টান্ত।…নরেন্দ্রনাথের মনে হইল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ত আর দেহ রাখিবেন না। তবে এই সময়ে যাহাকে সম্মুখে পাইব তাহাকেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে স্পর্শ করাইয়া মুক্তিলাভ করাইব। তিনি তাঁহার খুড়তুত ভাই শ্রীঅমৃতলাল দত্তকে (সুপ্রসিদ্ধ বাদ্যাচার্য হাবু দত্ত) সঙ্গে লইয়া গেলেন।……নরেন্দ্রনাথ এই সময়ে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাইয়া অতি ব্যগ্রভাবে বলিতে লাগিলেন, "তোমার ত শরীর দিনকতক পরেই যাবে, আমার কি ক'রে দেবে দাও।"

শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, "ওরে, আমি মরছি, এই সময় তোর যত উৎপাত।"

নরেন্দ্র তাহাতে বিশেষ জোর করিয়া বলিলেন, "সেই জন্যেই ত বল্‌ছি। ডাক্তার ব'লে গেছে তোমার ব্যামো ভাল হবে না, শরীর ত যাবে, তবে আমার কি ক'রে দেবে দাও।"

হৃদয়ে নির্ভীক ভালবাসা থাকিলে একজন অপরকে এইরূপ স্থলে এই-রূপই কহিতে পারে। তারপরে কথিত আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ নিভৃত সময়েতে নরেন্দ্রনাথকে বিশেষ শক্তি-সঞ্চার করিয়াছিলেন।" ৩৩

শ্রীরামকৃষ্ণকে নরেন্দ্রনাথের গান শোনাবার আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

অবশেষে, ১৫ই আগস্ট রবিবার (১৮৮৬ খৃঃ) শ্রীরামকৃষ্ণ দেহত্যাগ করলেন। নরেন্দ্রনাথের জীবনেরও একটি পর্বের অবসান হল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ—

(১) গুরুপ্রাণ রামচন্দ্রের অনুধ্যান, পৃঃ ৪২, পাদটীকা—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।

(২) বিবেকানন্দ চরিত, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৮৩—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

(৩) Life of Swami Vivekananda—Patriot Prophet, p. 155. —Dr. B. N. Datta.

(৪) Life of Swami Vivekananda, p. 24—By his Eastern & Western disciples.

(৫) Same book, p. 30— ,, ,, ,,

(৬) শ্রীবিবেকানন্দ কাব্যগীতি, পৃঃ ৬৪—স্বামী শ্যামানন্দ।

(৭) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৫২—শ্রীম

(৮) Life of Swami Vivekananda, p. 44-45—By his Eastern & Western disciples.

(৯) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ৩৮৯—শ্রীম.

(১০) ,, ,, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ২৭— ,,

(১১) ,, ,, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ১, ৬-৮, ১০—শ্রীম.

(১২) শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৩২ —মহেন্দ্রনাথ দত্ত।

(১৩) বিচিত্র সংলাপ—রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ—প্রমথনাথ বিশী, কথাসাহিত্য, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৬৮।

(১৪) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ১৬-১৮—শ্রীম.

(১৫) ,, ,, প্রথম ভাগ, পৃঃ ১৪৫-৪৭—,,

(১৬) ,, ,, চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ১৬৩-৬৬—,,

(১৭) রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড, পরিবর্ধিত সংস্করণ, পৃঃ ৮৪, পাদটীকা —প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

(১৮) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ১৯৩-৯৬, ২০০-১—শ্রীম.

(১৯) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ১৯৫, ২১১—শ্রীম.
(২০) ,, ,, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ১৮৬-৮৭, ১৯২-৯৩, ১৯৭—,,
(২১) ,, ,, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩০৫-৬— শ্রীম.
(২২) ,, ,, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ২৩৮-৪০ — ,,
(২৩) রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড, পরিবর্ধিত সংস্করণ, পৃঃ ৮৬, ৯৫ —প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
(২৪) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ২৮৮-৯২—শ্রীম.
(২৫) রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৮৪, পাদটীকা —প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
(২৬) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ৩৪৫-৬—শ্রীম.
(২৭) ,, ,, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩৪৪— ,,
(২৮) ,, ,, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩৬৬— ,,
(২৯) ,, ,, চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ৩৫৮-৫৯—,,
(৩০) ,, ,, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ৩৬২— ,,
(৩১) ,, ,, চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ৩৭৩— ,,
(৩২) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৩৫৫-৫৯—শ্রীম
(৩৩) শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৮-১১—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।

অতিরিক্ত গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। ব্রহ্মসঙ্গীত—আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত।
২। বিবিধ ধর্মসঙ্গীত—প্রসন্নকুমার সেন সঙ্কলিত।
৩। ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্তন—ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রকাশিত।
৪। সাধন সঙ্গীত—স্বরলিপিসহ—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর প্রকাশিত।
৫। সঙ্গীত সংগ্রহ—রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় প্রকাশিত।
৬। ব্রহ্মসঙ্গীত—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত।
৭। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ত্রিবেণী সঙ্গম—ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।
৮। ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি—কাঙ্গালীচরণ সেন।

সর্বপর্বে সঙ্গীত

শ্রীরামকৃষ্ণের সমীপে নরেন্দ্রনাথের গানের প্রসঙ্গ ধারাবাহিকতার জন্যে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগ পর্যন্ত আগের অধ্যায়ে বিবৃত করা হয়েছে। এখানে আবার সেই সময়ের, অর্থাৎ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের, আগেকার কয়েক বছরে ফিরে যেতে হবে। কারণ নরেন্দ্রনাথের জীবনে তখনকার কালেও গানের কথা অনেক আছে। তা' ছাড়া, নরেন্দ্রনাথের জীবনের ক্রম-ও উল্লেখযোগ্য। কারণ তাঁর সঙ্গীতপ্রসঙ্গ তাঁর জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কিত। জীবনের সর্বপর্বে এবং সর্ব অবস্থায় তাঁর গানের কথা পাওয়া যায়। সেজন্যে তাঁর জীবনের কালানুক্রমিক বিবরণ এই পুস্তকে অনুসরণ করতে হয়েছে।

বাহুল্য হলেও একবার বলে রাখা দরকার যে, তিন চার বছর ওস্তাদের শিক্ষাধীনে সঙ্গীতচর্চা করবার পরে তিনি আর নিয়মিত সঙ্গীত সাধনার সুযোগ পান নি। পারিবারিক বিপর্যয় এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে জীবনের গতি অগ্রসর হওয়া ইত্যাদি তার কারণ। কিন্তু তাঁর জীবনকথা সবিস্তারে লক্ষ্য করলে একটি বিষয় পরিষ্কার জানা যায়। তা' হ'ল, কোন অবস্থাতেই এই অধীত বিদ্যার অর্থাৎ সঙ্গীতের চর্চা তিনি একেবারে ত্যাগ করেন নি এবং গান বরাবরই গেয়েছেন। তবে গান তাঁর মানসজীবনের ভাব প্রকাশের বাহন হওয়ায় তিনি গাইতেন বিশেষ ধরণের গান, যা তাঁর তৎকালীন মনোভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হ'ত। কখনো তিনি গাইতেন বাংলা ধ্রুপদাঙ্গের শ্যামাসঙ্গীত, কখনো কীর্তন, কখনো হিন্দী ভজন, কখনো শ্যামা-সঙ্গীত, কখনো গিরিশচন্দ্রের বৈরাগ্যের গান, কখনো স্বরচিত গান।

অন্তর্লোক, পরিবেশ ইত্যাদি ভিন্ন হওয়ায় রাগসঙ্গীত তিনি তেমন বেশি গাইতেন না। অন্তত তার উল্লেখ বিশেষ পাওয়া যায় না। কিন্তু রাগসঙ্গীত তিনি সম্পূর্ণ বর্জন করেন নি, এতখানি পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্যেও। এই থেকে তাঁর রাগসঙ্গীত-প্রীতির কথা বোঝা যায়। এই ধরণের গান গাইবার কয়েকবার উল্লেখ দেখা যায় তাঁর জীবনের নানা সময়ে। যথা,—শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে, পরিব্রাজক জীবনে খেতরী রাজ্যের রাজসভায়, নিবেদিতাকে দীক্ষা দেবার দিন বেলুড় মঠে, ইত্যাদি। যথাসময়ে এই অধ্যায়ে সেসব বিবরণ দেওয়া হবে।...

এখানে নরেন্দ্রনাথের পূর্ব-বৃত্তান্ত একবার বলে নেওয়া প্রয়োজন।

সম্ভবত বি. এ. ক্লাসে পড়বার সময়ে, পরীক্ষা দেবার আগে, ওস্তাদের অধীনে সঙ্গীতশিক্ষা তাঁর বন্ধ হয়। তার কারণ যে কলেজের লেখাপড়ার চাপ, তা' অবশ্যই নয়। অসাধারণ মেধাবী ছাত্র নরেন্দ্রনাথ কলেজের পড়াশোনার জন্যে সামান্য সময় ব্যয় করতেন এবং বরাবরই তাঁর পরীক্ষার ফল ভাল হ'ত। কলাবতের শিক্ষা বন্ধ হবার কারণ ছিল অন্য, যা' তাঁর জীবনীপাঠকদের জানা আছে। এই সময় থেকে তাঁর মনোজগতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ক্রমেই তাঁর সম্পর্ক শিথিল হয়ে যায় এবং শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে তিনি সন্ন্যাসের পথের পথিক হন। তাঁর অন্তরের আধ্যাত্মিক আকুলতা শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁকে ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ করে। প্রধানত এই সমস্ত কারণে, তাঁর কলাবতসুলভ সঙ্গীতচর্চা আর অগ্রসর হবার সুযোগ লাভ করে নি। যদিও ধ্রুপদগায়করূপে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।...

কলেজ জীবন থেকে তাঁর মানসলোকে যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তাঁর বহিরঙ্গ জীবনে ও আচরণ ইত্যাদিতে তার পরিচয় ততখানি পাওয়া যেত না। বাইরে থেকে দেখলে তিনি ছিলেন ধনীর দুলাল, বন্ধুবান্ধব মহলে মজলিসী ও রহস্যালাপী, সুকণ্ঠ গায়ক এবং জ্ঞানরাজ্যের নানা বিভাগের গ্রন্থাবলীর অক্লান্ত পাঠক। বি. এ. পরীক্ষার সময়ে পিতৃবন্ধু এবং বিখ্যাত এ্যাটর্নী নিমাইচন্দ্র বসুর অফিসে শিক্ষানবীশরূপে যুক্ত আছেন। পিতা বিশ্বনাথের তখন কল্‌কাতায় ও আইন জগতে বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি ও অপর্যাপ্ত উপার্জনের সময়।

নরেন্দ্রনাথের তখন বিবাহের কথাবার্তা হচ্ছে এবং ভাল ভাল সম্বন্ধ আসছে। দশ হাজার টাকা যৌতুক সমেত ধনীকন্যার সঙ্গে, জনৈক ব্যারিস্টারের কন্‌ভেণ্টে শিক্ষাপ্রাপ্তা কন্যার সঙ্গে ইত্যাদি বিবাহের প্রস্তাব তাঁর জন্যে উপস্থিত হচ্ছে। কিন্তু বিবাহে তাঁর তিলমাত্র আগ্রহ নেই, বরং বিতৃষ্ণা। সেকথা তিনি আত্মীয় এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ডাঃ রামচন্দ্র দত্ত মারফৎ গুরুজনদের কাছে জানিয়েও ছিলেন। অবশ্য তাঁর পিতা সেকথায় কর্ণপাত করেন নি। সব পিতাই যেমন এসব কথা অগ্রাহ্য করে থাকেন।

নরেন্দ্রনাথ পড়াশোনা ও সঙ্গীতচর্চার সুবিধার জন্য ৭, রামতনু বসু লেনে মাতামহীর বাড়ীতে থাকতেন, সেকথা আগেকার অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ কখনো কখনো আসতেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। কথিত আছে, সেই দোতলার ঘরখানিতে একদিন তিনি নরেন্দ্রনাথকে ব্রহ্মচর্য পালন ও কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ বিষয়ে যখন বল্‌ছিলেন, নরেন্দ্রের মাতামহী আড়াল থেকে তা শোনেন। মাতামহীর কাছে তাঁর পিতামাতা সেকথা শুনে তাঁর বিবাহের জন্যে আরো বেশি ব্যগ্র হয়ে পড়েন। অথচ নরেন্দ্রের তেজস্বী স্বভাবের জন্যে তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত করতে নিষেধও করেন নি। এক্ষেত্রে পিতামাতাদের যেমন চিন্তা করা উচিত, তাঁরাও তেমনি ভাবলেন। অর্থাৎ নরেন্দ্রের বিবাহ দিয়ে সমস্যা সমাধানের আশা করলেন।

কিন্তু নরেন্দ্রনাথ যেহেতু সাধারণ ছেলে ছিলেন না, সেজন্যে সমাধানও হ'ল না। উপরন্তু একের পর এক নানা কারণে সম্বন্ধগুলি ভেঙে যেতে লাগল। বিবাহের যোগাযোগ কিছুতেই সিদ্ধ হ'ল না।

এমন সময় বিশ্বনাথ অকস্মাৎ পরলোকগত হলেন। "১৮৮৪ সালে, ২৫ ফেব্রুয়ারী, শনিবার রাত্রে···লিখিতে লিখিতে হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে (heart fail) তাঁহার মৃত্যু হয়।" ১

পিতার মৃত্যুর সময় নরেন্দ্রনাথ বাড়ীতেও ছিলেন না। বরানগরে এক বন্ধুর বাড়ীতে বন্ধুবর্গের সঙ্গে গানবাজনায় কালযাপন করছিলেন। তার কিছুদিন আগে বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছিলেন, তখনো ফল জানা যায় নি। এই নিদারুণ সংবাদ তাঁকে লোক মারফত পাঠিয়ে একেবারে শ্মশানে নিয়ে আসা হয় পিতার শেষকৃত্য করবার জন্যে।···

পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সংসার একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। বিশ্বনাথ যেমন অপরিমিত আয় করতেন, তেম্‌নি ছিল তাঁর ব্যয়। সেজন্যে সঞ্চয় কিছুই করতে পারেন নি। নরেন্দ্রনাথের তখন মাত্র একুশ বছর বয়স। দ্বিতীয় অনুজ মহেন্দ্রনাথ পনের বছর বয়সের স্কুলের ছাত্র। কনিষ্ঠ ভূপেন্দ্রনাথ সাড়ে তিন বছরের শিশু। বিধবা জননীর সঙ্গে ভাগনীও সংসারে। সকলের দায়িত্ব এখন সহসা নরেন্দ্রনাথের ওপর এসে পড়ল, যখন তাঁর নিজেরই ছাত্রজীবন শেষ হয়নি। তখনো তিনি আইন-কলেজের ছাত্র এবং এই সংসার প্রতিপালনের চিন্তা পিতার মৃত্যুর একদিন আগেও তিনি কল্পনা করতে পারতেন না। অথচ, কোন আয় নেই, আর্থিক সঙ্গতি নেই, কোন সহায় সম্বল নেই।

তিনি দিশাহারা হয়ে পড়লেন। কারণ দুর্ভাগ্য শুধু একটি নয়। সুদিনে

যারা ছিল আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব—এখন দুর্দিনে তারা হল অপরিচিত, বিস্মৃতপ্রায়। বিপদের ওপর বিপদ। যে একান্নবর্তী পরিবারে বিশ্বনাথ অকাতরে সকলকে সাহায্য করতেন, নিজের স্ত্রীপুত্রের স্বার্থহানি করে জ্ঞাতিবর্গকে প্রতিপালন করতেন, এখন তাঁরাই বিশ্বনাথের অবর্তমানের সুযোগে তাঁর পরিবারবর্গকে বাড়ীর অধিকারটুকু থেকেও উচ্ছেদ করবার চেষ্টা আরম্ভ করলেন। জ্ঞাতিশত্রুতার তুল্য শত্রুতা বাঙালীর সংসারে সম্ভবত বেশি নেই। সংসারের এমনি সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও নিষ্ঠুরতা একত্র যুক্ত হয়ে চারিদিক থেকে যেন নরেন্দ্রনাথকে ঘিরে ধরলে।

এদিকে ভালভাবে তাঁর বি. এ. পরীক্ষা পাশের খবর বেরুল। কিন্তু উদয়াস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি কোন কাজ সংগ্রহ করতে পারলেন না। বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেও হাল ছাড়লেন না তিনি। উপার্জনের জন্যে সর্বপ্রকারে উদ্‌যোগী হলেন। উকিলের বাড়ীতে আংশিক কার্য করা থেকে আরম্ভ করে পুস্তক রচনা পর্যন্ত। গ্রন্থ অনুবাদ করেও এইসময়ে সংসার প্রতিপালনের চেষ্টা করেছিলেন। হার্বার্ট স্পেন্সারের ইংরেজী রচনা থেকে বাংলায় "শিক্ষা" এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দের বাংলা অনুবাদও এই সময়ে তিনি সম্পূর্ণ করেছিলেন। প্রথমটি প্রকাশ করেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং দ্বিতীয়টি মতিলাল বসু (যিনি পরে Bose's Circus প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে খ্যাতনামা হন)। এই সময়ে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মাস্টারমশায়) ও নরেন্দ্রনাথের গীতগোবিন্দের গান গাইবার প্রসঙ্গ আগেকার একটি অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিষ্ঠিত বৌবাজারের মেট্রোপলিটান স্কুলে প্রধান শিক্ষকতাও তিনি কিছুদিন করেছিলেন। কিন্তু এসময় জ্ঞাতিদের অত্যাচারে বাড়ী ত্যাগ করে মাতা ও ভ্রাতাদের নিয়ে তিনি মাতামহীর গৃহে চলে যেতে বাধ্য হন। বাড়ীর অধিকারের জন্যে সেখান থেকে মোকদ্দমা আরম্ভ করতে হয়। আইন কলেজের পাঠও চল্‌ছিল। তার ওপর মামলার তদ্বির ইত্যাদির জন্যে প্রধান শিক্ষকের কাজটি ত্যাগ করে আরো বিপদগ্রস্ত হলেন। এসব হল ১৮৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দের কথা।

একদিকে এম্‌নি ঘোর দুর্বিপাক। অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ। একদিকে সাংসারিক দায়-দায়িত্ব, কর্তব্য ও মমতাহীন জীবন-সংগ্রাম ; অন্যদিকে নিরন্তর মানসিক আলোড়ন, প্রবল বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসের

দিকে গতিপ্রবণতা। এই দ্বিধা ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বে অতিবাহিত হয় ১৮৮৪-এর প্রথম থেকে ১৮৮৬-এর প্রায় শেষ পর্যন্ত। পিতার মৃত্যু থেকে আরম্ভ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর বরানগর মঠ প্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ সন্ন্যাস অবলম্বন ক'রে সেখানে অবস্থান পর্যন্ত।

নরেন্দ্রনাথের জীবনের এই সঙ্কটসঙ্কুল অংশের কথা তাঁর জীবনের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁদের সবিশেষ জানা আছে। এবিষয়ে কিছু সবিস্তারে উল্লেখ করা হল এই জন্যে যে এই সময়ে তাঁর বিশেষ বিশেষ অবস্থার সঙ্গে তাঁর গানের প্রসঙ্গ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই সময়কার বাস্তব জীবনের পশ্চাদ্‌পটে তাঁর গানের বিবরণগুলি পাঠ করলে বোধ হয় অনুধাবনের আরো সুবিধা হবে।

এই কালের তাঁর কয়েকটি সঙ্গীতপ্রসঙ্গ এবার বিবৃত করা হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে তাঁর গানের বিবরণ আগেকার অধ্যায়ে সমস্তই দেওয়া আছে। সেইজন্যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গ ভিন্ন অন্যান্য পরিস্থিতিতে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীতবিষয়ে যেসব বিবরণ পাওয়া যায়, তা' এখানে উল্লিখিত হবে। বর্তমান অধ্যায়ের উপকরণের জন্যে প্রধান অবলম্বন হল—মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্বামীজীর জীবনী-বিষয়ক পুস্তকাবলী এবং স্বামীজীর বিষয়ে লিখিত অন্য কয়েকটি গ্রন্থ।······

নরেন্দ্রনাথের জীবনের এই পর্বের প্রথম বছরে তাঁর সঙ্গীতপ্রসঙ্গ নাট্যকার ও গীতরচয়িতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের গানের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। গিরিশচন্দ্রের একাধিক গানের তিনি কি মরমী গায়ক ছিলেন, তাঁর সে গানগুলির সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের কি গভীর আত্মিক যোগ ছিল তার কিছু পরিচয় এই বিবরণগুলি থেকে পাওয়া যাবে। গিরিশচন্দ্রের কয়েকটি গান নরেন্দ্রনাথের মন অধিকার ক'রে ছিল এই সময়ে।

১৮৮৪ সালের ২ আগষ্ট তারিখে স্টার থিয়েটারে নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র প্রণীত ও পরিচালিত "চৈতন্যলীলা" নাটকের উদ্বোধন হয়। এই নাটকের রচনা, অভিনয় ও গান এত উচ্চাঙ্গের হয় যে তখন তাই নিয়ে একটা সাড়া পড়ে যায়। এই নাটকের সুমধুর সুর সংযোজনা করেন—নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত-শিক্ষক, সঙ্গীতাচার্য বেণীমাধব অধিকারী। শ্রীরামকৃষ্ণও "চৈতন্য-লীলা" দেখে অতি পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন, [১] এবং নামভূমিকার অভিনেত্রী

বিনোদিনীকে ("তোমার চৈতন্য হোক") আশীর্বাদ করেছিলেন একথাও সুবিদিত আছে।

নরেন্দ্রনাথ "চৈতন্যলীলা"র গানগুলি কি মর্মস্পর্শী ভাবে গাইতেন সে সম্পর্কে মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলেছেন,—"১৮৮৪ সালে 'চৈতন্যলীলা' অভিনয় খুব চলিতেছিল। সহরে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে।......অভিনয় সম্বন্ধে একটা বড় পরিবর্তন আসিয়া গিয়াছিল। ইহার পূর্বে এরূপ আন্দোলন হয় নাই।... শনিবার—বৈকালবেলা বাবুরাম মহারাজ ও অপর দুই তিন জন ৩নং গৌরমোহন মুখার্জীর বাটীতে আসিলেন এবং নরেন্দ্রনাথকে অভিনয় দেখিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।......আগন্তুক ব্যক্তিগণ ও নরেন্দ্রনাথ অনতিবিলম্বে অভিনয় দর্শন করিতে গেলেন।

সেই সময় নরেন্দ্রনাথ চৈতন্যলীলার গান গাহিতেন :

রাধা বই আর নাইকো আমার
 রাধা বলে বাজাই বাঁশী।
মানের দায়ে সেজে যোগী
 মেখেছি গায় ভস্মরাশি ॥
কুঞ্জে কুঞ্জে কেঁদে কেঁদে
 রাধা নামে বেড়াই সেধে,
যে মুখে বলে রাধে,
 তারে বড় ভালবাসি ॥

রাত্রে বাড়ীতে নরেন্দ্রনাথ এই গানটি প্রাণের ভিতর থেকে, নিজেদের অবস্থা প্রতিবিম্বিত হইতেছে, সেই উল্লেখ করিয়া অতি মধুর করুণ স্বরে গাহিতেন। গানের প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক শব্দটি শ্রোতার গাত্র বিদ্ধ করিয়া অন্তর পর্যন্ত প্রবেশ করিত। সত্যই ত গায়ে ভস্ম মেখে নগ্নপদে ভিক্ষুক হইয়া ভগবান লাভের জন্য পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন। সেইজন্য এই গানটি সেই সময়ের উপযোগী হওয়ায় লোকের পক্ষে বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ আর একটি চৈতন্যবিষয়ক গান গাহিতেন এবং তাঁহার দুচক্ষে অনবরত অশ্রু বিগলিত হইত :

তুমি দ্বারে দ্বারে নাকি কেঁদেছ,
কত পাষণ্ড হৃদয় কত কথা কয়
 তবু নাকি প্রেম যেচেছ ॥

নরেন্দ্রনাথ এই ভাবটি জীবনে সাধনার অঙ্গ করিয়া লইয়াছিলেন এবং ভবিষ্যৎ জীবনে মান্দ্রাজে বক্তৃতা দিবার সময় ঠিক এই ভাবটি বিশদভাবে পরিবর্ধিত হইয়াছিল। এইজন্যে যখন এই দুই কলি গাহিতেন, নিজের অবস্থা ও জীবনের উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিতেন।...” ৩

“চৈতন্যলীলা”র এক বছর পরে গিরিশচন্দ্রের “বুদ্ধদেব চরিত” স্টারে অভিনীত হয়—১৮৮৫, সেপ্টেম্বরে। এই নাটকও গিরিশচন্দ্রের আর একটি বিজয় বৈজয়ন্তী। “এই নাটকের ‘জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই, কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই” বৈরাগ্যপূর্ণ গীতটি গিরিশচন্দ্রকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। গানখানি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম প্রিয় ছিল। এই গীতখানি গাহিতে গাহিতে বিবেকানন্দ স্বামী আত্মহারা হইয়া যাইতেন।” ৪

গিরিশচন্দ্র রচিত এই অপূর্ব গানখানি নরেন্দ্রনাথের গাইবার বিষয়ে মহেন্দ্রনাথ দত্ত বিশেষভাবে বিবৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, “তৎ প্রণীত বিখ্যাত গীত :

জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই ?
ফিরে ফিরে আসি কত কাঁদি হাসি, কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই ॥
কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন ? জাগিয়া ঘুমাই কুহকে যেন,
এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর ? অধীর অধীর যেমতি সমীর
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই ॥
জানি না কেবা এসেছি কোথায়, কেন বা এসেছি কোথা নিয়ে যায়,
যাই ভেসে ভেসে কত কত দেশে, চারিদিকে গোল উঠে নানা রোল,
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়, এই আছে আর তখনি নাই ॥
কি কাজে এসেছি—কি কাজে গেল ? কে জানে কেমন কি খেলা হ'ল।
প্রবাহের বারি, রহিতে কি পারি, যাই যাই কোথা—কূল কি নাই ?
কর হে চেতন, কে আছে চেতন, কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন ?
কে আছ চেতন, ঘুমায়ো না আর, দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার,
কর তমোনাশ, হও হে প্রকাশ, তোমা বিনা আর নাহিক উপায়,
তব পদে তাই স্মরণ চাই ॥

এই গানটি নরেন্দ্রনাথ হৃদয়ের অন্তর হইতে গাহিতেন। সঙ্গীতকালে যেন এক বৈরাগ্যের হিল্লোল চারিদিকে প্রবাহিত হইত। শ্রোতৃবর্গের মন যেন রাগস্পন্দনের সহিত কোথায় উড়িয়া যাইত। নরেন্দ্রনাথ যখন এই গানটি

গাহিতেন, তখন যেন প্রত্যক্ষ স্পষ্ট কি একটা ভাব উঠিত ; লোক যে মাতোয়ারা হইয়া উঠিত।" ৫

মহেন্দ্রনাথ দত্ত অন্যত্র এই প্রসঙ্গের বিস্তৃততর বিবরণ দিয়েছেন। ত অতি চিত্তাকর্ষক :—

"নরেন্দ্রনাথ যখন এই গানটি গভীর রাত্রিতে শয্যা ত্যাগ করিয়া শিমলা গৌরমোহন মুখার্জীর স্ট্রীটস্থ বাড়ীর দালানে আপনার মনে পাইচারি করিতে করিতে গাহিতেন তখন তাঁহার মুখ হইতে গানটি এমন শ্রুতিমধুর হইত বাড়ীর আশে পাশের ঘরের নিদ্রিত ব্যক্তিরা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া স্থির হই শুনিতেন। সুর, তাল, রাগের কথা নহে কিন্তু ভিতরের প্রাণ থেকে ঠি নিজের অবস্থাটা প্রকাশ করিয়া তিনি জীবন্তভাবে গানটি গাহিতেন যাঁহারা নরেন্দ্রনাথের মুখে রাত্রিতে সেই গান শুনিতেন তাঁহাদের তখন আ বাহ্যজ্ঞান কিছু থাকিত না—সংসারের মায়া মমতা ভুলিয়া গিয়া কোথা এক অসীম জগতে প্রবেশ করিতেন। এই গানটি বরাহনগর মঠে সর্বদা গীত হইত।

নরেন্দ্রনাথ যখন বুদ্ধদেব চরিতের গান গাহিতেন সেই কয় মাস তাঁহা বাহ্যিক জ্ঞান অনেক সময় থাকিত না। নিজে যেন শরীরটা পরিত্যাগ করিয় অন্য কোন এক জগতে বসিয়া আছেন।"... ৬

'বুদ্ধদেব' নাটকের কোন কোন ভাবের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের তৎকালী মানসিকতার সাদৃশ্যের কথাও মহেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন—নরেন্দ্রনাথের সাধ অবস্থার ও পরিব্রাজক অবস্থার বিষয় অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, তি অজ্ঞাতসারে গৌতমের সকল ভাব ও সকল ক্রিয়া অবলম্বন করিয়াছিলেন এই সময়ে নরেন্দ্রনাথের ভাব ছিল : সৃষ্টি ত দেখিয়াছি ; ইহার বনেদ কি করিয়া আসিল ? একটা কিছু ধরিয়া লইয়া মানিয়া লওয়া আবশ্যক করেনা অনেকবার দেহ ধারণ করিয়াছি, দেহ নষ্ট করিয়াছি। এইবারেও না হ তপস্যা করিয়া দেখিব, দেহটাকে নষ্ট করিব। মাঝামাঝি পর্যন্ত দেখিবনা ডুবি ত ডুবিয়া তলার বালি পর্যন্ত দেখিব। কিছু মানিয়া লইয়া কাজ কর ঠিক নয়। নরেন্দ্রনাথ তখন এইরূপ গানও গাহিতেন :

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।

গিরিশবাবু বুদ্ধদেব চরিত-এ অনেকক্ষেত্রে যে সব কথা দিয়েছেন এব দেববালাগণ কর্তৃক গীত বিখ্যাত গীত (পূর্বোদ্ধৃত—"জুড়াইতে চাই কোথা

জুড়াই"…) রচনা করিয়াছেন তাহা নরেন্দ্রনাথের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া ও নরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার কথাবার্তার ভাব লইয়া নিজ নাটকের উপযোগী করিয়া রচনা করিয়াছেন।" ৭

প্রসঙ্গত বলা যায় যে Sir Edwin Arnold প্রণীত Light of Asia পাঠ করে, গিরিশচন্দ্র যে প্রেরণা পান তারই ফলে "বুদ্ধদেব চরিত" রচনা করেন। কথিত আছে Light of Asia অবলম্বন করে তাঁকে নাটক প্রণয়ন করতে অনুরোধ করেছিলেন নৃত্যগোপাল মহারাজ।

"বুদ্ধদেব চরিত" নাটকের অভিনয়, নরেন্দ্রনাথের তার গান গাওয়া এবং তার পরবর্তী কালে নরেন্দ্রনাথের জীবনের কথা এখানে একবার সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল। শ্রীরামকৃষ্ণের অসুস্থ দেহের চিকিৎসার জন্যে তাঁকে আনা হয়েছে শ্যামপুকুরের বাড়ীতে। শ্যামপুকুরে তাঁর থাকবার সময়ে নরেন্দ্রনাথ নিয়মিত সেখানে যাতায়াত ও সেবাশুশ্রূষা করতেন। আবার ওদিকে মোকদ্দমার ব্যবস্থাদি, কিছু কিছু উপার্জন, সংসার দেখা-শোনার কাজও চল্‌ত। তবে অন্তরে প্রবল বৈরাগ্যের আলোড়ন এবং সংসারে অনাসক্তি। অর্থাৎ এতদিন পর্যন্ত বাড়ীর কর্তব্য কোনক্রমে পালন করেছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর বাগানবাড়ীতে আগমনের পর থেকে নরেন্দ্রনাথ সেখানেই রাত্রি-যাপন করতে আরম্ভ করেন এবং বাড়ীতে কোন বিশেষ প্রয়োজনে ডাক না পড়লে আসতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের কাশীপুরে অবস্থানের সময় থেকেই তিনি প্রকৃতপক্ষে গৃহত্যাগ করেন।

কাশীপুরের এই বাগান বাড়ীতে দেহত্যাগের কয়েক দিন আগে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথ ও অপর দশজন শিষ্যকে গৈরিক বসন দিয়ে সন্ন্যাসের পথে অগ্রসর করে দেন। সেই দশজন হলেন—কালী তপস্বী (অভেদানন্দ) রাখালচন্দ্র ঘোষ (ব্রহ্মানন্দ), যোগীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী (যোগানন্দ), শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী (সারদানন্দ), তারকনাথ ঘোষাল (শিবানন্দ), বাবুরাম ঘোষ (প্রেমানন্দ), শশীচন্দ্র চক্রবর্তী (রামকৃষ্ণানন্দ), লাটু (অদ্ভুতানন্দ), নিরঞ্জন (নিরঞ্জনানন্দ), এবং বুড়ো গোপাল (অদ্বৈতানন্দ)। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের প্রায় এক বছর পরে, বরানগর মঠের প্রথম অবস্থায়, নরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর ষোলজন গুরুভ্রাতা একসঙ্গে বাবুরামের পূর্বাশ্রম আঁটপুরে বিরজা হোম করে যথা শাস্ত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বরানগর মঠে নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ মঠবাসিদের সন্ন্যাস নেবার কথাও মহেন্দ্রনাথের বিবরণী থেকে পাওয়া যায়: "বরাহনগর মঠ

স্থাপনের কয়েক দিবসের মধ্যেই সকলে রাস্তার দিকের বিল্ববৃক্ষমূলে বিধিপূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।" ৮

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের প্রায় সমসাময়িক কালে নরেন্দ্রনাথের আরো কয়েকদিনের সঙ্গীত প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। তার মধ্যে প্রথমটি সম্ভবত শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পূর্বের ঘটনা; কারণ গিরিশচন্দ্রের আর একখানি বিখ্যাত নাটক "বিল্বমঙ্গল"-এর অভিনয় তখন আরম্ভ হয়েছে। স্টার থিয়েটারে "বিল্বমঙ্গল"-এর উদ্বোধন হয় ১৮৮৬, জুলাই মাসের প্রথম দিকে, (সন ১২৯৩, ২০ আষাঢ়)।

সে সময়ে নরেন্দ্রনাথের এক দিনের গানের মনোজ্ঞ বিবরণ মহেন্দ্রনাথ দত্ত দিয়েছেন,—

"এই সময় গিরিশবাবুর "বিল্বমঙ্গল" অভিনয় হয়। সম্ভবত গিরিশবাবু নরেন্দ্রনাথকে "বিল্বমঙ্গল" অভিনয় দেখাইবার জন্য লইয়া যান। অভিনয় সমাপ্ত হইলে পর দর্শকবৃন্দ সকলে চলিয়া গেলে, গিরিশবাবু নরেন্দ্রনাথকে লইয়া রঙ্গমঞ্চে ঢুকিলেন। নর্তক ও নর্তকীগণ মৌখিক সম্মান প্রদর্শন করিয়া দূরে দণ্ডায়মান রহিল, এবং আপনা আপনি কথা কহিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ রঙ্গমঞ্চেতে বসিয়া একটি তানপুরা লইয়া স্থিরভাবে ভজন গাহিতে আরম্ভ করিলেন। স্বভাবসিদ্ধ একাগ্রতায় গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হওয়ায় তাঁহার শক্তি জাগিয়া উঠিল। চক্ষু নিমীলিত; কণ্ঠ হইতে ভক্তিপূর্ণ স্বর উঠিতেছে এবং দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে। ঠিক যেন নরেন্দ্রনাথ নিজের প্রত্যক্ষ ইষ্টকে দর্শন করিয়া সুস্বরে আহ্বান করিতেছেন। স্থানটি নর্তকাগার হইতে দেবমন্দিরে পরিণত হইল, ভক্তি ও ঈশ্বরানুরাগ চতুর্দিকে যেন প্রবাহিত হইতে লাগিল।······চপলস্বভাব নর্তকীবৃন্দ তখন চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং কাহার সম্মুখে পূর্বে তাহারা চাপল্য ভাব প্রকাশ করিয়াছিল, এই চিন্তায় তাহারা কম্পিত ও ত্রস্ত হইয়া উঠিল, এবং ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া করজোড়ে অতি বিনীতভাবে দূরে দণ্ডায়মান রহিল। গিরিশবাবু তখন নরেন্দ্রনাথের ধ্যান ও গভীর চিন্তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া একটু চিন্তিত ও উন্মনা হইলেন, এবং ঐরূপ ভাব আর যাহাতে বর্ধিত না হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে তিনি নরেন্দ্রনাথের হাত হইতে তানপুরা উঠাইয়া লইলেন এবং নরেন্দ্রনাথের

হস্তধারণ করিয়া মঞ্চ হইতে বাহির হইয়া নিজের গাড়ীতে বসাইলেন এবং বাগবাজারে আনিলেন।" ৯

শ্রীরামকৃষ্ণের শেষজীবনে নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ যে শিষ্যমণ্ডলী কাশীপুর বাগান বাড়ীতে গঠিত হয়েছিল এবং যাঁদের নিয়ে একটি ভ্রাতৃসঙ্ঘ সংগঠিত করে নরেন্দ্রনাথ তপশ্চর্যা আরম্ভ করেন—তাই-ই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বীজ। তাকে সংরক্ষণ এবং লালন করার বিষয়েও প্রধান পুরুষ ছিলেন নরেন্দ্রনাথ এবং উত্তরকালের স্বামী বিবেকানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে মঠপ্রতিষ্ঠার কথা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও আমাদের বিষয়ের সঙ্গে এই সব ঘটনার সম্পর্ক আছে। কারণ মঠের পর্বেও তাঁর সঙ্গীতচর্চা বন্ধ হয়নি। বরং এক হিসেবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, বলা যায়। কেননা এই পর্বে তিনি শুধু গান করতেন না, একাধিক গানও রচনা করেন।

কাশীপুরের বাগান বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে তাঁর যে শিষ্যবৃন্দ অবস্থান ও সাধন ভজন করতেন, তিনি দেহরক্ষা করবার পর সেই সঙ্গ ভেঙে যায়। বাড়ীটি, যে সময়ের জন্যে অগ্রিম ভাড়া দেওয়া ছিল তা উত্তীর্ণ হলে, ছেড়ে দেওয়া হয়। সে সময়ে বাড়ী ভাড়া ইত্যাদি বাবদ শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডলীকে সব চেয়ে বেশি সাহায্য করতেন সুরেন্দ্রনাথ বা সুরেশ মিত্র এবং বলরাম বসু, ডাঃ রামচন্দ্র দত্ত, গিরিশ ঘোষ প্রমুখ গৃহী সেবকেরা।

কাশীপুরের বাগানবাড়ী ছেড়ে দেবার পর নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রায় সকলেই যে যার ঘরে ফিরে গেলেন। বেশির ভাগই তাঁরা ছিলেন কলেজের ছাত্র এবং ফিরে এসে পড়াশোনায় মন দেবার চেষ্টা করলেন। নরেন্দ্রনাথও রামতনু বসু লেনের বাড়ীতে এসে আইন পাঠে মনোনিবেশের বৃথা চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু তারকনাথ, লাটু এবং বুড়ো গোপালের জন্যে একটি আস্তানা না করলেই নয়। সেজন্যে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় মাসিক দশ টাকা ভাড়ায় একটি প্রাচীন ও জীর্ণ বাড়ী ভাড়া নেওয়া হল বরানগরে প্রামাণিক ঘাট রোডে। ১০ বাড়ীটাকে তখন স্থানীয় লোকেরা ভূতুড়ে বাড়ী বলত, অনেকদিন ধরে পরিত্যক্ত হয়ে থাকার জন্যে। বাড়ীখানি মুন্‌শীদের বাড়ী নামেও পরিচিত ছিল। টাকীর রায়চৌধুরী বংশীয়দের এটি বরানগরে একটি আদি আবাসস্থল এবং শোনা যায়, এই

বংশীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এবং রামমোহন রায়ের বিশিষ্ট সুহৃদ কালীনাথ মুন্‌শী মহাশয় এই বাড়ীতে বাস করেছিলেন। বর্তমানে বাড়ীটির অন্য অস্তিত্ব নেই, শুধু সে আমলের একটি স্তম্ভ মাত্র প্রামাণিক ঘাট রোডের উপর অতীতের সামান্য স্মৃতিচিহ্নরূপে এখনো দণ্ডায়মান আছে।······

মুন্‌শীদের এই বাড়ীতেই সে সময়ে ক্রমে নরেন্দ্রনাথ, কালী তপস্বী, রাখাল, শরৎ, শশী প্রভৃতি সকলে এসে তারকনাথ প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হন। এইভাবে বরাহনগরের মঠ—যা উত্তরকালে সুবিখ্যাত হয়েছিল এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ গঠনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছিল—স্থাপিত ও গঠিত হয়।

বরাহনগর মঠ গঠনের ঠিক আগেকার একটি উল্লেখযোগ্য কথা আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ সৎকার করবার পর তাঁর দেহাবশেষ সংরক্ষিত হয়েছিল। প্রথমে কাশীপুরের বাগান বাড়ীতে ও তারপর বলরাম বসুর বাড়ীতে তা' সাময়িকভাবে রাখা হয়। কারণ তখন কোন মঠ স্থাপনের কথা হয়নি এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যদের একত্র বাসের কোন স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল না। এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান গৃহীভক্ত ডাঃ রামচন্দ্র দত্ত দাবি করেন যে গুরুর অস্থি ভস্ম তাঁকে দেওয়া হোক। কাঁকুড়গাছিতে তিনি যে বাগান বাড়ী করেছিলেন—বর্তমানে যা "কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান" নামে পরিচিত—সেখানে তা সমাহিত করে শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিরূপে রক্ষা করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের রামচন্দ্র প্রমুখ কোন কোন গৃহী শিষ্যের সঙ্গে সন্ন্যাসী শিষ্যদের এই উপলক্ষে মনোমালিন্য দেখা দিলেও পরে দু পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। অস্থির একাংশ পরে সংরক্ষিত হল বরাহনগর মঠে, ঠাকুর ঘরে। অপর অংশ কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে সেই সময় থেকে আছে এবং সেই অস্থির সমাধিস্থানে নির্মিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতি মন্দির। বরাহনগর মঠে সংরক্ষিত ও পূজিত অস্থি সেখান থেকে স্থানান্তরিত হয় আলমবাজার মঠে। বর্তমানে তা বেলুড় মঠে সংরক্ষিত আছে।

রামচন্দ্র দত্ত সেই সময় আরো একটি কথা তুললেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখবার ও তাঁর কথা শোনবার যাঁদের সৌভাগ্য হয়েছে তাঁদের অন্য কিছু করার প্রয়োজন নাই, সংসারে থেকে তাঁকে স্মরণ ও পূজা করলেই হল।

নরেন্দ্রনাথ তখন সমস্ত সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাদের মুখপাত্ররূপে প্রতিবাদ জানালেন এই কথার। তিনি বললেন যে, একথা গ্রহণীয় নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও আদর্শ যাঁরা সঠিকভাবে অন্তরে ধারণ করেছেন তাঁরা সংসারী

গৃহস্থরূপে জীবন যাপনে তৃপ্ত থাকতে পারেন না। তাঁদের মঠ স্থাপন করে সন্ন্যাস নিয়ে জীবন উৎসর্গ করতে হবে। অমন মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভ করবার পরেও নিষ্ক্রিয় গৃহস্থের মতন জীবন কাটিয়ে দেওয়া চল্‌বে না।

এই পরিস্থিতির মধ্যে বরাহনগরের মঠে নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ সন্ন্যাসী শিষ্যেরা সম্মিলিত হয়ে সন্ন্যাস জীবন আরম্ভ করলেন। রামচন্দ্র দত্ত তাঁর যোগোত্থান নিয়ে রইলেন। তবে বরাহনগর মঠের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হলেও বিবাদ বিসম্বাদ দূরীভূত হ'ল। মঠের গৃহী পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে প্রধান রইলেন সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, বলরাম বসু, গিরিশচন্দ্র এবং তাঁর ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণ ঘোষ প্রভৃতি। গিরিশচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন গৃহীভক্তের অবশ্য যোগোত্থানে যাতায়াত ও রামচন্দ্র দত্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। গিরিশচন্দ্রের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল দুপক্ষেই।

বরাহনগর মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যেরা সাধন ভজন ও কঠোর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করলেন। তা' ছাড়া নরেন্দ্রনাথ ও কালী তপস্বীর প্রভাবে ও দৃষ্টান্তে সেখানে বিদ্যাচর্চার উদার আবহ সৃষ্টি হ'ল। পাঠ ও আলোচনা চল্‌তে লাগল বেদান্ত ও হিন্দুশাস্ত্রাদির, বাইবেলের এবং প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি নানা বৌদ্ধ গ্রন্থাদির।

এই মঠের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল—সঙ্গীত। সঙ্গীতচর্চা এখানে নিষিদ্ধ ছিল না, বরং নিয়মিত অনুষ্ঠিত হত। সঙ্গীত ছিল যেন এখানকার সাধন ভজনের অন্যতম অঙ্গ এবং তার মূলে ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। এখানকার সঙ্গীতপ্রসঙ্গ আরম্ভ করবার আগে মঠের বাস্তব পরিবেশের একটু পরিচয় দেওয়া হবে। এই বিবরণী প্রত্যক্ষ-দর্শীর। তাঁর প্রদত্ত নিম্নলিখিত বর্ণনা থেকে ধারণা করা যায় যে স্বচ্ছল ভদ্র ঘরের এই তরুণের দল, তাঁদের অনেকে আবার সুশিক্ষিত ও ছাত্র, আদর্শের জন্যে কতখানি ত্যাগ ও কৃচ্ছ্র-সাধন করেছিলেন।

"মঠের বাড়ীটা অতি প্রাচীন, ভগ্ন, নীচেকার ঘরগুলি মাটিতে ডুবিয়া বসিয়া গিয়াছে; শৃগাল ও সর্পের আবাসস্থল। উপরে উঠিবার সিঁড়ির ধাপগুলি খানিকটা আছে, অনেকটা পড়িয়া গিয়াছে। দরজা, জানালার তক্তাগুলি খানিকটা আছে, খানিকটা নাই; ছাতের বরগা পড়িয়া গিয়াছে, বাঁশ চিরিয়া ইটগুলি রাখা হইয়াছে। চতুর্দিকে জঙ্গল। ভূতের বাড়ী ত সত্যই ভূতের বাড়ী। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া উত্তর দিকে, অর্থাৎ দক্ষিণ হাতে

যাইতে প্রথম একটি নাতিবৃহৎ গৃহ—যেটিকে কালী বেদান্তীর বা "কালী তপস্বীর ঘর" বলা হইত। তাহার পর দুই ধাপ উঠিয়া একটি ছোট দরজা এবং ভিতরে যাইবার পথ। আর একটু ঢুকিলে বাঁ দিকে ঠাকুরের ঘর এবং সম্মুখে একটি লম্বা দালান ও দালানের পশ্চিমে একটি বড় ঘর। বড় ঘরের ভিতর দিয়া যাইলে উত্তর পশ্চিম দিকে ছোট একটি ঘর, সেখানে জল থাকিত ও সকলে বসিয়া খাইত।···আর ভোজনগৃহের পূর্বদিকে একটি গৃহে রান্না হইত।···মাথার বালিশ—বালান্দার চাটাইয়ের নীচে নরম নরম ইট দেওয়া। শীত করিলে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া শয়ন, বা তাহাতে শীত না ভাঙ্গিলে রাত্রিতে উঠিয়া একবার কুস্তি লড়িয়া লওয়া ; শরীর গরম হইলে শীত পলাইয়া যাইত।" ১১

ওই "ভোজনগৃহে" ভোজনও ছিল বাড়ীর উপযুক্ত। কিন্তু তার বিবৃতি পাঠ না করলে আহারের অবস্থা বোধহয় কল্পনা করা কঠিন! "আহারের কোন বন্দোবস্ত না থাকায় এবং কাহারও প্রদত্ত কিছু গ্রহণ করিবেন না ইহা স্থির করিয়া সকলেই মুষ্টিভিক্ষা করিতে লাগিলেন। ভিক্ষায় যে চাউল আসিত তাহা সিদ্ধ করা হইত। তৎপরে এক বস্ত্রখণ্ডের উপর তৎসমুদয় ঢালিয়া তাহার চতুর্দিকে সকলে মিলিয়া বসিতেন এবং লবণ ও লঙ্কার ঝোল করিয়া তাহাই দিয়া ভোজন সমাপ্ত করিতেন ; কখনও বা তেলাকুচা পত্রের ঝোল হইত। জল পানের জন্য একটিমাত্র বাটি ছিল। একটি বাটিতে নুন লঙ্কার ঝোল থাকিত ; সকলেই একগ্রাস করিয়া একবার ভাত মুখে লইতেন ও একবার ঐ ঝোল হাতে করিয়া মুখে দিতেন ;······" ১২

এমন যে বরাহনগরের মঠের জীবন, সেখানেও কিন্তু সঙ্গীতের আবহাওয়া ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদেব মধ্যে কয়েকজনই ছিলেন সঙ্গীতপ্রিয় এবং কিছু কিছু সঙ্গীতচর্চা ইতোপূর্বেও করেছিলেন। অবশ্য সকলের কেন্দ্রমণি ছিলেন নরেন্দ্রনাথ! এই কঠোর সন্ন্যাসজীবনে তিনি পূর্বাশ্রমের সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন। পরিত্যাগ করতে পারেননি শুধু সঙ্গীত। তাঁরই প্রভাবে বরানগর মঠের জীবনে সঙ্গীত অন্যতম অঙ্গস্বরূপ ছিল। এমন কি, এখানে তিনি অন্তত একজনকে সঙ্গীতশিক্ষাও দিয়েছিলেন। তার বিবরণ কিছু পরে দেওয়া হবে।

প্রথমে, মঠের সাঙ্গীতিক পরিবেশ সম্পর্কে যা' জানা যায় সে সব কথা উল্লেখ করা হ'ল : এখানে যাঁরা সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, তাঁদের মধ্যে

নরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু বলা বাহুল্য। তাঁর পরে উল্লেখ করতে হয় কালী বেদান্তী বা কালী তপস্বীর (পরবর্তীকালে স্বামী অভেদানন্দ নামে ভারতবর্ষ ও আমেরিকায় বিখ্যাত, আমেরিকায় সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর বেদান্ত প্রচারক, নানা দার্শনিক গ্রন্থ-প্রণেতা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের প্রতিষ্ঠাতা) নাম। তাঁরও নরেন্দ্রনাথের মতন চারু-কলার নানা বিভাগে অনুরাগ ও নিপুণতা প্রকাশ পেত। ছাত্রজীবনে যেমন চিত্রাঙ্কণে ও সংস্কৃতে কবিতা রচনায় পটুতা দেখান, পরে তেমনি সঙ্গীতে। মঠে কালী বেদান্তী কখনো কখনো গান গাইতেন, তা ছাড়া পাখোয়াজও বাজাতে পারতেন। প্রসিদ্ধ পাখোয়াজ-গুণী গোপালচন্দ্র মল্লিকের কাছে তিনি কিছুকাল পাখোয়াজ-শিক্ষা করেছিলেন।—রাখাল মহারাজেরও (উত্তরকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ-রূপে রামকৃষ্ণ-মিশন ও মঠের বিস্তারে ও পরিচালনায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রধান কর্ণধার এবং এ বিষয়ে অসামান্য সংগঠনীশক্তির অধিকারী) সঙ্গীত-প্রসঙ্গে নাম পাওয়া যায়। "বরাহনর মঠে যুব রাখাল অবসরমত সামান্য ভাবে অর্থাৎ কার্য চালানো মত একটু বাঁয়া তবলা বাজাইতে শিখিয়াছিল।" ১৩ পরবর্তীকালে স্বামী শিবানন্দ নামে সুপরিচিত এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের পরবর্তী রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি তারক মহারাজও গান গাইতেন এবং মঠে তাঁর একদিন বিদ্যাপতির বিখ্যাত পদ "হরি গেও মধুপুর" গান করবার হৃদয়গ্রাহী বিবরণ দিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত। স্বামী শিবানন্দের "জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই", "মন চল নিজ নিকেতনে" প্রভৃতি গান গাইবার কথাও দত্ত মহাশয় উল্লেখ করেছেন। ১৪

শরৎ মহারাজ (পরবর্তীকালে স্বামী-সারদানন্দ নামে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে সুপরিচিত) এই মঠে অবস্থানের সময় নরেন্দ্রনাথের কাছে সঙ্গীত-শিক্ষা করেছিলেন। ইতোপূর্বে তিনি গান শিখেছিলেন এবং গাইতেনও। কিন্তু এখানে তাঁর নরেন্দ্রনাথের কাছে সঙ্গীত শিক্ষার কথা জানা যায়। প্রসঙ্গত বলা যায়—এবং 'নিবেদন-এ' একথা বলাও হয়েছে—নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত-প্রতিভা সর্বমুখী ছিল। গায়ক-বাদকরূপে তাঁর পরিচয় আগেই পাওয়া গেছে। পরেও জানা যাবে তাঁর গীত রচনা ও সঙ্গীত-তত্ত্বের আলোচনার কথা। আর এখানে পাওয়া গেল তাঁকে সঙ্গীত-শিক্ষাদাতারূপে। তাঁর কাছে যে শরৎ মহারাজ বরানগর মঠে সঙ্গীত-শিক্ষা করেছিলেন, সে বিষয়ে মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের বিবৃতি থেকে দু'টি উদ্ধৃতি দেওয়া হল।

"দুটি একটি করিয়া বরাহনগর মঠে অনেকগুলি ভক্ত আসিয়া জুটিল এবং বেশ একটি সঙ্ঘ হইল। নরেন্দ্রনাথ কখনও সকলকে পাঠ করিয়া শুনাইতেন, কখনও হাসি-কৌতুক করিতেন এবং কখনও বা উৎসাহপূর্ণ বাণী শোনাইয়া সকলকে উৎসাহিত করিতেন। এইরূপে সকলে বিমোহিত হইয়া একত্র বাস করিতেন। শরৎ মহারাজ এই সময়ে নরেন্দ্রনাথের কাছে গান শিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু দাঁতে দাঁত চাপিয়া গান করা অভ্যাস করায় সর্বদাই ধমকানি খাইতেন।" ১৫ এই বিবরণ থেকে জানা যায় যে, শরৎ মহারাজ নরেন্দ্রনাথের কাছে গান শিক্ষা করবার আগে দাঁত চেপে গান করতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন এবং এই ত্রুটিপূর্ণ কণ্ঠসাধনার জন্যে নরেন্দ্রনাথ তাঁকে তিরস্কার করতেন। বোঝা যায় যে, গায়কের কণ্ঠের এই সব ত্রুটি বিচ্যুতির বিষয়ে নরেন্দ্রনাথ অবহিত ছিলেন। শরৎ মহারাজ যে- তার আগেও সঙ্গীতশিক্ষা করেছিলেন, সেকথাও মহেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন; "শরৎ মহারাজ বাগবাজারের রাখাল হালদার, অর্থাৎ হালদার মহাশয়ের ভাইয়ের কাছে মাস ছয়েক সঙ্গীত শিখিয়াছিলেন।...এই উভয় স্থানেই তিনি কিছু কিছু সঙ্গীত শিখিয়াছিলেন। ১৬

মঠে সদলে কীর্তন গান মাঝে মাঝে হত। সে বিষয়ে দৃষ্টান্ত পরে দেওয়া হবে। মঠের সন্ন্যাসীরা প্রায় নিয়মিত নানা ধরণের গান গাইতেন। ভজন, কীর্তন, ব্রহ্মসঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত ইত্যাদি। সঙ্গীত বিষয়ে সকলের এত আগ্রহ ছিল যে, গানের রীতিমত খাতা ছিল। সন্ন্যাসীদের প্রিয় গানগুলি খাতায় সঙ্কলিত করে রাখা হত গাইবার প্রয়োজনে। এ বিষয়ে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীমঃ) তাঁর ৯ মে ১৮৮৭ তারিখের রোজনামচায় উল্লেখ করেছেন, "বুড়ো গোপাল গানের খাতাতে গান নকল করিতেছেন।..." ১৭

নরেন্দ্রনাথ অনেক সময়ে একক গান গাইতেন। এখানে তাঁর ধ্রুপদাঙ্গের গান করার কথাও জানা যায়।

বরানগর মঠে তাঁর একদিনের গানের প্রসঙ্গ এখানে বিবৃত করা হ'ল। এই দিনের বিবরণে পাওয়া যায় যে তিনি ছখানি গান গেয়েছিলেন। তার মধ্যে দুখানি ব্রহ্মসঙ্গীত, তিনটি ভজন (একটি কবীর রচিত—পাহাড়ী, আদ্ধা) ও একটি শ্যামাসঙ্গীত। ধ্রুপদাঙ্গের ব্রহ্মসঙ্গীত দুটি যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত: "আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন (খট, ঝাঁপতাল) ও "জয় দেব জয় দেব জয় দেব মঙ্গলদাতা" (মিশ্র, একতালা)।

রবীন্দ্রনাথের গান তিনি এই মঠের জীবনেও গেয়েছেন, দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের গান এই নিয়ে ছ'দিন তাঁর গাইবার কথা জানা গেল।

নরেন্দ্রনাথ সেদিন গান করেন মঠের পূর্ববর্ণিত "কালী তপস্বীর ঘরে" এবং শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের প্রায় ন' মাস পরে (৮ মে. ১৮৮৭ খৃঃ) :—

"নরেন্দ্র পরমহংসদেবের সেই গানটি গাইতেছেন—

প্রভু ম্যায় গুলাম ম্যায় গুলাম ম্যায় গুলাম তেরা
তু দিওয়ান তু দিওয়ান তু দিওয়ান মেরা।

... ...

নরেন্দ্রনাথ গাইতেছেন—

'তুমি পিতা আমরা অতি শিশু।'
পৃথ্বীর ধূলিতে দেব মোদের জনম,
পৃথ্বীর ধূলিতে অন্ধ মোদের নয়ন।
জন্মিয়াছি শিশু হয়ে খেলা করি ধুলি লয়ে,
মোদের অভয় দাও দুর্বল শরণ।
একবার ভ্রম হলে আর কি লবেনা কোলে,
অমনি কি দূরে তুমি করিবে গমন?
তাহলে আর যে কভু, উঠিতে নারিব প্রভু,
ভূমিতলে চিরদিন রব অচেতন॥

... ...
... ...

নরেন্দ্র যেন আবিষ্ট হইয়া আবার গাহিতেছেন—

(১) নামেরই ভরসা কেবল শ্যামা গো তোমার।
কাজ কি আমার কোশাকুশি দেঁতোর হাসি লোকাচার॥
নামেতে কাল পাশ কাটে, জটে তা' দিয়েছে রটে।
আমি ত সেই জটের মুটে, মিছে কেন মরি ভেবে,
নিতান্ত করেছি শিবে, শিবেরি বচন সার॥

(২) আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন।
পদে পদে হয় পিতা চরণ স্খলন॥
রুদ্র মুখ কেন তবে, দেখাও মোদের সবে,
কেন হেরি মাঝে মাঝে ভ্রূকুটি ভীষণ॥

ক্ষুদ্র আমাদের পরে করিওনা রোষ।
স্নেহবাক্যে বল পিতা কি করেছি দোষ।
শতবার লও তুলে, শতবার পড়ি ভুলে।
কি আর করিতে পারে দুর্বল যে জন॥
... ...

নরেন্দ্র—তিনি (ঠাকুর) তো বল্‌তেন, 'বিশ্বাসই সার'। তিনি ত কাছেই রয়েছেন। বিশ্বাস করলেই হয়।

এই বলিয়া নরেন্দ্রনাথ আবার মধুরকণ্ঠে গাহিতেছেন—

মোকো কঁহো ঢুঁড়ো বন্দে ম্যয় তো তেরে পাস মো।
হোঁয়ে মো ঝগ্‌ড়ি ঝগ্‌ড়ি ন ম্যয় ঢুঁড়ি পড়াস মো॥
ন হোঁয়ে মো খাল রোম মো ন হাড্ডি ন মাস মো।
ন দেবাল ন মস্‌জিদ মো ন কাশী কৈলাস মো॥
ন হোঁয়ে ম্যয় আউধ্‌ দ্বারকা ; মেরা ভেট বিশ্বাস মো।
ন হোঁয়ে হম প্রিয়া করম মো, ন যোগ বৈরাগ্‌ সন্যাস মো॥
খোঁজে গা তো আও মেলুঙ্গা, পল ভরকে তলাস মো॥
সহর সে বাহার ডেরা হামারি কুঠিয়া মেরি মোহাস মো।
কহত কবীর শুন ভাই সাধু, সব সন্তান কি সাথ্‌ মো॥

প্রসন্ন—তুমি কখনও বল ভগবান নাই ; আবার এখন এইসব বল্‌ছো। তোমার কথার ঠিক নাই। তুমি প্রায় মত বদলাও। (সকলের হাস্য)।

নরেন্দ্র—একথা আর কখনও বলবো না—যতক্ষণ কামনাবাসনা ততক্ষণ ঈশ্বরে অবিশ্বাস হয়। একটা না একটা কামনা থাকেই।...

নরেন্দ্র ভক্তিগদগদ হইয়া গাইতে লাগিলেন। 'তিনি শরণাগতবৎসল, পরম পিতা মাতা।'

জয় দেব জয় দেব জয় মঙ্গলদাতা, জয় জয় মঙ্গলদাতা
সঙ্কট ভয় দুখ ত্রাতা, বিশ্বভুবন পাতা, জয় দেব জয় দেব॥
অচিন্ত্য অনন্ত অপার, নাই তব উপমা প্রভু নাই তব উপমা।
প্রভু বিশ্বেশ্বর ব্যাপক বিভু চিন্ময় পরমাত্মা, জয় দেব জয় দেব॥
কি আর যাচিব আমরা ; করি হে এ মিনতি, প্রভু করি হে মিনতি।
এ লোকে সুমতি দেও, পরলোকে সুগতি, জয় দেব জয় দেব॥

নরেন্দ্রনাথ আবার গান গাইলেন। ভাইদের হরিরস পিয়ালা পান করিতে বলিতেছেন। ঈশ্বর খুব কাছেই আছে—'কস্তুরী যেমন মৃগের'—

পিলেরে অবধু হো মাতুয়ারা। পেয়ালা প্রেম হরি রসকা রে ॥
বাল অবস্থা খেল্ গোয়াঞি, তরুণ ভেয়ো নারী বশকারে।
বৃদ্ধ ভেয়ো কফ বায়ুমে ঘেরা, ঘাট পড়া রহ যা মসকারে ॥
লাভ কমলমে হ্যায় কস্তুরী, ক্যায়সে ভরম টুটে পশুকারে।
বিন্ সদ্‌গুরু নয় এয়সা হি ভোলে, যায়সে মৃগ ফিরে বন্‌কা রে ॥" ১৮

বরানগর মঠের সাঙ্গীতিক পরিবেশের আর একটি অন্তরঙ্গ পরিচয় মহেন্দ্রনাথ দত্ত দিয়েছেন,—

"বরাহনগর মঠ একটা আদর্শ ভালবাসার স্থল ও কেন্দ্র হইয়া উঠিল। সকলেই যেন এক মন এক প্রাণ এবং পরস্পর পরস্পরকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মনে করিত এবং তদ্রূপই শ্রদ্ধাভক্তি করিত। ভিতর বাহির, ছোট ও বড় কিছুই ছিল না; আদেশও ছিল না, নিষেধও ছিল না। বরাহনগর মঠ যেন জগৎ হইতে এক পৃথক, স্বতন্ত্র স্থান।···ভদ্রলোকের ছেলে বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছে, মুষ্টিভিক্ষা করিয়া আনে, এবং সেই চাল সিদ্ধ করিয়া একটি কাপড়ে ঢালিয়া নুন লঙ্কার ঝোল বা তেলাকুচার ঝোল দিয়া খাইয়া থাকে, সেই কারণে শরীরটা কৃশ হইয়া পড়িল এবং অনেক সময় মনও দুর্বল হইয়া পড়িল। এই সকল অন্তরায় দূরীকরণার্থে বৈরাগ্যমূলক অনেক সঙ্গীত হইতে লাগিল। শরৎ মহারাজ নরেন্দ্রনাথের নিকট মোটামুটি গাহিতে শিখিয়াছিলেন, তিনিও গানে যোগ দিতেন। অনেক গানই হইত, তাহার মধ্যে বিশেষ করিয়া এই কয়েকটি গানের উল্লেখ করিতেছি, যথা—

(১) মন চল নিজ নিকেতনে, সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে
কেন ভ্রম অকারণে ॥
(২) সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুবাই।
(৩) জাগো সকলে অমৃতের অধিকারী।
(৪) আমায় দে মা পাগল করে, কাজ নাই আর জ্ঞান বিচারে।
(৫) গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে।
(৬) রাধা বই আর নেইকো আমার, রাধা বলে বাজাই বাঁশী।
(৭) যশোদা নাচাত তোরে বলে নীলমণি

(৮) উথলিল প্রেমসিন্ধু, কি আনন্দময় হে।
(৯) ম্যায় গুলাম ম্যায় গুলাম ম্যায় গুলাম তেরা।
(১০) যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।……

সঙ্গীত চর্চায় মন যে কত উচ্চ দিকে লইয়া যায় এবং ইহা ঈশ্বরোপলব্ধির উপায়, সকলেই তখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। এক একদিন সঙ্গীত বা ভজন এমন জমিয়া যাইত যে, আহারের জন্য কোন হুঁস থাকিত না, সকলেই তন্ময় হইয়া থাকিত। নরেন্দ্রনাথ এক একদিন তানপুরা লইয়া সঙ্গীত আরম্ভ করিতেন, তাহাতে সকলেই বিভোর হইয়া যাইতেন।…" [১৯]

নরেন্দ্রনাথ গৃহত্যাগ করে যাবার পরে এবং বরানগর মঠে অবস্থানকালে সাধারণ সংসারী লোকের তাঁর সম্বন্ধে কিরকম ধারণা হয়েছিল, তার একটি কৌতুকাবহ বিবরণ পাওয়া যায়। তার মধ্যে তাঁর সঙ্গীতের প্রসঙ্গ উল্লিখিত থাকায় মন্তব্যটি আমরা মূল্যবান বিবেচনা করি। কারণ তা থেকে নরেন্দ্র নাথের সঙ্গীত প্রসঙ্গে একটি কথা বেশ বোঝা যায়। তিনি যে ওস্তাদের শিক্ষাধীনে রীতিমত সঙ্গীতচর্চা করেছিলেন এবং নিয়মিত কণ্ঠসাধনার ফলে গুণী গায়ক হয়েছিলেন সে কথা অনেকের জানা ছিল। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, নরেন্দ্রনাথ সে সময় মঠ বা বিশেষ ঘনিষ্ঠ দু একজন ব্যক্তির (যেমন বলরাম বসু, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির) বাড়ী ভিন্ন অন্য কোথাও গান করতেন না। সেজন্যে অনেকের ধারণা হয়েছিল যে তিনি সঙ্গীত সে সময় পরিত্যাগ করেছেন এবং গান একেবারেই করেন না।

সেই বিবরণটি হল: "নরেন্দ্রনাথের পূর্ব পরিচিত এক বন্ধু একদিন বলিল, তাইত হে, নরেন্দ্র পাগল হয়ে বেরিয়ে গেল। এমন গানটা মাটি করে গেল; এত বছর গানটা শিখে গলা সেধে সব মাঠে মারা গেল।" [২০]

এমন একজন স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিও—যিনি নরেন্দ্রনাথের সন্ন্যাস গ্রহণে তাঁকে 'পাগল' সাব্যস্ত করেছিলেন—স্বীকার করেছেন যে, নরেন্দ্রনাথ কয়েক বছর সঙ্গীত শিক্ষা করেছেন রীতিমত কণ্ঠসাধনা করে। তিনি যে কলাবতের অধীনে কয়েক বছর নিয়মিত সঙ্গীতচর্চা করেছিলেন, তা অনেকের মতন এই ব্যক্তিরও জানা ছিল। এটি তারই এক দৃষ্টান্ত এবং ১৮৮৭ সালের জুন-জুলাই-এর কথা।……

বরানগর মঠে অবস্থানের সময় নরেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন। কলকাতায় এলে অনেক সময় তিনি বলরাম বসুর বাড়ী, গিরিশচন্দ্রের বাড়ী কিম্বা রামতনু বসু লেনে মাতামহীর বাড়ীতে দেখা করে যেতেন। ১৮৮৭ থেকে তাঁর মাতা ও ভ্রাতৃদ্বয় অনেক সময় রামতনু বসু লেনের উক্ত বাড়ীতে বাস করতেন কোন কোন জ্ঞাতির দুর্ব্যবহারের জন্যে।

এই সময় নরেন্দ্রনাথ বলরাম বসুর দোতলার ঘরে বসে অনেকদিন অনেক গান করেছেন। এই গৃহে তাঁর সঙ্গীতের প্রসঙ্গ মহেন্দ্রনাথ দত্ত চমৎকার বর্ণনা করেছেন। এই বিবৃতি থেকে গায়ক নরেন্দ্রনাথের অতি অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর গান করবার সময়ের ব্যক্তিত্বপূর্ণ সত্তার এমন সাক্ষাৎ বর্ণনা অন্যত্র দুর্লভ। এই প্রসঙ্গটি থেকে পরিষ্কার ভাবে জানা যায়—তান্‌পুরায় সুর বাঁধার বিষয়ে তিনি কতখানি পুঙ্খানুপুঙ্খ ছিলেন, সুর বাঁধার এবং গান করবার সময়ে তিনি কতদূর একাগ্রচিত্ত হতেন, গানের সময়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব কিভাবে প্রকটিত হত কিংবা তাঁর সঙ্গীতসত্তা কি অপূর্বভাবে উদ্‌ঘাটিত হত। সেসব বিষয় সুন্দরভাবে দত্ত মহাশয় এখানে উপস্থাপিত করেছেন—

"বলরাম বসুর বাড়ীতে কখন কখন নরেন্দ্রনাথ সন্ধ্যার সময় ভজন গাহিতেন—তানপুরায় সুর বাঁধিতেন, তারটায় টং টং করিয়া বাজাইতেন, আবার কাণটা একটু টিপিতেন, বাঁয়া তবলায় টোকা দিতেন, সব সুর কয়টা ঠিক হইল কিনা দেখিতেন। সেই সময় তিনি এত গম্ভীর হইতেন এবং এত নিবিষ্ট মনে সুরের দিকে লক্ষ্য রাখিতেন যে, আগন্তুক ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ যদি একটু ফুসফাস আওয়াজ করিত তাহা হইলে তিনি একেবারে সক্রোধে তাহাকে গালি দিতেন ও ভৎর্সনা করিতেন; এমন কি তাহাকে তথা হইতে উঠিয়া যাইতে আদেশ করিতেন। সঙ্গীত বিদ্যা তাঁহার নিকট চাপল্য বা বালকের খেলা ছিল না। ইহা অতি গম্ভীর, ঋষিবিদ্যা। শুদ্ধ পবিত্র জিনিষ……নরেন্দ্রনাথ সুর বাঁধিয়া তানপুরায় তান দিয়া যখন ধ্রুপদ গান করিতেন তখন তিনি স্বতন্ত্র ব্যক্তিতে পরিণত হইতেন। চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত ও উজ্জ্বল, দৃষ্টি স্থির এবং অলক্ষিতভাবে লক্ষ্য করিতেছেন এরূপ গভীর তেজঃপুঞ্জ, পরিমিত স্পন্দন যুক্ত শব্দ তাঁহার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইত; তাঁহার মুখ তখন মহাতেজোদীপ্ত হইয়া উঠিত এবং অবয়ব অতি গম্ভীর ও স্থির হইয়া

যাইত। নিজের মুখে কোন চাপল্যের ভাব নাই এবং উপস্থিত ব্যক্তিদেরও চাপল্য করিবার কোন সামর্থ্য থাকিত না। ....নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীতকালে এত গম্ভীর ও তেজঃপূর্ণ হইয়া উঠিতেন। সেই সময়টা যেন গৃহাভ্যন্তরে বায়ু দোদুল্যমান হইত। শক্তি যেন সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইত এবং উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মনও যেন ঐ শক্তির সঙ্গে মিলিত হইয়া কোথায় উর্ধ্বে চলিয়া যাইত। ধ্যান আপনা আপনিই যেন সকলের মধ্যে আসিতে থাকিত—ইহাই হইতেছে সঙ্গীতের তাৎপর্য।" ২১

রীতিমত ধ্রুপদ গানের চর্চা যে নরেন্দ্রনাথের তখনো ছিল এবং ইচ্ছা হলে তিনি ধ্রুপদ গাইতেন তা এখানে জানা গেল।

তাঁর ধ্রুপদ গানের আরো একটি উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাসঙ্গিক বলে এখানে সেই বিবরণ উদ্‌ধৃত করা হল—এর মধ্যে তৎকালীন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গবাদক গোপালচন্দ্র মল্লিকের উল্লেখ আছে:—

"...শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পরে তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষ করিয়া দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে একটি করিয়া উৎসব হইতে লাগিল।... কুঠিবাড়ীর বড় ঘরটিতে বৈঠকী গান হইত। নারায়ণ চন্দ্র (নারায়ণ দাদা) নামক জনৈক দীর্ঘাকৃতি গৈরিকবসনধারী ব্যক্তি কয়েক বৎসর গান করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে পাখোয়জও সঙ্গত হইত। সুবিখ্যাত পাখোয়াজ বাজিয়ে গোপাল মল্লিকও উপস্থিত থাকিতেন। ......নরেন্দ্রনাথও একবৎসর অনবরত ধ্রুপদ গান গাহিয়াছিলেন।" ২২

এবারে বরানগর মঠে তাঁদের একটি সম্মিলিত কীর্তনের বিবরণ দিয়ে মঠের কথা শেষ করা হবে। সে সময় যোগেন মহারাজ (যোগীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বা যোগানন্দস্বামী) কয়েকমাস বৃন্দাবনে সাধন ভজন করে মঠে ফিরে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে রহস্য-কৌতুক করতে করতে সেদিন নরেন্দ্রনাথ গানের প্রসঙ্গ আরম্ভ করেছিলেন। তারপর তার শেষ হয়েছিল কেমন ভাবে তা নীচের বিবৃতিটি থেকে পাওয়া যাবে। স্বামী প্রেমানন্দ কথিত এই বিবরণীটি দিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত:—

"সকলের খাওয়া হলে প্রায় বারটা নাগাদ নরেন বললে, 'ওরে যোগে ত' বৃন্দাবনে গেছলি, দে আমাকে বৈরাগী সাজিয়ে দে।' সকলে মিলে নরেন্দ্রনাথকে কপালে তেলক, গলায় কণ্ঠি, হাতে ঝুলি, আর তা থেকে জপ করবার

জন্যে আঙুল বার ক'রে দিয়ে এক ঢঙ্ সাজায়ে দিল। নরেন্দ্রনাথ প্রথম খানিকক্ষণ ব্যঙ্গ ক'রে যেন কতই মালা জপ করছে—আওয়াজ করে বলতে লাগল, 'আ—ধা—কে—স্তো—আ—ধা—কে—স্তো—আ—ধা—কে—স্তো'। তারপর একটা গান ধরলে, 'নিতাই এনেছে নাম রে'। নাম কথাটা না বলে অপর একটা কথা বলে ভ্যাঙচাইতে লাগিল। এই রকম কৌতুক, ব্যঙ্গ, হাসি চলছিল। অল্পক্ষণ পরেই হঠাৎ নরেন্দ্রনাথের মুখভঙ্গী, কণ্ঠস্বর ও অবয়ব সম্পূর্ণ বদলে গেল, সিংহ গর্জনে বলতে লাগল 'বোল হরি বোল, হরি হরি বোল।' এর পূর্বে সকলে অসংযতচিত্তে বসেছিল, কিন্তু নরেন্দ্রনাথের সিংহগর্জন শুনে সকলেই ত্রস্ত হয়ে পড়ল। অনতিবিলম্বে সকলে দাঁড়িয়ে উদ্দাম নৃত্য ও কীর্তন করতে লাগল। ঠাকুরের ঘর থেকে খোল করতাল এনে বাজাতে লাগল। কিন্তু অনবরত খোল বাজানো এত দুরূহ হয়েছিল যে, পর্যায়ক্রমে তিনজনকে খোলটা ঘাড়ে করতে হয়েছিল, তবুও তাদের আঙুলগুলো ফুলে গিয়েছিল। হরিনামের রোল আর নৃত্যে বাড়ীখানি দুলতে লাগল, পড়ে যাবার উপক্রম। শশী মহারাজ তাড়াতাড়ি গিয়ে বাইরে থেকে ভিতরে আসবার যে দরজা সেটা বন্ধ করে দিয়ে এল। অবিরাম হুঙ্কারধ্বনি, উদ্দাম নৃত্য ও কীর্তন। নরেন্দ্রনাথের এবং আর সকলের চোখ থেকে অশ্রুধারা পড়ে মুখ আর বুক ভেসে যাচ্ছে; কিন্তু নৃত্য কীর্তন বন্ধ নাই। ক্রমে ক্রমে কীর্তনের বোল বরাহনগরের বাজার পর্যন্ত চলল। দোকান পশারীরা দোকান বন্ধ করে দৌড়ে আসতে লাগল। নীচেকার উঠান সব লোকে ভরে গেছে, রাস্তায় লোক জমে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে উপরকার বাইরের বারান্দায় কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে আছে। কেউ বা কীর্তন শুনবার ও দেখবার জন্যে দোরের ফাটলে চোখ দিয়ে স্থির হয়ে বসে রয়েছে।…আমি বাইরে এসে দেখি কিনা উঠানে কত লোক; রাস্তায় লোকারণ্য। তারপর দেখি যে, বাইরের উপরকার দালানটা পর্যন্ত লোকারণ্য। কীর্তন আরো খানিকক্ষণ চলে বন্ধ হল। লোকেরা সব বলতে লাগল, 'দাদাঠাকুর, এমন কীর্তন কখনো শুনিনি, এমন মধুর হরিনাম কখনো শুনিনি'। [২৩]

বরানগর মঠে অবস্থানের সময় প্রথম দু' বছর নরেন্দ্রনাথ বিশেষ কোথাও ভ্রমণে যাননি। অন্তরে তাঁর ভ্রমণের ইচ্ছা প্রবল থাকলেও, মঠের প্রথম

দিকেই তিনি ভ্রমণে গমন করলে পাছে মঠের সাংগঠনিক ক্ষতি হয়, তাই বিশেষ কোথাও যেতেন না। এই দু' বছরের মধ্যে তিনি শুধু আঁটপুরে (বাবুরাম বা স্বামী প্রেমানন্দের পূর্বাশ্রম), কয়েকবার বৈদ্যনাথ ও শিমূলতলায় গিয়েছিলেন। তারপর একবার পশ্চিমে যান, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে।

সেবারের পশ্চিমভ্রমণকালে তাঁর প্রথম শিষ্য হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র গুপ্ত নামে একজন প্রবাসী বাঙালী। সেই প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা হবে। কারণ এখানেও তাঁর গানের কথা আছে।

শরৎচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে বৃন্দাবনের কাছে হাথ্‌রাস্‌ স্টেশনে। এই স্টেশনে স্বামীজী তখন অতিশয় শ্রান্ত, ক্লান্ত হয়ে বসেছিলেন। কোথায় যাবেন সেসব কিছুই স্থিরতা নেই, মন নানা চিন্তায় ভারাক্রান্ত। সেখানে বসে আপন মনে একটি ব্রহ্মসঙ্গীত গান করছিলেন।

শরৎচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন স্টেশনের রেলকর্মচারী। সন্ন্যাসীর সঙ্গীতে আকৃষ্ট হয়ে এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেন এবং পরে তাঁর শিষ্য হন। স্বামীজী শরৎ গুপ্তকে বার বার প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ তখন তাঁর শিষ্য করবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু শরৎচন্দ্রের একনিষ্ঠতা ও গভীর আন্তরিকতায় শেষ পর্যন্ত সম্মত হন। এসব বৃত্তান্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত বিস্তারিত ভাবে বিবৃত করেছেন। তাতে দেখা যায় যে, শরৎচন্দ্রকে সন্ন্যাস গ্রহণের প্রেরণা দেয় স্বামীজীর সঙ্গীত।

এই প্রসঙ্গের প্রয়োজনীয় অংশ এখানে উদ্‌ধৃত হল :—

"নরেন্দ্রনাথ আপনা আপনি গান করিতে লাগিলেন, 'সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে কেন ভ্রম অকারণে' ইত্যাদি। তাঁহার মুখের গানটি শুনিয়া উক্ত কর্মচারীর যেন মুহূর্তে সব ভাব বদলে গেল—তাহার আর চাকুরি করা বা বাড়ী ঘরদোরের কথা যেন চিরকালের জন্য একেবারে মন থেকে দূর হয়ে গেল। বাবা, মা, ভাই, বোন সকলই তার ছিল ; কিন্তু সে তখন যেন অন্য প্রকার হইয়া উঠিল। সংসারের কোন বিষয়ই যেন তার আর উপাদেয় বোধ হইল না।…তারপর গুপ্ত স্থির করলে—কাজকর্ম ছেড়ে সন্ন্যাস নিতে হবে।" [২৪]

শরৎচন্দ্র গুপ্ত হাথ্‌রাস্‌ থেকেই নরেন্দ্রনাথের সঙ্গ নেন এবং পরে বরানগর মঠে যোগদান করে স্বামী সদানন্দ নামে সুপরিচিত হয়েছিলেন।…

তারপর ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে নরেন্দ্রনাথ দীর্ঘ পর্যটনে নির্গত হলেন। এবার আরম্ভ হ'ল তাঁর জীবনের আর এক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব—তাঁর পরিব্রাজক জীবন। উত্তরকালের বিবেকানন্দ স্বামীর অন্তর-গঠনে এই পরিব্রাজক জীবন যে কতখানি সহায়তা করেছিল, তা' তাঁর জীবনী-পাঠকদের অজানা নয়। সে প্রসঙ্গ কিছু পরেই উল্লেখ করা হবে। তার আগে মঠের কথা একটু বলবার আছে।

তিনি যে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি ভারত পর্যটন করতে বেরুলেন বরানগর মঠ থেকে, তারপরে আর তাঁর বরানগর মঠে অবস্থানের অবকাশ ঘটেনি। শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যদের এই মঠ বরানগরের মুন্সী বাড়ীতে ছিল ১৮৯২ খৃঃ পর্যন্ত। অর্থাৎ, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস থেকে প্রায় ছ' বছর বরানগর মঠের অস্তিত্ব ছিল। পরবর্তী কালের পৃথিবী-বিখ্যাত ও নানা শাখায় সুসংবদ্ধ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের আদি অবস্থা হল এই বরানগর মঠ। তারপর ১৮৯২ থেকে ১৮৯৭ খৃঃ পর্যন্ত মঠটি আলমবাজারের মঠ নামে পরিচিত ছিল। কারণ ১৮৯২তে মঠ মুন্সীবাড়ী থেকে স্থানান্তরিত হয় আলমবাজারের একটি বাড়ীতে। সেই বাড়ী এখনো বর্তমান আছে—৯৫, দেশবন্ধু রোড, এই ঠিকানায়। আলমবাজারের মঠ হ'ল রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দ্বিতীয় পর্যায়। স্বামীজী যখন আমেরিকা থেকে বিপুল গৌরবে প্রত্যাবর্তন করেন ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে, মঠ তখনো আলমবাজারের সেই বাড়ীতে ছিল। সেখান থেকে বেলুড়ে মঠ নির্মাণ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার কথা যথাসময়ে বর্ণিত হবে।

এবারে তাঁর পরিব্রাজক জীবনের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে। কারণ এই পর্বেও সঙ্গীতপ্রসঙ্গ একাধিকবার পাওয়া যায়। তা' ছাড়া, যদিও এটি তাঁর জীবনী গ্রন্থ নয়, তবু তাঁর জীবনের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করবার জন্যে এই অধ্যায়ের প্রয়োজন আছে। কারণ এই পরিব্রাজক জীবন তাঁর বৃহত্তর জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ অংশ এবং তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জীবনকে এক বিচিত্র যোগসূত্রে গ্রথিত করেছে। ১৮৯০ থেকে ১৮৯৩ খৃঃ পর্যন্ত দীর্ঘ তিন বছর ধরে এই যে ভারত পরিক্রমা—তা যেন তাঁর অব্যবহিত পরবর্তী কালের আমেরিকা ও ইউরোপ প্রবাসকালীন কর্মমুখর জীবনের ভূমিকাপর্ব। ভারতবর্ষে এই তিন বছরের পরিব্রাজক জীবনে তাঁর নতুন করে আত্মদর্শন ঘটে, যখন স্বদেশাত্মার আর-এক রূপ তিনি চোখের সামনে দেখলেন। সেই

দিক থেকে বলা যায় যে, এই ভারতপরিক্রমার অধ্যায়টি তাঁর জীবনে

ক্রমান্বয়ে তিন বছর সমগ্র ভারত ভ্রমণ করতে গিয়ে স্বামীজী দেশমাতৃকার আর-এক রূপ দেখলেন। সে অতি দুঃখকর বাস্তব অবস্থা। গ্রামে গ্রামে দারিদ্র্য, অর্ধাহার আর রোগে মুমূর্ষু, অশিক্ষায় আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন দেশের অগণিত জনসাধারণ। দেশের সেই দুর্গত অবস্থা দেখে তাঁর বিশাল হৃদয় মমতায় পূর্ণ হল। তাঁর দেশপ্রীতির নতুন করে উদ্বোধন হল। ইতোপূর্বেও তিনি পরদুঃখে কাতর হতেন, পীড়িতের সেবা করতেন, বিপন্নের সাহায্য করতেন সাধ্য মতন। কিন্তু এবারে তাঁর বিরাট অন্তঃকরণ সমগ্র দেশের জন্যে গভীর সহানুভূতিতে পূর্ণ হয়ে উঠল। তাঁর দেশপ্রেম নতুন চেতনা লাভ করলে; পরে আমেরিকা ইউরোপ প্রবাসকালে সেখানকার সঙ্গে তুলনা করে তা আরো গভীর হয়ে উঠেছিল।

আসমুদ্র হিমাচল-ব্যাপী তাঁর এই পরিব্রাজক জীবনের অভিজ্ঞতায় কেমন করে ভারতবর্ষের ধর্ম ও ভারতবর্ষ অর্থাৎ দেশের মানুষ, ভারতের তীর্থস্থান ও জন্মভূমি ভারত তাঁর কাছে একাকারে মিশে গিয়েছিল: তাঁর কর্মাদর্শের একটি বড় অংশ অধিকার করেছিল দেশের দরিদ্র-নারায়ণের সেবা—সে সমস্ত কথা তাঁর জীবনী পাঠকদের অজানা নয়। তেমনি সকলের জানা আছে, তাঁর ভারততীর্থ পরিক্রমা সম্পূর্ণ হয়েছিল দক্ষিণ ভারতের শেষ স্থলরেখা কুমারিকায়। ভারত সমুদ্রতীরে দেশের প্রান্ত সীমায় উপলখণ্ডে উপবেশন করে ধ্যানের সময়ে দেশের দুঃখ স্মরণ করে তিনি ক্রন্দন করেছিলেন।...জীবনের প্রায় শেষপটে রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ প্রতিষ্ঠা করে তিনি যে বিরাট সেবাব্রতের ও কর্মকাণ্ডের সূচনা করেন, তাতেই হয়ত তাঁর এই অন্তরের আকুলতা খানিক তৃপ্ত হয়েছিল। এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করলে স্বামীজীর জীবন যে উনিশ শতকের নবজাগৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত, তিনি যে ভারতীয় নবজাগরণের অন্যতম হোতা তা ধারণা করা যায়। তবে সে সব প্রসঙ্গ আমাদের বিষয় বহির্ভূত।

ভারতে তাঁর সেই তিন বছরকার পরিব্রাজক জীবনের সবিস্তার বিবরণেও আমাদের প্রয়োজন নেই। এই সুদীর্ঘ পরিব্রাজক জীবনেও তিনি অনেকস্থানে সঙ্গীতে বহু লোককে মুগ্ধ করেছিলেন। সে সমস্ত বিবরণও দেওয়া সম্ভব নয়। মাত্র কয়েকটি স্থানে তাঁর সঙ্গীতের প্রসঙ্গ, নির্ভরযোগ্য সূত্রে যা পাওয়া, তা' এবার উল্লেখ করা হবে।

প্রথমে প্রয়াগে একদিনের কথা মহেন্দ্রনাথ দত্তের বিবরণ থেকে উদ্ধৃত হল :—

"একদিন অপরাহ্নে নরেন্দ্রনাথ ও অপর সকলে একত্রিত হইয়া ভজন ও সঙ্গীত করিতেছিলেন। ভাব জমিয়া গেল। সঙ্গীত ও ভজনাদি কিছুক্ষণ চলিতে লাগিল। গোবিন্দ ডাক্তারের মনে বিশেষ ভক্তি আনন্দ উদ্দীপিত হইল এবং মধুর সঙ্গীতে মনের আবেগ অধিকতর বৃদ্ধি হওয়ায় ভাব সংবরণ করিতে না পারিয়া দুই নয়নে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির গানে বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।" ২৫

তাঁর সঙ্গীতের প্রসঙ্গে খেতরী রাজ্যের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়। রাজস্থানে, জয়পুর থেকে ৯০ মাইল দূরবর্তী খেতরীর রাজসভায় তাঁর গানের একাধিক প্রসঙ্গ আছে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, খেতরীর রাণা অজিত সিংহ স্বামীজীর শিষ্য হয়েছিলেন এবং অতিশয় অনুগত ছিলেন। তাঁর পরিব্রাজক জীবনের শেষ পর্ব এবং আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে খেতরীরাজ তাঁর জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং স্বামীজীর আমেরিকা-যাত্রার ব্যাপারে অনেক প্রকারে সাহায্য করেছিলেন। খেতরীরাজ বিশেষ সঙ্গীতপ্রেমী ছিলেন এবং তাঁর দরবারে স্বামীজী গান করেন বলে প্রকাশ। শুধু গান নয়, এখানে তিনি পাখোয়াজও বাজিয়েছিলেন, জানা যায়। আর, অনেকদিন পরে এখানে তাঁর ধ্রুপদ গানের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। রাগসঙ্গীতের চর্চা যে তিনি কখনো দীর্ঘকালের জন্যে পরিত্যাগ করেন নি, এখানে তার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল, পরে আরো পাওয়া যাবে। তাঁর প্রামাণিক জীবনবৃত্তান্তে উল্লিখিত আছে যে,—"খেতরী রাজসভাতেও তিনি দরবারী কানাড়া, ইমন কল্যাণ ও বাগেশ্রী আলাপ করিয়া ও মৃদঙ্গ বাজাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।" ২৬

পরিব্রাজক জীবনের নানা ক্লেশকর পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি যে রাগসঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন, তার এই উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে সঙ্গীতের সাধনা তাঁর মধ্যে কতখানি আত্মস্থ ছিল। ধ্রুপদ গানে নৈপুণ্য অর্জন করতে গেলে যেমন কঠিন সাধনার প্রয়োজন, তেমনি চর্চা না থাকলে সে যোগ্যতা রক্ষা করাও যায়না। সুদীর্ঘকাল যদি কোন ধ্রুপদ গায়ক সঙ্গীতচর্চা বন্ধ রাখেন, তাহলে তাঁর পক্ষে তা যথারীতি গান করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে—

অন্তত সঙ্গীতের বৈঠকে। খেতরীরাজ স্বয়ং সঙ্গীতবোদ্ধা ছিলেন এবং তাঁর রাজসভা ছিল সঙ্গীতের দরবার। সেখানে যে স্বামীজী দরবারী কানাড়া, ইমন কল্যাণ প্রভৃতি ভারি রাগের ধ্রুপদ গান গেয়েছিলেন, তা তাঁর গানের উচ্চ মানের পরিচায়ক।

খেতরী-রাজার দরবারে স্বামীজী শুধু গান করেন নি। সেখানে তাঁর সঙ্গীতপ্রসঙ্গে আরো একটি ঘটনার কথা জানা যায়। রাজা বিশেষ সঙ্গীতামোদী ছিলেন বলে তাঁর দরবারে নিয়মিত সঙ্গীতের আসর বসত এবং সেই উপলক্ষ্যে নানা কুশলী গায়ক গায়িকার সমাবেশ হ'ত। এমনি এক গানের আসরে স্বামীজী উপস্থিত ছিলেন দরবারে। সেদিন এক নর্তকী বৈষ্ণব কবি সুরদাসের একটি বিখ্যাত ভজন গান গেয়েছিলেন। গানটির ভাব ও ভাষা যেমন অপূর্ব, নর্তকী গেয়েছিলেনও তেমনি। গানখানি সাধারণ আসরের মতন গীত হয়নি, তার মধ্যে বিশেষত্ব ছিল। এ প্রসঙ্গে মনীষী রমাঁ রলাঁর গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হবে। এই ভজন গানের আবেদনে স্বামীজী অভিভূত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং গানটি তিনি স্বয়ং উত্তরকালে মাঝে মাঝে গাইতেন (এই অধ্যায়েই পরে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে)।

গানখানি তাঁর নর্তকীর কণ্ঠে শোনবার কথা রমাঁ রলাঁ যে অপরূপভাবে বর্ণনা করেছেন তা নাটকীয় দৃশ্যের মতন হৃদয়গ্রাহী। বারাঙ্গনা নর্তকীকে দরবারে উপস্থিত হতে দেখবামাত্র আকুমার ব্রহ্মচারী স্বামীজী ঘৃণায় স্থান-ত্যাগ করবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। তখন নর্তকী ক্ষমা ভিক্ষা করলেন সুরদাসের ভাষায় এবং সুরের আকুতিতে : প্রভু যেন তাঁকে ঘৃণা না করেন, দোষ না নেন ; দয়া করে যদি পারে যাবার ব্যবস্থা করে দেন—এই প্রার্থনা।

"During the first months of his pilgrimage when he was with the Maharaja of Khetri near Jaipur (April, 1891), a little dancer gave him all unwittingly a lesson in humility. When she appeared, the scornful monk rose to go out. The prince begged him to remain. The dancer sang :—

"O Lord, look not upon my evil qualities ! Thy name, O Lord, is same-sightedness. Make of us both the same Brahman ! One piece of iron is in the image in the temple, and another is the knife in the hand of the butcher. But when they touch the philosopher's stone both alike turn into gold.

So, Lord, look not upon my evil qualities ! Thy name, Lord, is same-sightedness...

"One drop of water is sacred in Jumna and another is foul in the ditch by the road side. But when they fall into Ganges both alike become holy. So, Lord, do not look upon my evil qualities. Thy name, Lord, is same-sightedness..."

Naren was completely overwhelmed. The confident faith expressed in the humble song affected him for life Many years later he recalled it with emotion." ২৭

নর্তকী গাইতে লাগল—

'প্রভু মেরে অবগুণ চিত না ধরো,
সমদরশী হাম হায় তিহারো,
চাহে তো পার করো ।'···

"নরেন সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে পড়লেন। এই ছোট গানখানিতে যে অবিচল বিশ্বাস প্রকাশিত হয়েছিল, তা' আজীবন তাঁকে প্রভাবিত করে। অনেক বছর পরেও তিনি আবেগের সঙ্গে এই গানের প্রসঙ্গ স্মরণ করতেন।"

খেতরী রাজ্যে স্বামীজীর গান গাইবার কথা- মহেন্দ্রনাথ দত্তও উল্লেখ করেছেন তাঁর "শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর ঘটনাবলী, তৃতীয় খণ্ড" পুস্তকে (১৭৬ পৃষ্ঠায়)। কিন্তু তিনি "প্রভু মেরে অবগুণ" গানটির প্রসঙ্গে কিছু বলেননি। তবে স্বামীজীর অন্যান্য কয়েকটি জীবনীতে নর্তকীর উক্ত গানের বিবরণ পাওয়া যায়। প্রমথনাথ বসু ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। স্বামী শ্যামানন্দও লিখেছেন—

"মনেতে নর্তকী ঘৃণা হইল উদয়।
নারীকণ্ঠে গীত শুনা বারণ যে হয়॥
চণ্ডালে শঙ্করে যথা দিল ব্রহ্মজ্ঞান।
নর্তকী উড়ায়ে দেয় স্বামী ভেদজ্ঞান॥
"প্রভু মেরে অবগুণ চিত না ধরো।
সমদরশী হায় হাম তিহারো, চাহে তো পার করো॥
'এক লোহা পূজামে রাখত,
এক রহত ব্যাধ ঘরপরো,
পরশকে মন দ্বিধা নহী, হৈ,
দুহুঁ এক কাঞ্চন করো॥

ইক নদীয়া ইক নহর কহাবত মইলী নীর ভয়ো।
জল মিলি দোনো এক বরণ ভয়োঁ গঙ্গা নাম পরো॥
এক মায়া এক ব্রহ্ম কহাবত সুরদাস ঝগড়ো।
অজ্ঞান সে ভেদ হোবে জ্ঞানী কাহে ভেদ করো॥" [২৮]

খেতরীতে সেবারে স্বামীজী ছিলেন ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে। তারপর সেখান থেকে গুজরাট হয়ে আসেন জুনাগড়ে।

জুনাগড়ে তাঁর একটি সঙ্গীত প্রসঙ্গ পাওয়া যায়, যা কৌতুকপ্রদ। এখানে তাঁর গানকে তিনি একটি বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহার করেছিলেন। জুনাগড় রাজ্যে তিনি অবস্থান করেন রাজ-দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাসের বাড়ী। সেখানকার খাওয়ার ব্যাপারে স্বামীজী তখন বড় অসুবিধায় পড়েছিলেন। কারণ সেখানকার রান্না তাঁর বাঙালী শরীরের পক্ষে কিছু মুস্কিলের কারণ হয়েছিল। সে অঞ্চলের রীতি অনুযায়ী ডাল রান্না হ'ত বিশেষ ধরণে—ডাল সিদ্ধ করে শিলে বেটে হাঁড়ির জলে মেশানো হত। সেই অদ্ভুত ডাল স্বামীজীকে খাবার সময়ে দেওয়া হত—দিনের পর দিন। কিছুদিন পরে স্বামীজী এই সমস্যা সমাধানের এক উপায় স্থির করলেন। তিনি বাড়ীর পাচকের সন্ধান নিয়ে সাক্ষাৎ করলেন তার সঙ্গে। তারপর তার সঙ্গে যথোচিত আলাপাদি করে তাকে গান শুনিয়ে আনন্দ দিতেন এবং ব্যবস্থা করে নেন যেন সে ডালের দানাগুলি বেটে না ফেলে আলাদা করে তাঁকে ভাতের সঙ্গে দেয়। এই ঘটনার কথা স্বামীজী নিজে বলেন লণ্ডনে অবস্থানের সময় এবং তা বিবৃত করেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত। [২৯]

উত্তরপশ্চিম ভারত ভ্রমণ শেষ করে স্বামীজী দক্ষিণে গিয়েছিলেন। দক্ষিণাঞ্চলের নানা স্থানে ভ্রমণের মধ্যে তিনি আসেন মাদ্রাজে। মাদ্রাজে অবস্থানের সময় তিনি প্রবাসী মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের (মাদ্রাজের তখনকার এ্যাসিষ্টাণ্ট এ্যাকাউন্টেন্ট্ জেনারেল এবং পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের পুত্র) বাড়ী কয়েকদিন ছিলেন। সেখানে থাকবার সময় স্বামীজী তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম, ধাম ইত্যাদি কিছুই জানাননি। অথচ এমন তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল যে মন্মথনাথ তাঁকে পরিচয় বিষয়ে কোন প্রশ্ন করতে পারেননি। সেজন্যে শ্যামবাজারে ভ্রাতা মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে লিখেছিলেন যে স্বামীজীর সম্পর্কে

যেন কলকাতায় খোঁজ নেওয়া হয় যে তিনি কে ইত্যাদি। স্বামীজীর বর্ণনা দিয়ে মন্মথনাথ সেই পত্রে লেখেন যে,—একজন বাঙ্গালী সাধু তাঁর ঘরে আছেন, বয়স আন্দাজ ৩০-৩২ বছর, মুখ গোল, কপালে কাটা দাগ, ভাল গাইতে পারেন, ইংরাজী লেখাপড়া ভাল রকমই জানেন, হাস্যকৌতুক প্রিয় ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এক বিশেষ ভক্ত—এঁর বিষয়ে সন্ধান নিয়ে যেন তাঁকে মাদ্রাজে জানানো হয়।৩০

এখানেও স্বামীজীর সঙ্গীতনৈপুণ্যের কথা উল্লিখিত হয়েছে। স্বামীজীর গান নিশ্চয় ভট্টাচার্য মহাশয় শুনেছিলেন। নচেৎ তিনি যে একজন সুকণ্ঠ গায়ক একথা অজ্ঞাত থাকত। সুতরাং মাদ্রাজেও তাঁর গান করবার কথা জানা গেল।

মাদ্রাজে তাঁর এবারকার তিন বছরের পরিব্রাজক জীবনের শেষ পর্ব। এখান থেকেই তাঁর মাদ্রাজবাসী অনুরাগীবৃন্দ তাঁর আমেরিকার ধর্ম মহাসম্মেলনে যোগ দেবার আয়োজন সম্পূর্ণ করেন। এ বিষয়ে প্রধান উদ্‌যোক্তা ছিলেন আলাসিঙ্গা এবং ট্রিপ্লিকেন সাহিত্য সমিতির সভ্যগণ। খেতরীর মহারাজা অজিত সিংহও আমেরিকা যাত্রার ব্যাপারে স্বামীজীকে নানাপ্রকারে সহায়তা করেছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, এই সময় থেকেই অর্থাৎ আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে তিনি বিবেকানন্দ স্বামী নাম গ্রহণ করেন (খেতরীরাজের অনুরোধে?)। ইতোপূর্বে তিনি বিবিদিষানন্দ, সচ্চিদানন্দ ইত্যাদি নানা প্রকার নামে এক এক সময়ে পরিচিত হতেন। কারণ নাম বিষয়ে তাঁর উদাসীনতা ছিল। অনেক সময়, যেমন মাদ্রাজে ভট্টাচার্য মহাশয়ের গৃহে, তিনি আত্মপরিচয় গোপন করে থাকতেন। পরিব্রাজক জীবনের কোন কোন সময়ে তিনি আত্মগোপন করতেন—একান্তমনে ও নির্জনে তপশ্চর্যার জন্যে, কখনো বা তীব্র বৈরাগ্যে। পরিব্রাজক জীবনে বাংলাদেশের মঠে (প্রথমে বরানগর ও পরে আলমবাজারে) তাঁর গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা হত পত্রের সাহায্যে। সেই যোগাযোগও এক এক সময় রহিত হয়ে যেত, যখন স্বামীজী পত্র দেওয়া বন্ধ রাখতেন। কারণ, আগেই বলা হয়েছে, পরিব্রাজক জীবনের কয়েকটি সময়ে তিনি তাঁর পরিচিত জগৎ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আত্মগোপন করে থাকতেন। সেজন্যে অনেক সময়ে মঠে তাঁর বিষয়ে গুরুভ্রাতারা সংবাদ পেতেন না। তাঁর আমেরিকা যাত্রার

প্রাক্কালে মঠ ছিল আলমবাজারে। তাঁর বিবেকানন্দ স্বামী নাম গ্রহণের কথা তাঁর গুরুভ্রাতারাও অনেকে জানতেন না। এমন কি, আমেরিকায় সেই মহাসম্মেলনে বিবেকানন্দ স্বামী নামে অপূর্ব ভাষণ দান করে যখন তিনি মহা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন এবং সংবাদপত্রে সেই বিবরণ প্রকাশিত হ'তে আরম্ভ করেছে, তখনো বাংলাদেশে প্রায় বিশেষ কেউই জানতেন না যে বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দ স্বামী-ই কলকাতার নরেন্দ্রনাথ দত্ত। সেকথা জানতেন মাত্র চারজন—শ্রীসারদাদেবী, সান্যাল মশায়, শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) এবং মহেন্দ্রনাথ দত্ত। একথা মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের বিবরণী থেকে পাওয়া যায় ("শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী", তৃতীয় খণ্ড ১০০ পৃষ্ঠা)।

তারপর আরম্ভ হল তাঁর জীবনের আর এক বিরাট পর্ব।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি স্বামীজী মাদ্রাজ থেকে বোম্বাই এসে সেখান থেকে জাহাজে যাত্রা করেন এবং কলম্বো, সিঙ্গাপুর, হংকং, চীন, জাপান হয়ে আমেরিকা পৌঁছলেন। সেখানে উপস্থিত হবার পরও নানা বাধা বিপত্তির শেষে চিকাগো বিশ্বধর্ম সম্মেলনে তাঁর ১১ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর (১৮৯৩) পর্যন্ত ছ'টি বক্তৃতা এবং তাঁর অপূর্ব প্রসিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়গুলি সকলের সুপরিজ্ঞাত।

আমেরিকায় তাঁর সঙ্গীতপ্রসঙ্গ বিশেষ পাওয়া যায়না। অবশ্য সেখানকার তাঁর জীবনীর আনুপূর্বিক কোন বিবরণও নেই, যেমন তাঁর অন্যত্র অবস্থানের সময়কার তথ্যপূর্ণ বিবৃতি মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি দিয়েছেন।

আমেরিকা প্রবাসের পরে স্বামীজী যখন লণ্ডনে ছিলেন, তখনকার বিবরণ মহেন্দ্রনাথ দত্তের গ্রন্থাদিতে প্রকাশিত হয়েছে। দেখা যায় যে, লণ্ডন বাস কালেও স্বামীজীর সঙ্গীত বিষয়ে কিছু কিছু উল্লেখ আছে। তবে তা তাঁর ভারতবর্ষে অবস্থানের সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্য নয়। অবশ্য তার কারণও স্পষ্ট বোঝা যায়। বিদেশে উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগের অভাব; আর সেখানে কোন সঙ্গীতের আসরও অসম্ভব ছিল। বলা বাহুল্য, তাঁর কর্মধারা তখন ভিন্ন পথে প্রবাহিত এবং বক্তৃতাদি নানাপ্রকার কর্মকাণ্ডে তিনি তখন নিরলস কর্মযোগী। সুতরাং সঙ্গীতের আবহও অনুকূল নয়। তবে

তৎকালীন ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞা, ফরাসী গায়িকা মাদাম কাল্‌ভে তাঁর গান সম্ভবত শুনেছিলেন। কারণ, ইতোপূর্বে উদ্‌ধৃত রমাঁ রলাঁর রচনার মধ্যে মাদাম কাল্‌ভে কর্তৃক স্বামীজীর কণ্ঠধ্বনির সপ্রশংস উল্লেখ দেখা গেছে। মাদাম কাল্‌ভে যে স্বামীজীর গান শুনেছিলেন, এ অনুমান অসঙ্গত হবেনা। পরবর্তী একটি অধ্যায়েও মাদামের প্রসঙ্গ এবং তাঁর সম্পর্কে স্বামীজীর মতামত পাওয়া যাবে।

লণ্ডন প্রবাসে স্বামীজীর গানের বিষয়ে যে ক'টি বিবরণ মহেন্দ্রনাথ দত্ত দিয়েছেন, অসামান্য কিছু না হলেও, সেগুলি উদ্‌ধৃত করা প্রয়োজন। স্বামীজী যে কোন অবস্থাতেই সঙ্গীতবর্জিত থাকতেন না, এগুলি তারই পরিচায়ক। সেই বৈদেশিক পরিস্থিতিতে কারো সামনে গাইবার অবকাশ হ'তনা বলে তিনি আপনার মনে মাঝে মাঝে গান গাইতেন, সময় পেলে। এমনি একদিনের (খৃঃ ১৮৯৬) কথায় দেখা যায়,—

"...সেদিন মনটা খুব প্রফুল্ল ছিল, মৃদুস্বরে বাংলায় গান গাহিতে লাগিলেন—

'সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।
ভাসল তরী সকালবেলা ভাবিলাম এ জলখেলা,
মধুর বহিছে সমীর, ভেসে যাব রঙ্গে।" ৩১

এই গানখানি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা। গানটি "মৃণালিনী" উপন্যাসে গিরিজায়ার মুখে বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন। গানের দ্বিতীয় লাইনটি এখানে সঠিকভাবে উদ্‌ধৃত হয়নি। "মৃণালিনী"তে দ্বিতীয় পঙক্তিটি আছে—"কে আছে কাণ্ডারী হেন কে যাইবে সঙ্গে।" গানখানি স্বামীজী তাঁর সঙ্গীত পুস্তকে সংকলিত করেছেন এবং সেখানে তার সুর ও তাল উল্লিখিত আছে—পিলু, কাশ্মীরী খেমটা।

লণ্ডনে আর এক দিনের বিবরণে স্বামীজীর গানের উল্লেখ আছে। তবে এ গানটির সাঙ্গীতিক মূল্য বিশেষ নেই এবং তাঁর এ যাবৎ যত গানের প্রসঙ্গ পাওয়া গেছে, তার সমগোত্রেরও নয়। এটি অত্যন্ত হাল্‌কা এবং কৌতুক রসের গান। সম্পূর্ণ গানও নয়, গানের একটি কলি মাত্র পাওয়া যায়। এই কলিটি কিন্তু স্বামীজীর নিজেরই রচনা। একটি হাসির কথা নিয়ে তিনি মুখে

মুখে দু' লাইন রচনা করেন এবং গেয়ে শোনান। গানের ভাষায় কিছু গ্রাম্যতা দোষ থাকলেও এখানে স্বামীজীর কৌতুকপ্রিয় মনের প্রকাশ দেখা যায়। তিনি বরাবরই সুরসিক ও রহস্যালাপী ছিলেন এবং কৌতুকের বিষয় পেলে তার সদ্ব্যবহার করতেন; অনেক সময় কৌতুক সৃষ্টি করতেন। তাঁর জীবনের নানা সময়ে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এরকম একটি তরল বিষয়ে সদ্য সদ্য গান রচনা করে গাইবার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত তাঁর জীবন-কথায় আর উল্লিখিত নেই। সেজন্যে এই বিবরণটি উদ্ধৃত করা হল :—

"...স্বামীজী বেশ প্রফুল্ল। সকালের বক্তৃতা আরম্ভ হইতে প্রায় ঘণ্টা খানেক সময় বাকি আছে। বেলা দশটা হইয়াছে, রাস্তায় অনেক লোকজন আনাগোনা করিতেছে। ডাইনিং ঘরের রাস্তার দিকের জানলার সমস্তটা একখানা বড় কাঁচ দিয়া ঢাকা ছিল। রাস্তার লোকজন সব দেখা যাইতেছে। সেই দিকে চাহিয়া স্বামীজী একটি কৌতুকপূর্ণ গান রচনা করিলেন :—

"ছাতি হাতে, টুপি মাথায় আসচে যত ছুঁড়ী,
মুখে মেখেছে তারা ময়দা ঝুড়ি ঝুড়ি।"

গানটি এমন বিদ্রূপের ও রহস্যের সহিত সুর করিলেন যে, বর্তমান লেখক হাসিতে হাসিতে দরজার সম্মুখে প্যাসেজে বাহির হইয়া আসিয়া, মুখে রুমাল দিয়া হাসিতে লাগিলেন। স্বামীজী সারদানন্দ স্বামীকে বলিলেন, "দ্যাখ্, মুখে মাগীরা পাউডার মেখেছে যেন কোদাল দিয়ে চাঁছা যায়।..." ৩২

লণ্ডনে থাকবার সময় স্বামীজী যে মাঝে মাঝেই আপনার মনে বাংলা গান গাইতেন, মহেন্দ্রনাথ দত্ত তা আরো একস্থানে উল্লেখ করেছেন। তবে এখানে নির্দিষ্ট গানের বিবরণ পাওয়া যায় না :—

"স্বামীজীর মনে আনন্দ হইলে এক একদিন গুণ্‌গুণ্ করিয়া বাংলা গান করিতেন। গুডউইন বাংলা কিছুই বুঝিতে পারিতেন না বা সুরও তাঁহার ভাল লাগিত না। একদিন প্রাতর্ভোজনের পর স্বামীজী উপরকার ঘরে গেলেন। ঘরে গুডউইন, সারদানন্দ স্বামী ও বর্তমান লেখক রহিলেন। কথা প্রসঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের কথা উঠিল, এবং ইউরোপ ও ভারতবর্ষের সঙ্গীতের বিষয় অল্পবিস্তর সারদানন্দের সহিত কথা হইতে লাগিল। ভারতবর্ষে বড় বড় গাইয়ে আছে এবং তাঁহাদের সঙ্গীতপ্রণালীও ভিন্নরকম।

সারদানন্দ স্বামী এইটা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কলিকাতায় যাঁহারা বিশিষ্ট ধ্রুপদগায়ক, স্বামীজী তাঁহাদের মধ্যেও একজন বিশিষ্ট গায়ক বলিয়া পরিচিত। গুডউইন কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলেন না। সারদানন্দ স্বামী সহজ করিয়া বুঝাইলেন যে, স্বামীজী একজন বড় গাইয়ে এবং গাইয়ে হিসাবে তাঁহার কলিকাতায় বেশ নাম আছে।"... ৩৩

পাশ্চাত্য জগতে ভারতবর্ষকে অভূতপূর্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে স্বামীজী চার বছর পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ১৮৯৭-এর প্রথম ভাগে। কলম্বোয় তিনি জাহাজে পৌঁছান ১৫ই জানুয়ারী। তারপর মাদ্রাজ অঞ্চলে দেশবাসীর কাছে তিনি কি অপূর্ব সমাদর ও অভিনন্দন লাভ করেন তার বিস্তৃত বিবরণ তাঁর জীবনী গ্রন্থাদিতে আছে।

বাংলাদেশে এসে তিনি প্রথম জাহাজ থেকে নামেন খিদিরপুরে। সেখান থেকে কলকাতায় বিভিন্ন রাজপথে যাবার সময়েও তিনি বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন্। শিয়ালদা স্টেশনে তাঁর জন্যে যে অভিনন্দন সভার অনুষ্ঠান হয় তার সম্বর্ধনা সঙ্গীতটি রচনা করেছিলেন নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং সেই গানে সুর দিয়েছিলেন অমৃতলাল ওরফে হাবু দত্ত।...

বিদেশে স্বামীজীর অভিনব কীর্তিস্থাপনের ফলে এদেশে কি অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল, সেসব বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নেই। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ প্রতিষ্ঠার উল্লেখ অবান্তর নয়। আমেরিকা থেকেই স্বামীজী যে অবিশ্রান্ত কর্মপ্রবাহে অবগাহন করেছিলেন, বাংলায় প্রত্যাগমনের পরেও তা অব্যাহত ছিল। স্বদেশে তিনি সেবাব্রত ও গঠনাত্মক কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। এবিষয়ে তাঁর দেশাত্মবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পাশ্চাত্যে লব্ধ অভিজ্ঞতা। সেখানকার মিশনারী ও অন্যান্য কর্মীদের দেশের জন্যে কর্মতৎপরতা ও নিয়মনিষ্ঠা তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন। এখন স্বদেশে আরম্ভ করলেন মিশন ও মঠ গঠনের কার্য।

ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, স্বামীজীর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় মঠ আলমবাজারের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ছিল। এই বছরের (১৮৯৭ খৃঃ) ১ মে তারিখে স্বামীজীর উদ্‌যোগে বলরাম বসুর বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্যদের সমবেত সভায় রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ সাধারণ সভাপতি, স্বামী ব্রহ্মানন্দ

কলিকাতা কেন্দ্রের সভাপতি এবং স্বামী যোগানন্দ সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। মঠ আলমবাজার থেকে বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের ফেরী ঘাটের কাছে বাড়ীতে স্থানান্তরিত করে মঠের নিজস্ব গৃহ নির্মাণ আরম্ভ হ'ল বেলুড়ে, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। সেই বছরেই ৯ ডিসেম্বর নতুন গৃহ উৎসর্গ করে মঠ হিসাবে ব্যবহার আরম্ভ হ'ল ২ জানুয়ারী ১৮৯৯। শ্রীরামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত এই সঙ্ঘের দুটি বিভাগ হ'ল। প্রথম, রামকৃষ্ণ মঠ এবং তার কর্মসূচী হল—সর্বজনীন ধর্মের সংরক্ষণ ও প্রচার। দ্বিতীয়, রামকৃষ্ণ মিশন এবং তার কর্মসূচী হল—লোককল্যাণকর কাজ, সেবাব্রত। [৩৪]

বেলুড় মঠ নির্মাণের আগে এবং অব্যবহিত পরে স্বামীজী ভারতের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেছিলেন। মঠের শাখা স্থাপন, তীর্থদর্শন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে সেই সময়কার ভ্রমণের বিবরণের মধ্যে তাঁর সঙ্গীতের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। তাঁর জীবনীবিষয়ে নানা পুস্তকে তাঁর এই সময়ের গানের বিষয়ে কিছু কিছু উল্লেখ আছে। তবে তাঁর সেই সব গানের বিবরণ নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। গানের বিস্তৃত বিবরণ তার মধ্যে না পাওয়া গেলেও সেসব কথা উল্লেখযোগ্য। সেইরকম কয়েকটি বিবরণ থেকে এখানে উদ্ধৃত করা হল। তা' থেকে আবার বোঝা যাবে যে, তিনি স্থান থেকে স্থানান্তরে ভ্রমণের মধ্যেও গানের সুযোগ বা পরিবেশ দেখা গেলে অবশ্যই গান করেছেন। জীবনের কোন সময়েই তিনি সঙ্গীতবর্জিত ছিলেন না।

সেই বছরে অর্থাৎ ১৮৯৭-এ, ৩১ অগস্ট তারিখে অমৃতসর থেকে রাওলপিণ্ডি আসেন এবং সেখান থেকে সেভিয়ার দম্পতির সঙ্গে মরি পাহাড়ে। মরিতে উপস্থিত হ'লে সেখানকার বাঙালী অধিবাসিরা তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন। স্বামীজী সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে তাঁদের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে শুধু ধর্মোপদেশ দান ও ধর্মালোচনা করলেন না। কয়েকটি গানও শোনালেন।

"তাহাদের গৃহে যাইয়া স্বামীজী অনেক ধর্মবিষয়ক গান গাহিলেন এবং তাহাদের অনেক উপদেশ দিলেন।" [৩৫]

তারপর ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখেও তাঁর শ্রীনগরে (কাশ্মীর) গান গাইবার কথা জানা যায়। কিন্তু সেখানে তাঁর সঙ্গীতপ্রসঙ্গে বিশেষ কথা কিছু না থাকায় তা' উদ্ধৃত করা হলনা।

সেবার উক্ত অঞ্চলের নানা স্থান পরিভ্রমণ করে তিনি বেলুড়ে ফিরে আসেন।

তারপর বেলুড় মঠে তাঁর অবস্থানের সময়ে তাঁর কয়েকদিন গান গাইবার কথা লিপিবদ্ধ আছে। এখানে তার মধ্যে একদিনের উল্লেখ করা হ'ল। সে দিনটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। কারণ, সেদিন ভগিনী নিবেদিতাকে তিনি দীক্ষা দিয়েছিলেন। সেই ২৫ মার্চ তারিখে (১৮৯৮ খৃঃ) অনেকক্ষণ ধরে স্বামীজী গান করেছিলেন এবং যতদূর মনে হয়, তা' ধ্রুপদ গান।

ভগিনী নিবেদিতার প্রামাণিক জীবনী থেকে তাঁর দীক্ষা গ্রহণের প্রাসঙ্গিক ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত করা হ'ল :—

"পূজা শেষে সকলে উপর তলায় গেলেন। সম্ভবত এই দিনটিকে বিশেষ-ভাবে স্মরণীয় করিবার জন্যই স্বামীজী যোগীশিবের বেশ ধারণ করিলেন। জটা, বিভূতি ও হাতের কুণ্ডল ধারণে তাঁহাকে মহাযোগী শিবের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। অতঃপর একঘণ্টা ধরিয়া তিনি ভারতীয় সঙ্গীত আলাপন করিলেন।"[৩৬]

এখানে এক ঘণ্টা ধরে ভারতীয় সঙ্গীত আলাপ করা বলতে রাগসঙ্গীতের কথাই মনে হয়—যে রাগসঙ্গীত তিনি প্রথম যৌবনে অতি নিষ্ঠার সঙ্গে চর্চা করেছিলেন এবং মনের মতন পরিবেশ পেলে সঙ্গীতের প্রেরণায় যে গান গাইতে তিনি সব চেয়ে ভালবাসতেন।......

সেই বছর (১৮৯৮) মে, জুন মাসে তিনি সদলবলে আলমোড়া, ভীমতাল প্রভৃতি হিমালয় অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন। এই যাত্রায়ও তাঁর গানের প্রসঙ্গ আছে।

এই সময়কার একটি দিনের বিবরণে জানা যায় যে তিনি ছ'বছর আগেকারে সেই পরিব্রাজক জীবনে খেতরী রাজসভায় নর্তকীর কণ্ঠে শোনা সুরদাসের হৃদয়গ্রাহী ভজনটি গেয়েছিলেন :—

"১২ই জুন রবিবার তাঁরা ভীমতালে পৌঁছান। একটি হ্রদ ও জলপ্রপাতের ওপর দিকে তাঁর বিশ্রামের স্থান নির্দিষ্ট হল। স্বামীজী এই নৈসর্গিক সৌন্দর্যের মধ্যে বসে 'অসতো মা সদ্গময়ো···' ইত্যাদি আবৃত্তি ও অনুবাদ করলেন। শেষে সুরদাসের 'প্রভু মেরো অবগুণ চিত না ধরো' গানটি গান। এই গান তিনি খেতরীর রাজার সভায় নর্তকীর নিকট শুনেছিলেন।"[৩৭]

ভগিনী নিবেদিতা তাঁর লিখিত স্বামীজীর স্মৃতিকথার গ্রন্থটিতে একাধিক দিনের গানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। এই সব গানের বিবরণ সম্ভবত ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের কথা। তার মধ্যে একটিতে স্বামীজীর তানসেন রচিত একটি গান গাইবার কথা জানা যায় :—

"Now it was that coronation song of Akbar, which is still sung about the streets of Delhi, that he would give us, in the very tone and rhythm of Thanasena" ৩৮

এখানে আমরা দেখছি স্বামীজী তানসেন-এরই সুরে ও তালে গান গাইছেন। পদ্ধতিগত সঙ্গীতশিল্পের সাধনায় সিদ্ধ না হলে এমনটি নিশ্চয়ই হতনা।

ভগিনী নিবেদিতা এই পুস্তকে স্বামীজীর বেলুড় মঠে প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক গানের কথা উল্লেখ করে বলেছেন ;—

"এই বছর আচার্যদেব ক্রমান্বয়ে চব্বিশ ঘণ্টাই কাজ করতেন। তিনি এত ব্যস্ত থাকতেন, যেন উন্মাদের মতন হয়ে যান। অতি প্রত্যুষে, আলো ফোটবার আগেই তিনি উঠতেন এবং 'জাগো জাগো অমৃতের অধিকারী' এই গানটি গেয়ে অন্য সকলকে জাগাতেন। তারপর সকলে বসতেন ধ্যান করতে এবং তার পরে প্রায় অজ্ঞাতসারেই আরম্ভ হয়ে যেত গান আর নানা প্রসঙ্গ, যা চলত প্রায় দুপুর পর্যন্ত। স্তব আর স্তোত্র থেকে এসে পড়ত ইতিহাসের প্রসঙ্গ।" ৩৯

এমনিভাবে দেখা যায় যে, স্বামীজীর প্রায় দেহান্তকাল পর্যন্ত যত দিনের বিবরণ তাঁর জীবনীগ্রন্থাদিতে আছে, তার মধ্যে তাঁর সঙ্গীতপ্রসঙ্গ বরাবরই বিদ্যমান। দেহত্যাগের কিছুদিন আগেও তাঁর গান গাইবার কথা জানা যায়। কখনো স্বেচ্ছায়, কখনো কোন উপলক্ষ্যে, কিংবা কখনো কারো অনুরোধে স্বামীজী প্রায় আজীবন গান করেছেন। তিনি যে গায়ক ছিলেন, এই পরিচয় কোন দিন তাঁর জীবনে অপ্রকাশিত থাকা অসম্ভব ছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিল তাঁর সঙ্গীত-কৃতি।

তাঁর চাঞ্চল্যমুখর সমগ্র কর্মজীবনের অন্তরালে অন্তঃসলিলা ধারায় প্রবহমান ছিল তাঁর সঙ্গীতসত্ত্বা।……

শোনা যায়, প্রায় শেষ পর্যন্ত তাঁর কণ্ঠ সতেজ ও স্বতঃস্ফূর্ত ছিল এবং তিনি প্রায়ই ভাবমগ্ন হয়ে গান গাইতেন। জীবনের অন্তপর্বে তিনি ধ্রুপদাঙ্গ ও ভজন গান অনেক সময় গেয়েছেন এবং বলা বাহুল্য, তানপুরা ও মৃদঙ্গের

সহযোগিতায়। কখনো কখনো অপরের গানের সঙ্গে পাখোয়াজও বাজাতেন। গানের সঙ্গে তাঁর এই মৃদঙ্গ বাদন তিনি ইহজীবনের শেষ পর্বেও করেছেন। শুধু গলায় আপন মনে তাঁর গান গাইবার উল্লেখও পাওয়া যায়।

স্বামীজীর "দেহত্যাগের পূর্বে কয়েকমাস" এর বিবরণ দেবার সময়ে তাঁর জনৈক জীবনী লেখক বলেছেন যে তিনি শেষ রাত্রে শয্যা ত্যাগ করবার পর ঠাকুরঘরে ধ্যানের জন্যে উপস্থিত হতেন এবং ধ্যানের শেষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে নীচে যেতেন। সেখানে পায়চারী করবার সময় "কখনও শ্যামাসঙ্গীত বা শিবসঙ্গীত বা অন্য কোন ধর্মবিষয়ক গান গাহিতেন।" [৪০]

এখানে তাঁর গানের সহযোগী যন্ত্র তানপুরার কথা উল্লেখ করা যায়।

স্বামীজী মঠজীবনে যে তানপুরায় সুরসংযোগ করে গাইতেন সেটি বেলুড় মঠে আছে। কিন্তু তা' ছাড়াও একটি তানপুরা ছিল তাঁর ছাত্রজীবনে। সম্ভবত সেই যন্ত্রটি সঙ্গীতশিক্ষার সময়ে তাঁর পিতা তাঁকে দিয়েছিলেন এবং তরুণ বয়সে, গানশিক্ষার পর্বে, সেইটিই ছিল তাঁর হাতের প্রথম যন্ত্র।

প্রথম সঙ্গীত-জীবনে সেই তানপুরাটি নিয়ে তিনি সঙ্গীতচর্চা করতেন (রামতনু বসু লেনের বাড়ীতে) এবং সন্ন্যাস নেবার আগে তা রামচন্দ্র দত্তকে দিয়ে যান। সেটি সম্ভবত কুঁাকুড়গাছি যোগোদ্যানে ছিল। [৪১]

বেলুড় মঠে, মন্দিরের পূর্বদিকে এবং গঙ্গার ধারে যে দোতলার ঘরখানিতে তিনি অবস্থান করতেন, সেখানেই তাঁর দেহত্যাগ হয়—১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই।

ঘরটি বর্তমানে তাঁর স্মৃতিস্বরূপ রক্ষিত। সেই ঘরে তাঁর ব্যবহৃত নানা জিনিষপত্রের মধ্যে দেখা যায়, দুটি তানপুরা এবং একটি পাখোয়াজ। এই তানপুরা দুটি এবং পাখোয়াজটি তাঁর হাতের যন্ত্র। জীবনের শেষ পর্বেও এই তানপুরা ও পাখোয়াজ তাঁর সঙ্গীতচর্চার মুখর সঙ্গী ছিল। এখন তারা নীরব!...

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

(১) শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী,
প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭৫—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।

(২) গিরিশচন্দ্র, পৃঃ ২৮৮-৯—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

(৩) শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী,
প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৮১-৮৩—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।
(৪) গিরিশচন্দ্র, পৃঃ ৩১০—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
(৫) শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী,
প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৮৪-৮৫—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।
(৬) শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী,
প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯০-৯১—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।
(৭) গুরুপ্রাণ রামচন্দ্রের অনুধ্যান, পৃঃ ৫২-৫৩
—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।
(৮) শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী,
প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৮—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।
(৯) শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী,
প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১২৩-২৪—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।
(১০) শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী,
প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২০-২১—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।
(১১) শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী,
প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৩-২৪—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।
(১২) শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী,
প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৬—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।
(১৩) অজাতশত্রু শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দের অনুধ্যান, পৃঃ ৪৬—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।
(১৪) স্বামী শিবানন্দের অনুধ্যান, পৃঃ ৯, ৪৮, ৫০— „ „
(১৫) শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীর জীবনের ঘটনাবলী,
পৃঃ ২৮—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।
(১৬) „ „ „ „ „ পৃঃ ২৯— „ „
(১৭) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩৮২—শ্রীম।
(১৮) „ „ দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৩৯৬-৪০০—শ্রীম।
(১৯) শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীর জীবনের ঘটনাবলী,
পৃঃ ৮৬-৮৯—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।
(২০) শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী,
প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬৫—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।

(২১) শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী,
প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৫০-৫২—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।
(২২) শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী,
প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১২৫-১২৭—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।
(২৩) শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী,
প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪১-৪৩—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।
(২৪) শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী,
প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫৫-৫৭—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।
(২৫) শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী,
দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৪৬—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।
(২৬) স্বামী বিবেকানন্দ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৭৬—প্রমথনাথ বসু।
(২৭) Swami Vivekananda & the Universal Gospel
4th impression, page 24—by Romain Rolland.
(২৮) শ্রীবিবেকানন্দ কাব্যগীতি, পৃঃ ২০৯—স্বামী শ্যামানন্দ।
(২৯) শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী,
দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৯৩—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।
(৩০) শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী,
দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২০৩—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।
(৩১) লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৬—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।
(৩২) " " " " পৃঃ ৯১— " "
(৩৩) " " " " পৃঃ ২০০— " "
(৩৪) Swami Vivekananda & the Universal Gospel,
pages 120-23—Romain Rolland.
(৩৫) ভারতে বিবেকানন্দ, পৃঃ ২৯১—উদ্বোধন কার্যালয়।
(৩৬) ভগিনী নিবেদিতা, পৃঃ ৭৬—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা।
(৩৭) " " পৃঃ ১০১— " "
(৩৮) The Master As I Saw Him, page 67—Sister Nivedita
(৩৯) ,, ,, ,, ,, ,, ,, page 88— ,, ,,
(৪০) স্বামী বিবেকানন্দ, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১০৭৮—প্রমথনাথ বসু।
(৪১) Swami Vivekananda—Patriot-prophet, Appendix,
Page 419—by Dr. B. N. Datta.

গীত রচনা

বর্তমান গ্রন্থের 'নিবেদনে' উল্লেখ করা হয়েছিল যে, স্বামীজীর সঙ্গীত প্রতিভা সর্বমুখী ছিল এবং তিনি কয়েকটি উচ্চশ্রেণীর গানও রচনা করেছিলেন। বাংলা ও সংস্কৃত দুই ভাষাতে রচিত তাঁর গান আছে। তাঁর গীতাবলী "বীরবাণী" পুস্তকে সংকলিত হয়েছে এবং বাংলা গানগুলির স্বরলিপি আছে বেলুড় মঠ প্রকাশিত "সাধন সঙ্গীত" গ্রন্থে। স্বামীজীর বাংলা গানগুলি এই অধ্যায়ের শেষে "বীর বাণী" থেকে উদ্‌ধৃত করা হবে।

স্বামীজীর রচিত বাংলা গান অবশ্য সংখ্যায় বেশি নয়—মাত্র ছ' খানি। কিন্তু গানের পরিমাণের চেয়ে বড় কথা হল তার উৎকর্ষতা। গান ক'খানি যে তিনি আদৌ রচনা করতে পেরেছিলেন, তা-ও এক আশ্চর্যের বিষয়। কারণ গান রচনা করবার উপযুক্ত অবকাশ ও পরিবেশ তিনি প্রায় কখনোই পান নি।

তাঁর জীবনকালকে মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। গৃহী জীবন ও সন্ন্যাস জীবন। তাঁর গৃহী জীবনে (বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত) সাধারণ গৃহস্থের মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য তিনি কোনদিন ভোগ করেন নি। বিচিত্র ঘাত প্রতিঘাত ও দ্বন্দ্বে উদ্বেল ছিল তাঁর সন্ন্যাস-পূর্ব জীবন। আর জীবনের দ্বিতীয় ভাগে—প্রথম পর্বে চূড়ান্ত বৈরাগ্য ও দ্বিতীয় পর্বে নিরলস কর্মপ্রবাহ। জীবনের দুই ভাগই গান রচনার পক্ষে অনুকূল ছিলনা। তবু তারই মধ্যে যে কয়েকটি গান রচনা করেছিলেন, তা তাঁর অসাধারণ সঙ্গীত প্রীতির ফল। সঙ্গীতের যথার্থ প্রেরণা না থাকলে তাঁর গান রচনা সম্ভব হ'ত না।

স্বামীজীর রচিত গানের সংখ্যাল্পতা সেজন্যে বড় কথা নয়। লক্ষ্যণীয় হল, গানের গুণাবলী : তার ভাব, ভাষা ও গঠনের সৌকর্য। গাইবার পক্ষে তাঁর গানগুলির উপযোগিতা। তা' ছাড়া প্রয়োজনীয় অবসর ইত্যাদির কথাও বিবেচ্য। তাঁর গায়ক-জীবন সম্পর্কে যে-কথা প্রযোজ্য, গান-রচয়িতা রূপেও তাঁর বিষয়ে সেকথা বলা যায়। অর্থাৎ তিনি যদি উপযুক্ত অবকাশ ও পরিবেশ পেতেন, তাহলে গান-রচয়িতা রূপেও আপন প্রতিভার দান উপযুক্ত পরিমাণে রেখে যেতেন।

তাঁর গানগুলি সত্যই উচ্চাঙ্গের এবং তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত গানের ভাব ও ভাষা শুধু যে মহৎ ভাবে পূর্ণ তা নয়—সুযোগ্য সুর ও তালে সুগঠিত। তাঁর গান তাঁর কবিত্বশক্তি ও সঙ্গীত-কৃতির সুবর্ণ ফল।

এই গান ক'খানি স্বামীজীর রাগসঙ্গীতে অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। গানে সুর সংযোজনা করেছিলেন তিনি স্বয়ং এবং তালও তিনি নির্দেশ করে দেন। তা' ছাড়া, এই স্বরচিত গান তিনিই প্রথম গেয়েছিলেন রচনা করবার পর। তাঁর গান ভাবে, ভাষায়. সুরে ও তালে সুসমঞ্জস সৃষ্টি।......

স্বামীজীর সব গান ক'খানির রচনাকাল সঠিক ভাবে জানা যায়নি। তার মধ্যে তিনটি রচনার সময় মোটামুটি পাওয়া যায়, দু'খানি গ্রন্থের উল্লেখ থেকে। এই গান তিনটি হ'ল :—"নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর", "তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা" ও "খণ্ডন ভব-বন্ধন, জগ বন্দন, বন্দি তোমায়।" বরানগর মঠের প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ আনুমানিক ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে প্রথম ও দ্বিতীয় গান দু'টি রচিত হয়। তৃতীয়টি স্বামীজী রচনা করেছিলেন বেলুড় মঠ নির্মিত হবার সম্ভবত কিছু পরে, কিংবা তার অব্যবহিত পূর্বে। এই গান তিনি রচনা করেন শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি মন্দিরে ভজন গান-রূপে গীত হবার উদ্দেশ্যে। সেজন্যে বেলুড় মঠের নির্মাণ কার্য শেষ হবার পরেই এই গানখানি রচিত হবার সম্ভাবনা বেশি মনে হয়। অর্থাৎ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারী মাস এই গানটির সম্ভাব্য রচনাকাল। এই গানখানির বিষয়ে আরো কিছু তথ্য পরে দেওয়া হবে।

স্বামীজী, তাঁর অন্যান্য গানের মতন, এই গানটি রচনা করে স্বয়ং প্রথমে গেয়েছিলেন এবং বলা বাহুল্য, গানের সুর ও তাল তাঁরই সংযোজিত। তাঁর এই গানটি গাইবার প্রসঙ্গ এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা কর্তব্য। কারণ তার মধ্যে একটি স্মরণীয় সংবাদ আছে। তা' হ'ল, বেলুড় মঠের ঠাকুর ঘরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে গান করেছিলেন স্বয়ং পাখোয়াজ বাজিয়ে। গানটি ধ্রুপদাঙ্গের এবং চৌতালে গঠিত। ধ্রুপদ গান গাইবার সময়ে গায়কের পক্ষে একযোগে মৃদঙ্গে সঙ্গত করা অতি কঠিন। একাধারে গান ও পাখোয়াজের সাধনায় দুর্লভ সিদ্ধি লাভের অধিকারী প্রতিভাধর ভিন্ন তা সম্ভব নয়। এবং এবিষয়ে বেশি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। একমাত্র স্বনামধন্য যদুভট্ট সম্পর্কে একথা শোনা যায়। সঙ্গীত জগতে বাংলার গৌরব যদুভট্ট আপনার গানের সঙ্গে আপনি মৃদঙ্গে সঙ্গত করতে পারতেন। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত—স্বামীজী। তাঁর স্বরচিত "খণ্ডন ভব বন্ধন" গানটি স্বয়ং পাখোয়াজ বাজিয়ে গাইবার সময়ে স্বামী শিবানন্দ উপস্থিত ছিলেন এবং স্বামী শিবানন্দ কথিত এই বিবরণ নির্ভরযোগ্য সূত্রে লেখক জ্ঞাত হয়েছেন।

তাঁর কয়েকটি গানে তাঁর সন্ন্যাস জীবনের বিশিষ্ট মানসিকতা প্রকাশিত হয়েছে এবং তাই স্বাভাবিক। তাঁর রচিত গান তাঁর তৎকালীন অন্তর জীবনের ভাবরূপ। তাঁর দু'টি ধ্রুপদাঙ্গের প্রসিদ্ধ গান—"একরূপ অরূপ নাম বরণ, অতীত আগামী কালহীন" (খাম্বাজ, চৌতাল) এবং "নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর" (বাগেশ্রী, আড়া) অদ্বৈত বেদান্ত সাধনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। তার-মধ্যে শেষোক্তটি গান হিসাবেও অতি উৎকৃষ্ট এবং স্বামীজীর গীতরচনাশক্তির সম্ভবত শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই গানখানির রচনা প্রসঙ্গ পরে আবার উল্লেখ করা হবে।

তাঁর রচিত গানের সঙ্গে আচার্য রামমোহন রায়ের গীতাবলীর তুলনা করে জনৈক গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন, "স্বামী বিবেকানন্দও রামমোহনের মত কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। রামমোহন ও বিবেকানন্দের ব্রহ্ম-সঙ্গীতগুলির মধ্যে সাদৃশ্য এই যে, ইঁহাদের উভয়ের রচিত সঙ্গীতগুলিই অদ্বৈতবেদান্তানুযায়ী সাধনার পক্ষে বিশেষরূপ সাহায্য করে।" ১

সাধারণভাবে মন্তব্যটি সত্য। রামমোহনের সমস্ত গীতাবলীকে ব্রহ্মসঙ্গীত আখ্যা দেওয়া যায়। তবে, স্বামীজীর ক্ষেত্রে তার মধ্যে একটু বিশেষ আছে। মনে হয়, কোন কোন গান তিনি সঙ্গীতের প্রেরণাবশে রচনা করেছিলেন। যেমন তাঁর "মুঝে বারি বনোয়ারী সেঁইয়া, যানেকো দে" (মুলতান, ঢিমা ত্রিতালী)। এই উৎকৃষ্ট গানখানি যেন কোন হিন্দুস্থানী ওস্তাদ বা সঙ্গীত-ব্যবসায়ীর রচনা বলে বোধ হয়। গানটি এত সুমিষ্ট ও মাধুর্যমণ্ডিত যে মনে হয় এই গান রচনার উৎসমূলে ছিল সঙ্গীতের প্রেরণা। সন্ন্যাসীর সাধনভাবের চেয়ে যেন সত্যকার সঙ্গীতশিল্পীর পরিচয় এখানে অধিকতর প্রকাশমান।...

তাঁর "নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ শশাঙ্ক সুন্দর" গানটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ গানখানির ভাব অদ্বৈতবেদান্ত অনুসারী হলেও সুর তালে সুগঠিত গান-রূপে এমন রসসৃষ্টির পরিচায়ক যে, মনে হয়, এ গান রচনার অন্যতম প্রেরণা দিয়েছিল স্বামীজীর সঙ্গীত-সত্তা। (এই গানটির সম্পর্কে একটি বিবরণ কিছু পরেই উদ্ধৃত হবে এবং তা থেকেও এ বিষয়ে খানিকটা ধারণা করা যাবে) এবং স্বামীজীর তুল্য গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞের পক্ষে তা-ই স্বাভাবিক।

বলা বাহুল্য হলেও একটি কথা বলে নেওয়া উচিত। গানের ভাষা পাঠ করে গানের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না এবং তার সাঙ্গীতিক

মূল্যও নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কারণ, গান কবিতা নয়। কণ্ঠে গীত ও কর্ণে শ্রুত না হলে সে সঙ্গীতের সত্যকার উপলব্ধি হয় না। সেই দিক থেকে বলা যায় যে, স্বামীজীর গান যথাযথ ভাবে গীত হলে তার পূর্ণ সৌন্দর্যের আস্বাদ সম্ভব। সে উপায়ও অবশ্য আছে। "সাধন সঙ্গীত" পুস্তকে তাঁর বাংলা গানের স্বরলিপি পাওয়া যায়। তাঁর রচিত শ্রীরামকৃষ্ণের আরত্রিক সঙ্গীতটিও নিয়মিতভাবে গীত হয়ে থাকে বেলুড় মঠে। আর তাঁর একটি গান গাইবার যে নির্ভরযোগ্য বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে (এবং যা পরে উদ্‌ধৃত করা হবে) তা থেকে বোঝা যায় যে, সেটি গান হিসাবে কি সার্থক সৃষ্টি হয়েছিল!

স্বামীজীর গান উদ্‌ধৃত করবার আগে, সমসাময়িক দু'টি বিবৃতি এখানে দেওয়া হবে। তাঁর গান রচনা সম্পর্কে এই বিবরণ দু'টি প্রামাণিক এবং নির্ভরযোগ্য। এর মধ্যে শেষেরটি থেকে ধারণা করা যায় যে তাঁর গানের সাঙ্গীতিক মান কত উচ্চ ছিল।

প্রথম প্রসঙ্গটিতে পাওয়া যায় তাঁর রচিত "তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা" গানটির কথা। এই গানখানি স্বামীজী সম্ভবত ১৮৮৭-এর প্রথম দিকে, অর্থাৎ বরানগর মঠের প্রথম যুগে রচনা করেছিলেন এবং গানটি মঠের সকলের বিশেষ প্রিয় হয়েছিল। এই সদ্য রচিত গানখানি তারক মহারাজের (স্বামী শিবানন্দ) গাইবার কথা এই বিবরণ থেকে পাওয়া যায় :—

"বরানগরের মঠ সবে চার পাঁচ মাস স্থাপিত হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্যধামে বেশিদিন যান নাই।

"শ্রীযুক্ত তারক আনন্দে শিবের গান ধরিলেন—'তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা।'…

এই গান নরেন্দ্র সবে বাঁধিয়াছেন—

তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা,
ববম্ বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে
দুলিছে কপাল মাল।
গরজে গঙ্গা জটা মাঝে, উগরে অনল ত্রিশূল রাজে,
ধক ধক ধক মৌলিবন্ধ,
জলে শশাঙ্ক ভাল।"[২]

দ্বিতীয় বিবরণটি হল স্বামীজীর রচিত "নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর" গানখানির প্রসঙ্গে। এটিও খুব সম্ভব বরানগর মঠের প্রথম দিকের কথা। এই উদ্ধৃতি থেকে গানটি স্বামীজীর স্বয়ং গাইবার এবং তা' শুনে নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণের কি ধারণা হয়েছিল সেসব কথা চমৎকার জানা যায় :—

"নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ শশাঙ্ক সুন্দর
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর ॥
অস্ফুট মন-আকাশে, জগৎ সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং-স্রোতে নিরন্তর ॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি' এই-ধারা অনুক্ষণ ॥
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
অবাঙ্‌মনসোগোচরম্, বোঝে—প্রাণ বোঝে যার ॥

এই গানটি স্বামীজী এই সময় রচনা করেন। গ্রীষ্মকাল, প্রাতে গিরিশ-বাবুর বাটীতে স্বামীজী গিয়াছিলেন এবং উপরকার ছাতের গরাদের কাছে বসিয়া গুন্‌গুন্ করিয়া গানটি গাহিতেছেন। অতুলবাবু (গিরিশবাবুর ভাই) জিজ্ঞাসা কল্লেন, "হ্যাঁ হে, এ গানটা নূতন দেখছি যে, কার বাঁধা? মেজদাদার (গিরিশবাবুর) বাঁধা নয় ত?" নরেন্দ্রনাথ কোন কথা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। অতুলবাবু বলিলেন, "ওহে, ভাল করে একবার গাও না।" শুনিয়া মোহিত হইয়া অতুলবাবু বলিলেন, "এই গানটা যে বাঁধতে পারে, সে একটা বড় লোক—এই একটা গানের জন্যে সে জগতে বিখ্যাত হ'য়ে থাকবে।" নরেন্দ্রনাথ মুচ্‌কে মুচকে্ হাসতে লাগলেন এবং কিছুই বললেন না! অতুলবাবুর গানটা এত ভাল লাগিয়াছিল যে, তিনি সকলকেই কাহার রচিত গান জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে শরৎ মহারাজ ইহা নরেন্দ্রনাথের রচিত বলিয়া দিলেন। অতুলবাবু নরেন্দ্রনাথের তীব্র মেধা-শক্তিতে আগেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন কিন্তু এই গানটিতে নরেন্দ্রনাথের যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য আছে ও উপলব্ধি হইয়াছে, ইহা তাঁহার ধারণা হইল।" ৩

এই সব প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায় যে, স্বামীজীর রচিত গান শ্রোতাদের কতখানি হৃদয়গ্রাহী হ'ত এবং তাঁদের মনের ওপর কি প্রভাব বিস্তার করত।

এবারে স্বামীজী রচিত অবশিষ্ট বাংলা গান ক'টি দেওয়া হল। তাঁর "তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা" (কর্ণাটি—একতালা) এবং "নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ শশাঙ্ক সুন্দর" (বাগেশ্রী—আড়া) আগেই সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হয়েছে। সেজন্যে অবশিষ্ট চারখানি গান এখানে উদ্ধৃত করা হল :—

(১)

খাম্বাজ—চৌতাল

একরূপ, অরূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামী-কাল-হীন,
দেশহীন, সর্বহীন, 'নেতি নেতি' বিরাম যথায় ॥
সেথা হতে বহে কারণ-ধারা ধরিয়ে বাসনা বেশ উজলা,
গরজি গরজি উঠে তার বারি, অহমহমিতি সর্বমিতি সর্বক্ষণ ॥
সে অপার ইচ্ছা-সাগর মাঝে, অযুত অনন্ত তরঙ্গরাজে
কতই রূপ, কতই শকতি, কত গতি স্থিতি কে করে গণন ॥
কোটি চন্দ্র কোটি তপন লভিয়ে সেই সাগরে জনম,
মহা ঘোর রোলে ছাইল গগন, করি দশদিক জ্যোতিঃ মগন ॥
তাহে বসে কত জড় জীব প্রাণী, সুখ দুঃখ জরা জনম মরণ,
সেই সূর্য তারি কিরণ, যেই সূর্য সেই কিরণ ॥

(২)

মূলতান—ঢিমা ত্রিতালী

মুঝে বারি বনোয়ারী সৈঁইয়া
যানেকো দে।
যানেকো দে রে সৈঁইয়া
যানেকো দে (আজু ভালা) ॥
মেরা বনোয়ারী, বাঁদি তুহারি
ছোড়ে চতুরাই সৈঁইয়া
যানেকো দে (আজু ভালা)
(মোরে সৈঁইয়া)
যমুনাকি নীরে, ভরেঁা গাগরিয়া
জোরে কহত সৈঁইয়া
যানেকো দে ॥

(৩)

কর্ণাটি—সুর ফাঁকতাল

হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি।
যোগেশ্বর মহাদেব শিব পিনাক পাণি॥
ঊর্ধ্ব জ্বলন্ত জটাজাল,
নাচত ব্যোমকেশ ভাল,
সপ্ত ভুবন ধরত তাল, টলমল অবনী॥

(৪)

মিশ্র—চৌতালি

খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নররূপধর, নির্গুণ, গুণময়॥
মোচন-অঘদূষণ, জগভূষণ, চিদ্‌ঘনকায়।
জ্ঞানাঞ্জন-বিমল-নয়ন বীক্ষণে মোহ যায়॥
ভাস্বর ভাব-সাগর চির-উন্মদ প্রেম-পাথার।
ভক্তার্জন-যুগলচরণ, তারণ-ভব-পার॥
জৃম্ভিত-যুগ-ঈশ্বর, জগদীশ্বর, যোগসহায়।
নিরোধন, সমাহিত মন, নিরখি তব কৃপায়॥
ভঞ্জন-দুঃখ গঞ্জন, করুণাঘন, কর্মকঠোর।
প্রাণার্পণ-জগত-তারণ, কৃন্তন-কলিডোর।
বঞ্চন-কামকাঞ্চন, অতিনিন্দিত-ইন্দ্রিয় রাগ।
ত্যাগীশ্বর, হে নরবর, দেহ পদে অনুরাগ।
নির্ভয়, গতসংশয়, দৃঢ়নিশ্চয়মানসবান।
নিষ্কারণ-ভকত-শরণ, ত্যাজি জাতিকুলমান।
সম্পদ তব শ্রীপদ, ভব-গোষ্পদ-বারি যথায়।
প্রেমার্পণ, সমদরশন, জগজন-দুঃখ যায়॥

(উক্ত গানখানি বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-আরত্রিক রূপে প্রতি সন্ধ্যায় গীত হয়ে থাকে। গানটির বিষয়ে আর একটি জ্ঞাতব্য তথ্য হ'ল যে, এটি স্বামীজী কর্তৃক তাঁরই একটি গানের পরিবর্তিত রূপ।)

পূর্বে এই গানটি নিম্নলিখিত ভাবে রচিত হইয়াছিল ; কিন্তু সুরের বিভিন্নতার জন্য সাধারণ গায়কের পক্ষে গীতটি কঠিন হইয়া উঠে। সেইজন্য স্বামীজী পরে উহার পূর্বোক্তরূপ পরিবর্তন করেন।

খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন, বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নররূপধর নির্গুণ গুণময় ॥
নমো নমো প্রভু বাক্য-মনাতীত
মনোবচনৈকাধার,
জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর
তুমি তমভঞ্জনহার।
ধে ধে ধে, লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ, বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ,
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ, আরতি তোমার ॥ [৪]

গ্রন্থপঞ্জী

(১) স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলায় ঊনবিংশ শতাব্দী,
প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ৩৩৪—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী।

(২) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, চতুর্থভাগ, পৃঃ ৩৭৮—শ্রীম।

(৩) শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী,
প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৮৬-৮৭—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।

(৪) বীরবাণী, পৃঃ ২৬—স্বামী বিবেকানন্দ।

সঙ্গীত সম্পর্কে মতামত

এ পর্যন্ত স্বামীজীকে সঙ্গীতজ্ঞের নানা ভূমিকায় দেখা গেল। সঙ্গীত জীবনে অবশ্য প্রধানত তিনি ছিলেন গায়ক। কিন্তু পাখোয়াজ, তবলা ও খোল বাদক এবং গান-রচয়িতা, সুর-সংযোজক, সঙ্গীতশিক্ষক ইত্যাদি নানারূপে তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভা প্রকাশিত হয়েছিল। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে তাঁর সঙ্গীতকৃতির এমনি নানা পরিচয় এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

কিন্তু তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভার আর একটি বিশিষ্ট অবদান এখনো অপ্রকাশিত আছে। সঙ্গীতরূপে এটি তাঁর আর এক মহৎ পরিচয়। তিনি ছিলেন সঙ্গীত তত্ত্বের একজন সুপণ্ডিত ব্যাখ্যাকার। তাঁর সঙ্গীতজীবনের এই দিকটির কথা সাধারণ্যে প্রায় অজ্ঞাত।

সঙ্গীতের তত্ত্ববিষয়ে তাঁর কি বহুদর্শিতা ছিল এবং সে বিষয়ে তিনি কতখানি চিন্তা করেছিলেন, সেকথা এ যাবৎ সুবিদিত ছিল না। তিনি যে গায়ক ছিলেন, তাঁর সঙ্গীতজীবন সম্পর্কে শুধু এই ধারণাই প্রচলিত ছিল। তার কারণ, সঙ্গীতের তত্ত্ব বিষয়ে তিনি যে সুদীর্ঘ আলোচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিলেন, তা' ছিল বিস্মৃতির অতলে।

স্বামীজীর সঙ্গীতচিন্তার প্রকৃষ্ট পরিচয় সেই রচনায় আছে এবং এই গ্রন্থের শেষাংশে তার অনুলিপি পাওয়া যাবে। সঙ্গীতের ঔপপত্তিক বিষয়ে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং চিন্তাশক্তির নিদর্শন সেই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি সম্পর্কে বর্তমান অধ্যায়ে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন নেই। সেটি পাঠ করলেই স্বামীজীর সঙ্গীতচিন্তার সঙ্গে পাঠক পাঠিকারা পরিচিত হবেন।

সেই প্রবন্ধটি ছাড়াও স্বামীজী সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর মতামত নানা সময়ে এবং নানা স্থানে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর সেই সব সঙ্গীতপ্রসঙ্গ তাঁর রচনাবলীর নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে আছে। বর্তমান অধ্যায়ে সঙ্গীতবিষয়ে তাঁর সেই সব মন্তব্য চয়ন করা হবে।

তাঁর সেই মতামতগুলি নানা সময়ে এবং নানা অবস্থায় প্রকাশিত হওয়ায় তার মধ্যে কোন যোগসূত্র বা ধারাবাহিকতা পাওয়া যাবেনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিচ্ছিন্ন মন্তব্যগুলিতে তাঁর সঙ্গীতচিন্তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁর সাঙ্গীতিক মেজাজ, সঙ্গীতের আদর্শ বিষয়ে তাঁর ধারণা, সঙ্গীত

ও সঙ্গীতজ্ঞদের সম্বন্ধে তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাব ইত্যাদি জানা যাবে এই সব উদ্ধৃতি থেকে।

আংশিকভাবে হলেও এই মতামতগুলি থেকে তাঁর সঙ্গীতের আদর্শ বিষয়ে বাখ্যাতারূপে এক অভিনব পরিচয় লাভ করা যায়। সেজন্যে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থাবলী. চিঠিপত্র এবং পরিব্রাজক জীবনের কথা থেকে সঙ্গীত প্রসঙ্গে কথিত এই সব মন্তব্য সংকলিত হ'ল। সঙ্গীতের ঔপপত্তিক বিষয়ে স্বামীজীর রচনাটির ভূমিকাস্বরূপ বর্তমান অধ্যায়টিকে এবং এখানে উল্লিখিত তাঁর মন্তব্যগুলিকে গণ্য করা যায়।

স্বামীজী সঙ্গীতে বা গানে ভাবের ওপর সমধিক গুরুত্ব দিতেন। গানের ভাব সুরবিহারের মাধ্যমে স্বচ্ছন্দে ও সুন্দরভাবে প্রকাশিত হবে, তবেই গানের সার্থকতা। এই ছিল তাঁর মত। গান সহজ ও সরল হবে, এবং তা শ্রোতাদের মন স্পর্শ করবে, এও তিনি চাইতেন। গানের মধ্যে যদি প্রাণ না থাকে, তা হলে সে সঙ্গীতের কোন আবেদন থাকতে পারে না এবং তা' অসার্থকও। স্বয়ং কলাবতের অধীনে শিক্ষালাভ করলেও ভাব-লেশহীন কালোয়াতীর প্রতি তাঁর কোন শ্রদ্ধা ছিল না— তা নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি থেকে বেশ বোঝা যায়। একথা পরিষ্কারভাবে এক জায়গায় স্বামীজী বলেছেন :—

"গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে— তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ঋষিও বুঝতে পারেন না। আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধুম? সে কি আঁকা বাঁকা ডামাডোল, বত্রিশ নাড়ীর টান তায় রে বাপ। তার ওপর মুসলমান ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে নাকের মধ্যে দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব। এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন, প্রাণহীন, সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনও কাজের কথা নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে।"... [১]

সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর ধারণা যে কতখানি শ্রদ্ধাপূর্ণ ছিল, কলারূপে

সঙ্গীতকে তিনি যে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিতেন তা' এক আমেরিকান মহিলাকে লিখিত (এখানে অনূদিত) এই পত্রাংশ থেকে বোঝা যায় :—

"সঙ্গীত সর্বশ্রেষ্ঠ ললিতকলা, এবং যাঁরা তা' বোঝেন, তাঁদের নিকট উহা সর্বোচ্চ উপাসনা।" ২

সঙ্গীতবিষয়ে স্বামীজীর রচনার প্রথম উদ্‌ধৃতিটি তাঁর পরিণত বয়সের সুচিন্তিত অভিমত। কিন্তু উক্ত মত যে তার আরো অনেক পূর্বে, ছাত্র-জীবনেই গড়ে উঠেছিল, তা' তাঁর একটি প্রামাণিক জীবনী থেকে জানা যায় :—

"One day he heard a friend singing like a professional and said, "Mere tune and time keeping are not all of music. It must express an idea. Can any one appreciate a song in a drawling manner ? The idea underlying the song must arouse the feeling of the singer, the words should be articulated distinctly and proper attention be given to tune and timing. The song that does not awaken a corresponding idea in the mind of the singer is not music at all." ৩

এটি তাঁর ছাত্রজীবনের কথা, যখন তিনি নিজেও রীতিমত সঙ্গীতচর্চা করতেন। তাঁর এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, সেই অল্প বয়সেই সঙ্গীতের আর্ট সম্পর্কে তাঁর কি সুষ্ঠু জ্ঞান ছিল। গানের সার্থকতা কোথায় সে বিষয়ে এমন সুন্দর ও স্বচ্ছ ধারণা ছিল বলেই তিনি নিজে সঙ্গীতে রসসৃষ্টি করতে সক্ষম হতেন।

উত্তরকালে একটি বক্তৃতায় স্বামীজী ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিন্তু পাণ্ডিত্যপূর্ণ উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস বিষয়ে তিনি যে কত গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন, এখানে তার নিদর্শন পাওয়া যায়।

স্বামীজীর ইতিহাসে প্রগাঢ় জ্ঞানের কথা সুবিদিত। তাঁর "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" প্রভৃতি রচনাবলী এবং মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত স্বামীজীর বিষয়ে পুস্তকাদি থেকে সেকথা জানা যায়। ইতিহাস আলোচনা করবার সময় তিনি বিদগ্ধ ঐতিহাসিকের তুল্য নিরপেক্ষ দৃষ্টির পরিচয় দিতেন। টি্রপ্লিকেন্ সাহিত্য সমিতির সভায় প্রদত্ত এই বক্তৃতাটি থেকেও স্বামীজীর ইতিহাস

জ্ঞানের পরিচয় লাভ করা যায়। সেই বক্তৃতা থেকে সঙ্গীত-সম্পর্কিত অংশ বিশেষ এখানে উদ্‌ধৃত করা হ'ল। মধ্যযুগে মুসলমান আক্রমণের পূর্বে হিন্দু-জাতির নানা অবনতির দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে স্বামীজী বলেন,—

"সঙ্গীতে, প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীতে আর হৃদয়গ্রাহী গভীর ভাব রহিল না, পূর্বে যেরূপ প্রত্যেক সুর স্বতন্ত্রভাবে আপন পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিত, অথচ অপূর্ব ঐক্যতানের সৃষ্টি করিত, তাহা আর রহিল না, সব সুরগুলি যেন নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য হারাইল। আমাদের সঙ্গীত নানাবিধ সুরের তালখিচুড়ি স্বরূপ দাঁড়াইয়াছে; ইহাই সঙ্গীতশাস্ত্রের অবনতির চিহ্নস্বরূপ।" [৪]

স্বামীজীর নকৃসা জাতীয় কয়েকটি ছোট ছোট রচনা আছে। লেখাগুলি হাস্য, কৌতুক ও বিদ্রূপে পূর্ণ। এই ক'টি রচনায় তাঁর নানাবিষয়ে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। স্বামীজীর সাহিত্যকর্মের মধ্যে এই চুট্‌কি জাতীয় হাল্‌কা রচনা তাঁর রহস্য-কৌতুকপ্রিয় মনের নিদর্শন রূপে বিদ্যমান। তার মধ্যে একটিতে পাওয়া যায় সঙ্গীত প্রসঙ্গ। এখানে সঙ্গীত বিষয়ে তিনি আপনার সুচিন্তিত মতামত কৌতুকচ্ছলে ব্যক্ত করেছেন।

এই লেখাটিও বিদ্রূপাত্মক। কিন্তু তার মধ্যে থেকে সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর একটি বিশেষ মনোভাব সুপ্রকাশিত হয়েছে। তা' হল—যথার্থ সুরেলা না হ'লে গান শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারে না এবং সুরের অভাবে সঙ্গীত চীৎকারেরই নামান্তর ও হাস্যকর।—

"ঠাকুর দর্শনে এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত। দর্শনলাভে তাহার যথেষ্ট প্রীতি ও ভক্তির উদয় হইল। তখন সে—বুঝি আদান-প্রদান-সামঞ্জস্য করিবার জন্য—গীত আরম্ভ করিল। দালানের এক কোণে থাম হেলান দিয়া চোবেজী ঝিমাইতেছিলেন। চোবেজী মন্দিরের পূজারী, পাহলওয়ান, সেতারী—দুই লোটা ভাঙ্‌ দু'বেলা উদরস্থ করিতে বিশেষ পটু এবং অন্যান্য আরও অনেক সদ্‌গুণশালী। সহসা একটা বিকট নিনাদ চোবেজীর কর্ণপটহ প্রবলবেগে ভেদ করিতে উদ্যত হওয়ায়, সম্বিদাসমুৎপন্ন বিচিত্র জগৎ ক্ষণকালের জন্য চোবেজীর বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বিশাল বক্ষস্থলে 'উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে'—হইল। তরুণ-অরুণ-কিরণ-বর্ণ ঢুলু ঢুলু দুটি নয়ন ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করিয়া, মনশ্চাঞ্চল্যের কারণানুসন্ধানী চোবেজী আবিষ্কার করিলেন যে, এক ব্যক্তি ঠাকুরজীর সামনে আপনভাবে আপনি বিভোর হইয়া, কর্মবাড়ীর

কড়ামাজার ন্যায় মর্মস্পর্শী স্বরে—নারদ, ভরত, হনুমান, নায়ক—কলাবতগুষ্ঠির সপিণ্ডকরণ করিতেছে। সচ্চিদানন্দ উপভোগের প্রত্যক্ষ বিঘ্নস্বরূপ পুরুষকে মর্মাহত চোবেজী তীব্র বিরক্তিব্যঞ্জকস্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"বলি, রাপু হে—ও বেসুর বেতাল কি চীৎকার করছ?" ক্ষিপ্র উত্তর এলো—"সুর তালের আমার আবশ্যক কি হে? আমি ঠাকুরজীর মন ভিজুচ্চি।" চোবেজী—"হুঁ, ঠাকুরজি এমনই আহম্মক কিনা? পাগল তুই—আমাকেই ভিজুতে পারিস্ নি—ঠাকুর কি আমার চেয়ে বেশী মূর্খ?" ৫

স্বামীজীর রচনা থেকে আর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে এই অধ্যায়ের উপসংহার করা হবে। এই অংশটিতে কিন্তু সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর মতামত নেই। বরং আছে এক সঙ্গীতশিল্পী সম্পর্কে তাঁর মতামত। তিনি যে ইউরোপীয় সঙ্গীতেরও একজন বোদ্ধা ছিলেন, তা তাঁর এই রচনাংশ থেকে বোঝা যায়। কারণ, একজন ইউরোপীয় সঙ্গীতশিল্পীর মুল্যায়ন তিনি এখানে করেছেন।

স্বামীজীর কথিত এই সঙ্গীতশিল্পী হলেন রমাঁ রলাঁ এবং হাবু দত্তের প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লিখিত মাদাম্ কাল্ভে। তৎকালীন ইউরোপের স্বনামধন্য গায়িকা মাদাম্ কাল্ভে এবং স্বামীজী পরস্পরের গুণগ্রাহী ছিলেন। পাশ্চাত্য ভ্রমণকালে স্বামীজী যেমন অনেক মনীষী, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন,—তেমনি ললিত-কলার কোন কোন বিশিষ্ট শিল্পীরও। শেষোক্ত শ্রেণীর এম্‌নি দুজন হলেন মাদাম্ কাল্ভে এবং শারা বার্ন্‌হার্ড। সমসাময়িক সঙ্গীত ও অভিনয় জগতের দুটি শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। গায়িকা কাল্ভের কথা একাধিকবার পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯১১-তে তাঁর কল্‌কাতায় আসা এবং বেলুড় মঠে হাবু দত্তের এস্রাজবাদন শোনার প্রসঙ্গও হাবু দত্তের প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। শারা বার্ন্‌হার্ড্ তৎকালীন ইউরোপের সম্ভবত শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী ছিলেন। তাঁর বিষয়ে বিশেষ বলবার প্রয়োজন নেই, কারণ স্বামীজী মাদাম কাল্ভে সম্পর্কেই বেশি আলোচনা করেছেন। বর্তমানের সঙ্গীতপ্রসঙ্গে সেজন্যে শারা বার্নহার্ডের কথা অনুল্লিখিত রইল।

মাদাম কাল্‌ভের বিষয়ে এই বিবরণে আর একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। তা হল, ইউরোপীয় সঙ্গীতবিষয়ে স্বামীজীর গুণগ্রাহিতা। ইউরোপীয় সঙ্গীত সম্পর্কে স্বামীজীর যে জ্ঞান ও আগ্রহ ছিল, তা মাদাম কাল্‌ভের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রকাশের উপলক্ষ্যে পরিস্ফুট হয়েছে। সঙ্গীত বিষয়ে স্বামীজীর যথার্থ উপলব্ধি ও বহুদর্শিতা থাকায় সঙ্গীতক্ষেত্রে তাঁর বিশ্বজনীন দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যেত। মাদাম কাল্‌ভের প্রতি যে তিনি সশ্রদ্ধ ছিলেন, তার কারণ পাশ্চাত্য সঙ্গীত তথা বিশ্বসঙ্গীত সম্পর্কে তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। পরবর্তী অধ্যায়ে মুদ্রিত তাঁর সঙ্গীতবিষয়ক রচনাটির প্রথম অংশেও তাঁর এই বিশ্বজনীন সঙ্গীতমানসের পরিচয় পাওয়া যাবে।···

স্বামীজীর ইউরোপ ভ্রমণকালে কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্‌ থেকে তাঁর স্বলিখিত বৃত্তান্তে নিম্নলিখিত বিবরণ আছে,—

"সঙ্গের সঙ্গী তিনজন—দুজন ফরাসী, একজন আমেরিক। আমেরিক তোমাদের পরিচিতা মিস্ ম্যাক্‌লাউড, ফরাসী পুরুষবন্ধু মস্যিয় জুল বোওয়া, ফ্রান্সের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত দার্শনিক ও সাহিত্য লেখক; আর ফরাসিনী বন্ধু জগদ্বিখ্যাত গায়িকা মাদ্‌মোয়াজেল কাল্‌ভে।···মাদ্‌মোয়াজেল কাল্‌ভে আধুনিক কালের সর্বশ্রেষ্ঠা গায়িকা—অপেরা গায়িকা। এঁর গীতের এত সমাদর যে, এঁর তিন লক্ষ টাকা, চার লক্ষ টাকা বার্ষিক আয় খালি গান গেয়ে। এঁর সঙ্গে আমার পরিচয় পূর্ব হতে। পাশ্চাত্য দেশের সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী মাদাম সারা বার্নহার্ড, আর সর্বশ্রেষ্ঠা গায়িকা কাল্‌ভে—দুজনেই ফরাসী, দুজনেই ইংরেজী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা, কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকায় মধ্যে মধ্যে যান ও অভিনয় আর গীত গেয়ে লক্ষ লক্ষ ডলার সংগ্রহ করেন।···

মাদমোয়াজেল্ কাল্‌ভে এ শীতে গাইবেন না, বিশ্রাম করবেন,—ইজিপ্ত প্রভৃতি নাতি শীত দেশে চলেছেন। আমি যাচ্ছি—এঁর অতিথি হয়ে। কাল্‌ভে যে শুধু সঙ্গীতের চর্চা করেন, তা নয়; বিদ্যা যথেষ্ট, দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের বিশেষ সমাদর করেন। অতি দরিদ্র অবস্থায় জন্ম হয়; ক্রমে নিজের প্রতিভাবলে, বহু পরিশ্রমে, বহু কষ্ট সয়ে এখন প্রভূত ধন!— রাজা, বাদসার সম্মানের ঈশ্বরী।

মাদাম মেল্‌বা, মাদাম এমা এমস্ প্রভৃতি বিখ্যাত গায়িকাসকল আছেন; জঁাদরেদ কি, প্লাঁসঁ প্রভৃতি অতি বিখ্যাত গায়কসকল আছেন—

এঁরা সকলেই দুই তিন লক্ষ টাকা বাৎসরিক রোজগার করেন।— কিন্তু কাল্‌ভের বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে এক অভিনব প্রতিভা!" ৬

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

(১) ভাববার কথা, পৃঃ ১০— স্বামী বিবেকানন্দ।
(উদ্বোধন সম্পাদককে ১৯০০ খৃঃ ২০ ফেব্রুয়ারীর লিখিত পত্র)।

(২) পত্রাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ১৭৭—স্বামী বিবেকানন্দ।

(৩) Life of Swami Vivekananda, p. 20—By his Eastern & Western disciples—Adwaita Asram, Mayavati.

(৪) ভারতে বিবেকানন্দ, পৃঃ ১৮৬— উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত।

(৫) ভাববার কথা, একাদশ সংস্করণ, পৃঃ ৪২-৪৩— স্বামী বিবেকানন্দ।

(৬) পরিব্রাজক, একাদশ সংস্করণ, পৃঃ ১০৬-১০৯— স্বামী বিবেকানন্দ।

সঙ্গীত-তত্ত্বের ভাষ্যকার

এবারে স্বামীজীর সঙ্গীতজ্ঞরূপে সর্বশেষ পরিচয়ের কথা। সঙ্গীতের ঔপপত্তিক বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনার প্রসঙ্গ। বর্তমান গ্রন্থের শেষ আলোচ্য বিষয় হলেও তাঁর জীবনের এটি শেষ অধ্যায় নয়। এমন কি সঙ্গীতের তত্ত্ব বিষয়ে এই আলোচনা-পুস্তক রচনা তিনি সঙ্গীত জীবনের শেষ পর্বেও করেন নি।

আগেকার একটি অধ্যায়ে দেখা গেছে, তিনি জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত গায়ক ছিলেন। তার বহুকাল পূর্বে, তাঁর গান রচনার কথা জানা যায়। তা' হ'ল তাঁর সন্ন্যাস-জীবনের প্রাক্কালে, বরানগর মঠের প্রথম অবস্থায়। আর তারও আগে তাঁর সঙ্গীত-বিষয়ক এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এটি তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের আগের কথা। গৃহী জীবনের শেষ অবস্থায় এবং শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পূর্বে সঙ্গীতের এই তত্ত্বকথা তিনি রচনা করেছিলেন। তখন তাঁর মাত্র ২৩ বছর বয়স। জীবনের মধ্যাহ্নকাল। এই রচনার সন্ তারিখের কথা পরে বিশেষভাবে আলোচনা করা হবে।

স্বামীজী রচিত এই পুস্তকটি পাঠক পাঠিকাদের উপহার দেবার আগে কিছু প্রারম্ভিক বক্তব্য আছে, এবং তা নিবেদন করতে হবে সবিস্তারে। স্বামীজী—অবশ্য তখনো তিনি নরেন্দ্রনাথ—যে সঙ্গীতের ঔপপত্তিক বিষয়ে একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন ও তা মুদ্রিত হয়েছিল, একথা প্রায় সকলেরই কাছে অভিনব শোনাবে। কারণ, সে পুস্তক বহুকাল লুপ্ত হয়ে গেছে। স্বামীজীর প্রচলিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে তার সন্ধান নেই। তাঁর এই রচনাটির কথা বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত হয়ে আছে।

সুতরাং এই রচনার পুনঃ প্রকাশকে লুপ্তরত্নোদ্ধার বলা, আশা করি, অসঙ্গত হবে না।

স্বামীজীর এই পুস্তক প্রসঙ্গের কিন্তু আরো একটি দিক আছে। গ্রন্থটি যে তাঁরই রচনা সেকথা হয়ত কারো কাছে প্রমাণ সাপেক্ষ মনে হতে পারে। সেজন্যে নিম্নলিখিত আলোচনার অবতারণা করতে হ'ল।

প্রায় তিন বছর আগে, বাংলার সঙ্গীত সাহিত্য সম্পর্কে অনুসন্ধানের সময় একটি পুস্তক বর্তমান লেখকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। গ্রন্থের নাম "সঙ্গীত কল্পতরু"। লেখকের নামের স্থলে মুদ্রিত ছিল: "নরেন্দ্রনাথ

দত্ত বি, এ, ও বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্তৃক সংগৃহীত। প্রকাশের তারিখ—ভাদ্র, ১২৯৪ সাল, অর্থাৎ অগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ। ১১৮ নং অপার চিৎপুর, কলিকাতা, 'আর্য পুস্তকালয়' হইতে, শ্রীচণ্ডীচরণ বসাক কর্তৃক, প্রকাশিত। কলিকাতা ১ নং উমেশ দত্তের লেন, জ্ঞান যন্ত্রে, শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।"

সে সময় স্বামীজীর সঙ্গীতজীবন নিয়ে কোন পুস্তক রচনার পরিকল্পনা লেখকের ছিল না। সেজন্যে উক্ত গ্রন্থটি পুনঃ প্রকাশ বা সে সম্পর্কে কোন আলোচনার কথা মনে হয়নি। কিন্তু তা পরীক্ষা করে মনে হয়েছিল যে সেটি স্বামীজীরই রচনা এবং উক্ত "নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি, এ," ও স্বামীজী অভিন্ন ব্যক্তি।

প্রশ্ন হতে পারে—একথা বিশেষ করে জানাবার কি প্রয়োজন আছে? এ আর কি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার? নরেন্দ্রনাথ দত্ত যে স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম, তা' কার অজানা আছে? এবং তাঁর বি, এ, ডিগ্রী লাভের কথাও তাঁর প্রত্যেক জীবনী পাঠকের সুপরিজ্ঞাত।

তা সত্ত্বেও একথা বিশেষ করে জানাবার তাৎপর্য আছে। কারণ, আগেই বলা হয়েছে, স্বামীজীর এই পুস্তক রচনার কথা আদৌ সুবিদিত নয়। তাঁর এই গ্রন্থটি আর পরে তাঁর নামে পুনর্মুদ্রিত হয়নি। সেজন্যে এই নামে তিনি যে পুস্তক রচনা করেছিলেন এবং তা' গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল—একথা একরকম অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

তাঁর রচিত ও অনূদিত (গীতগোবিন্দের অনুবাদ ভিন্ন) এবং বক্তৃতাদি অবলম্বনে লিখিত ও অনুবাদিত অন্যান্য পুস্তকগুলি সবই পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। সেগুলি সংস্করণের পর সংস্করণ সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে। পুস্তকগুলির নামও সকলের সুপরিচিত। কিন্তু তাঁর প্রথম জীবনের প্রকাশিত গ্রন্থ "সঙ্গীত কল্পতরু" তাঁর অন্যান্য গ্রন্থাবলীর সঙ্গে তাঁর নামে পুনঃ প্রকাশিত হয়নি। বাংলার পাঠক সমাজের কাছে একথা সম্পূর্ণ অপরিচিত যে স্বামীজী "সঙ্গীত কল্পতরু" নামে একটি বিশিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য সঙ্গীত গ্রন্থের প্রণেতা। স্বামীজীর এই পুস্তকটি এবং সঙ্গীততত্ত্বের ভাষ্যকার রূপে তাঁর এক মহৎ পরিচয় লোকচক্ষুর অন্তরালে লুপ্ত হয়েছিল। এমন কি তাঁর অনুরাগী পাঠক সাধারণের মধ্যেও এই তথ্য ছিল অপরিজ্ঞাত।......

তা' ছাড়া, আরো এক আশ্চর্য কথা আছে। স্বামীজীর কোন প্রামাণিক

ও সুবিস্তৃত জীবনীতেও তাঁর এই পুস্তকের নামটি উল্লিখিত নেই। এমন কি তাঁর দুই সুযোগ্য সহোদর মহেন্দ্রনাথ ও ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ লিখিত স্বামীজী সম্পর্কিত বহু তথ্যপূর্ণ ও মূল্যবান গ্রন্থাদিতেও "সঙ্গীত কল্পতরু"র নাম অপ্রকাশিত আছে। মহেন্দ্রনাথের প্রদত্ত বিবরণগুলির মধ্যে স্বামীজীর এই সঙ্গীত পুস্তকের বিষয়ে কোন কথা নেই। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ স্বামীজীর একটি সঙ্গীত পুস্তকের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পুস্তকের নাম নেই এবং তা শুধু পাখোয়াজ ও তব্‌লা বিষয়ক বলে ডঃ দত্তের গ্রন্থে লিখিত আছে। এ বিষয়ে পরে যথাযোগ্য উদ্‌ধৃতি সহযোগে আলোচনা করা হবে।···

"সঙ্গীত কল্পতরু" প্রথম হাতে আসবার অনেক পরে স্বামীজীর সঙ্গীত-জীবন বিষয়ে রচনা করবার ইচ্ছা লেখকের মনে জাগে। তখন উক্ত বইখানি পুনরায় পর্যালোচনা করতে হয়। এবং এ সম্পর্কে প্রাপ্ত সমস্ত তথ্যাবলী স্বামীজীর জীবনের পটভূমিতে স্থাপিত করে কোন সন্দেহ থাকেনা যে "সঙ্গীত কল্পতরু" স্বামীজীরই সঙ্গীত পুস্তক।

অবশ্য, ওই "নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি, এ," ভিন্ন গ্রন্থটিতে স্বামীজীর পরিচায়ক অন্য কোন কথা নেই। যদিও বইটির তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল এবং কয়েক বছর ধরে সাধারণে প্রচলিত ছিল।

তারপর আবার বইখানি অন্য একটি নামে প্রকাশিত হয় ঈষৎ পরিবর্তিত কলেবরে। এই নতুন নামের পুস্তকটিরও চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ হতে জানা যায় এবং তা স্বামীজীর দেহত্যাগের প্রায় দু'বছর পূর্বের ঘটনা। সে সময় স্বামীজীর নাম জানেন না, বাংলা সাহিত্যের এমন কোন পাঠক ছিলেন কি না সন্দেহ। তত্রাচ স্বামীজীর নাম ওই গ্রন্থের এতগুলি সংস্করণেও কোথাও উল্লিখিত হয়নি।

অবশ্য এ সমস্তই তথাকথিত 'বটৃতলা সংস্করণ!' স্বামীজীর গ্রন্থাবলীর কোন প্রামাণিক প্রকাশন নয়। তাঁর গ্রন্থটির অন্য নামে রূপান্তরিত করবার প্রচেষ্টায়ও ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি ছিল এবং তাও মূল গ্রন্থের অবলুপ্তির অন্যতম কারণ। সে প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় উদ্‌ধৃতি পরে দেওয়া হবে।

সুতরাং দু'কারণে গ্রন্থটি সাহিত্যজগৎ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। একদিকে বইখানির প্রথম প্রকাশক অন্য নামের অন্তরালে তা লুপ্ত করে দেন। অন্যদিকে, স্বামীজীর ধর্ম প্রভৃতি সংক্রান্ত পুস্তকাদির সঙ্গে এই গ্রন্থ এ পর্যন্ত

পুনঃ প্রকাশিত হয়নি। সেজন্যে এটি যে স্বামীজীর, তা' বিস্তৃতভাবে আলোচনার যোগ্য।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি অসুবিধার কথা আগে বলা হয়েছে। স্বামীজীর বিষয়ে যত প্রামাণিক বা অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশিত আছে, তাদের মধ্যে কোথাও "সঙ্গীত কল্পতরু"র নাম উল্লিখিত নেই। এটি যে স্বামীজীর পুস্তক একথাও তাঁর সম্পর্কে লিখিত কোন পুস্তকের গ্রন্থকার সুস্পষ্ট করে বলেননি।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে স্বামীজীর নানামুখী অবদান সম্বন্ধে সব চেয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন পণ্ডিত-প্রবর ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। স্বামীজী সম্পর্কিত বহু তথ্যপূর্ণ এবং মূল্যবান ইংরেজী গ্রন্থে (The Life of Swami Vivekananda—Patriot-prophet)। ডঃ দত্ত স্বামীজীর একটি সঙ্গীতবিষয়ক পুস্তক রচনার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পুস্তকের নামটি সেখানেও অপ্রকাশিত। তা' ছাড়া, ডঃ দত্তের প্রদত্ত বিবরণ থেকে স্বামীজীর গ্রন্থটির বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও সঠিক ধারণা করা যায় না। তিনি লিখেছেন যে স্বামীজী কয়েকটি সঙ্গত-যন্ত্রের (পাখোয়াজ, তবলা) বিষয়ে একটি পুস্তক রচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু স্বামীজী প্রণয়ন করেছিলেন সমগ্রভাবে সঙ্গীততত্ত্ব এবং তার ক্রিয়াংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। পাখোয়াজ, তবলা ইত্যাদি যন্ত্র বাদনের বিষয়টি পুস্তকের একটি অংশ মাত্র। পাঠক পাঠিকা মূল পুস্তকটিতে তা দেখতে পাবেন। মনে হয়, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ স্বামীজীর পুস্তকটি আদ্যোপান্ত পড়বার সুযোগ পাননি। কিংবা পড়বার বহুকাল পরে স্বামীজীর বিষয়ে লেখবার সময়ে হয়ত পূর্বকথা বিস্মৃত হয়েছিলেন। ডঃ দত্তের মন্তব্য কিছু পরেই উদ্‌ধৃত করা হবে।

তার আগে স্বামীজীর দুটি প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থের বিষয়ে উল্লেখ করবার আছে। একটি হ'ল, মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রম থেকে স্বামীজীর চার খণ্ডে প্রকাশিত ইংরেজী জীবনী, The Life of Swami Vivekananda by his Eastern & Western disciples। অন্যটি হ'ল, উক্ত গ্রন্থের উপাদান নিয়ে প্রমথনাথ বসু কর্তৃক বাংলায় লিখিত—"স্বামী বিবেকানন্দ (চার ভাগে সম্পূর্ণ)। এই দুই গ্রন্থেই স্বামীজীর সঙ্গীত বিষয়ে একটি রচনার কথা লিখিত আছে। কিন্তু রচনার নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং পুস্তকটির সম্পূর্ণ পরিচয়ও এই বিবরণ থেকে পাওয়া যায় না।

উক্ত তিনটি গ্রন্থে স্বামীজীর সঙ্গীত পুস্তকের বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে বিবরণটি পাওয়া যায়, তা এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল। তারপর এবিষয়ে আমাদের মতামত ও মন্তব্য উপস্থাপিত করা হবে।

স্বামীজীর বাংলা জীবনী গ্রন্থে তাঁর এই সঙ্গীত বিষয়ক রচনা প্রবন্ধে নিম্নলিখিত বিবৃতি আছে,—

"প্রাচ্য সঙ্গীতের সহিত পাশ্চাত্য সঙ্গীতের তুলনা দ্বারা তিনি সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং উক্ত শাস্ত্রের একজন অভিজ্ঞ সমালোচক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এমন কি কোন দরিদ্র পুস্তক প্রকাশককে তিনি 'ভারতীয় সঙ্গীত-তত্ত্ব' সম্বন্ধে একটি প্রকাণ্ড মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছিলেন…"[১]

ইংরেজী গ্রন্থটিতে পাওয়া যায়,—

"Naren had become well-versed in music. Not alone that, but he had even written an elaborate preface on the science and philosophy of Indian music, to a big book of Bengali songs. And this he did, solely to help a poor struggling publisher"[২]

ডঃ ভুপেন্দ্রনাথ তাঁর "Swami Vivekananda—Patriot-prophe" গ্রন্থের একস্থানে লিখেছেন,—

"Perhaps he learnt to play on the same instrument (i. e. pakhwaj—present writer) and along with it on Bauya and Tabla from him. Narendranath wrote a book on how to play on these instruments in Bengali. It was published by Vaishnav Charan Basak of Bartola. The writer has seen a copy of it in the Library of the Belur Math."[৩]

সুতরাং দেখা যায়, স্বামীজীর বিষয়ে তিনটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থেই আলোচ্য প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। তবে ভিন্ন ভাবে। স্বামীজীর পুস্তকের নাম উল্লেখ না করলেও তিনজন গ্রন্থকারই প্রকাশ করেছেন যে স্বামীজী সঙ্গীত বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ রচনা বা পুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন। ডঃ দত্ত বলেছেন, পাখোয়াজ, তবলা প্রভৃতি বাদ্য-যন্ত্র বিষয়ের "পুস্তক"। অন্য দুই গ্রন্থে আছে, একটি প্রকাণ্ড গানের বইয়ে সঙ্গীততত্ত্ব বিষয়ে 'বিস্তৃত ভূমিকা' (elaborate preface) এবং 'ভারতীয় সঙ্গীততত্ত্ব' সম্বন্ধে একটি প্রকাণ্ড মুখবন্ধ।

এই তিনটি উল্লেখের লক্ষ্য এক। একই বস্তুর বিষয়ে ভিন্ন গ্রন্থকার ভিন্নভাবে বিবৃতি দিয়েছেন। কোন বিবরণই সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু তিনটির মধ্যেই আংশিক সত্য আছে। তার মধ্যে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ প্রকাশকের নামটি প্রকাশ করে গ্রন্থ সনাক্তকরণের বিশেষ সুবিধা করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তির নাম তিনি প্রকাশকরূপে উল্লেখ করেছেন, সেই বৈষ্ণবচরণ বসাক কিন্তু আসল গ্রন্থে প্রকাশক মাত্র নেই। তিনি নরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে সমমর্যাদায় অন্যতম গ্রন্থকাররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, দেখা যায়।

এই পুস্তক প্রকাশনার সময়ে স্বামীজী সন্ন্যাস-জীবন যাপন করেন এবং প্রকাশনার বিষয়ে কোনরকমে জড়িত না থাকায় এই যথেচ্ছ কাণ্ড ঘটেছে, মনে হয়।···

স্বামীজীর ইংরেজী ও বাংলা জীবনী দুটিতে তাঁর মুখবন্ধ রচনার যে উল্লেখ দেখা গেল, তাও স্বামীজীর সঙ্গীত-গ্রন্থটির সম্পূর্ণ পরিচায়ক নয়। এই উক্তি থেকে পাঠকের মনে হতে পারে যে, এই গীত-গ্রন্থটি অপরের কৃত এবং স্বামীজী তার ভূমিকা লিখে দিয়েছেন মাত্র। কিন্তু প্রকৃত তথ্য তা নয়।

গ্রন্থের গীতাংশটি গানের সংগ্রহ এবং তা-ই গ্রন্থের বেশির ভাগ স্থান অধিকার করে আছে—প্রায় তিন চতুর্থাংশ। এই গীতের বিভাগটিও প্রায় সর্বাংশে স্বামীজীর সম্পাদিত। তিনিই যে এর গানগুলি প্রায় সমস্ত সংগ্রহ করেছিলেন, তা বৈষ্ণবচরণ বসাক স্বয়ং ঘোষণা করেছেন। সুতরাং অধিক প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। বৈষ্ণবচরণের সেই বিবৃতি পরে উদ্‌ধৃত করা হবে।

"সঙ্গীতকল্পতরু"র ভূমিকাটি যে স্বামীজীর রচিত সে বিষয়েও সন্দেহের কারণ নেই। প্রথমত, জীবনী গ্রন্থের উক্তি। দ্বিতীয়ত, বৈষ্ণবচরণের বিবৃতি থেকেও তার পরোক্ষ সমর্থন পাওয়া যায়। তৃতীয়ত, "সঙ্গীতকল্পতরু"র গীত বিভাগটি পরে বৈষ্ণবচরণ যখন অন্য নামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন, সেই নতুন পুস্তকটি থেকে "ভূমিকা"টি বর্জিত হয় এবং "নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি, এ," নামটিও লুপ্ত হয়ে যায়।

এখন, গ্রন্থের বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনার প্রয়োজন। প্রথমে গীতি-বিভাগটির কথা বলা হবে। তারপর তথাকথিত ভূমিকাটির প্রসঙ্গ।

"সঙ্গীত কল্পতরু" প্রকৃতপক্ষে বাংলাগানের একটি বিপুলকায় সংকলন

গ্রন্থ। তার মধ্যে কিছু হিন্দী ভজন ও উর্দু গানও আছে। এই সংকলন কার্যও স্বামীজীর কৃত। বিভিন্ন ধরনের গীতাবলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে সুচারুভাবে এই সংকলনকার্য সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছিল। নচেৎ এই গীত-সংগ্রহ এমন পরিকল্পনা অনুসারে হ'ত কিনা সন্দেহ।

গ্রন্থের এই গীতি-সংকলন বিভাগের নাম দেওয়া হয়েছে, 'সঙ্গীতসংগ্রহ'। তৎকালে প্রচলিত ও অপ্রচলিত নানা উৎকৃষ্ট বাংলা এবং কিছু হিন্দী, উর্দু ইত্যাদি গানের মধ্যে থেকে স্বামীজী এই গানের সংকলন করেছিলেন।

গানের নির্বাচন ও সংগ্রহে যে তাঁর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় ছিল, একথা বোঝা যায় গ্রন্থের প্রকাশকাল মনে রাখলে। পুস্তকটি প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে। মুদ্রণের কার্য এক বছর চলেছিল, তা পুস্তকে মুদ্রিত বিবৃতি থেকে জানা যায়। সুতরাং ১৮৮৬-এ স্বামীজী গানগুলি সংগ্রহ ও গ্রথিত করেছিলেন। তাঁর পূর্বে এই ধরনের গান সংকলনের কার্য খুব বেশি হয়নি।

বিভিন্ন গীতরচয়িতাদের রাগাত্মক বাংলা গানের সংকলন সম্ভবত প্রথম প্রকাশিত করেছিলেন কৃষ্ণানন্দ ব্যাস। দেশীয় সঙ্গীতক্ষেত্রে তাঁর বিপুল অবদান 'সঙ্গীত রাগ কল্পদ্রুম' নামক সঙ্গীতবোধের তৃতীয় খণ্ড ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় প্রকাশিত হয়। তারপর আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক বারো ভাগে প্রকাশিত 'ব্রাহ্মসঙ্গীত' বহু ধ্রুপদাঙ্গ বাংলা গানের সংগ্রহরূপে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তা একান্তভাবে ব্রাহ্মসঙ্গীতের সঞ্চয়ন। অন্য কোন বিষয় বা ভাবের বাংলা গান উক্ত গ্রন্থাবলীতে নেই।

স্বামীজীর আগে বাংলা গানের সংকলন যাঁরা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হ'ল নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের। তিনিও ব্রাহ্মসমাজভুক্ত এবং সুনীতির অজুহাতে নিধুবাবুর গান তাঁর সংগ্রহ থেকে বর্জন করেছিলেন বটে (যদিও নিধুবাবুর গানে দুর্নীতির অভিযোগ তথ্য ও যুক্তি-সহ কিনা সন্দেহ)। কিন্তু নানা গীতরচয়িতাদের নানা রীতির গানের সংকলনে তিনি একটি আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, বলা যায়। তাঁর সম্পাদিত "ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী" (১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত) এবং "সঙ্গীত সংগ্রহ" (১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) গ্রন্থ দুটি বাংলাগানের সংকলনে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। তাঁর অব্যবহিত পরেই স্বামীজী উক্ত সংগ্রহের কার্যে হাত দিয়েছিলেন। তাঁর গানের সংকলন

বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং অনেকাংশে বাংলা গানের নানা ভাব ও বিষয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছিল।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি স্বামীজী এই গীত-সংকলন শেষ করেছিলেন। সুতরাং আরম্ভ করেছিলেন তারও কয়েকমাস আগে। দেখা যায়, একটি বিশিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে তিনি গান নির্বাচন ও সংকলন করেন। গানের বিষয় বা ভাব অনুযায়ী এই সংগ্রহ তিনি কয়েকটি অংশে বিভক্ত করেছিলেন। এক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের গান গ্রথিত হয়েছে সেই বিভাগে। যথা—"জাতীয় সঙ্গীত, ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্গীত, শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত, কৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীত, বৈষ্ণবদিগের গান, বিবিধ ধর্ম্মসঙ্গীত, খৃষ্টানী সঙ্গীত, মুসলমানী গান, পৌরাণিক সঙ্গীত, ঐতিহাসিক সঙ্গীত, প্রণয়সঙ্গীত, বিবিধ সঙ্গীত, নানাবিষয়ক সঙ্গীত।"

এই "সঙ্গীত সংগ্রহ" স্বামীজীর বিভিন্ন ধরনের গানে অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। বর্তমান গ্রন্থে তাঁর গায়কজীবনের অধ্যায়গুলিতে তাঁর নানা রীতির গান গাইবার কথা উল্লিখিত হয়েছে। দেখা গেছে, বহুবিধ গান তাঁর ভাণ্ডারে সঞ্চিত ছিল। একাধিক ওস্তাদের কাছেও তিনি বহু গান সংগ্রহ করেছিলেন। বাংলা গান তাঁর সংগৃহীত হয় ব্রাহ্মসমাজ ও অন্যান্য সূত্রে। ফলে, তাঁর পক্ষে এই সংকলনের কাজ সহজসাধ্য হয়েছিল। তাঁর সংকলিত গানগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তার অনেকগুলি তিনি জীবনের নানা পর্বে স্বয়ং গেয়েছেন এবং কতকগুলি গান তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হবে এই পুস্তক থেকে।

আলোচ্য পুস্তকটি পর্যালোচনা করলে আদ্যোপান্ত যেন তাঁর সংস্পর্শ অনুভব করা যায়। গ্রন্থটি যে প্রায় সর্বাংশে স্বামীজীর পরিশ্রমের ফল, একথা বৈষ্ণবচরণ বসাকের একটি বিবৃতিতেও আছে।—

"প্রায় এক বৎসর অতীত হইল, ইহার সংকলনকার্য আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি, এ, মহাশয়ই প্রথমত ইহার অধিকাংশ সংগ্রহ করেন, কিন্তু পরিশেষে তিনি নানা অলঙ্ঘনীয় কারণে অবসর না পাওয়ায় ইহা শেষ করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য আমিই ইহার অবশিষ্টাংশ পূরণ করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করিলাম।"

ভাদ্র, ১২৯৪ সাল
কলিকাতা

শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক *

এই গীতি-সংকলনের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখযোগ্য। তা' হ'ল—এমন কতকগুলি গান এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে যা' তার বেশিদিন আগে প্রকাশিত হয়নি। যেমন, রবীন্দ্রনাথের "গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে" গানখানি। এই গানটি প্রথম জীবনে স্বামীজীর অন্যতম প্রিয় সঙ্গীত ছিল এবং এই গান তাঁর একাধিকবার গাইবার কথা "শ্রীরামকৃষ্ণ সন্নিধানে" প্রভৃতি অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। গানখানি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কত বছর বয়সে আদি সমাজের জন্যে রচনা করেন এবং কোন্ বছরে তা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, সে সব কথা উক্ত অধ্যায়ে বিবৃত আছে। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসঙ্গীত রচনা করবার সময় থেকেই যে স্বামীজী তাঁর রচিত গানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এমন মন্তব্যও বর্তমান পুস্তকের পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে করা হয়েছে; এখানে তার আর একটি উদাহরণ পাওয়া গেল। "সঙ্গীত কল্পতরু"র "সঙ্গীত সংগ্রহ" অংশে রবীন্দ্রনাথের এই গানটি ("গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে—জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল) সংকলিত হয়েছে। তার আগেই মুদ্রিত আছে গুরু নানকের বিখ্যাত ভজনটি (গগনময় থাল রবি চন্দ দীপক বনে—জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল), যার বাংলায় রূপান্তরকরণ হল রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত গানখানি। দু'টি গান পাশাপাশি মুদ্রিত করায় বোঝা যায় যে স্বামীজী নানকের ভজনটির বঙ্গীয় করণের বিষয়ে অবহিত ছিলেন এবং তা তাঁর প্রীতিকর বোধ হয়েছিল।

স্বামীজীর আর একটি অতি প্রিয় গান "জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই" "সঙ্গীত কল্পতরু"র গীতাংশেও অন্তর্ভুক্ত আছে। গানটি গিরিশচন্দ্রের "বুদ্ধদেব" নাটকের (প্রথম অভিনয়: সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫) একটি বিখ্যাত সঙ্গীত। স্বামীজীর এই গানখানি একাধিকবার গাওয়ার কথা ও তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে স্বামীজীর জীবনের সঙ্গে গানটির বিশেষ যোগাযোগের বিষয়ে "সর্বপর্বে সঙ্গীত" অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এই গানের সুর ও তাল স্বামীজীর গ্রন্থে (১২১ পৃষ্ঠায়) আছে—ধানি মিশ্র, একতালা।

বঙ্কিমচন্দ্র রচিত এবং তাঁর মৃণালিনী উপন্যাস ও পরে নাটকের অন্তর্ভুক্ত একটি অনবদ্য গান "সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে"—(পিলু, কাশ্মীরী খেম্‌টা) স্বামীজীর সঙ্গীত সংগ্রহে স্থান লাভ করেছে। এই গানটিও স্বামীজীর প্রিয় ছিল এবং লণ্ডনে একদিন আপন মনে গানখানি তাঁর গাইবার প্রসঙ্গও বিবৃত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে।

স্বনামধন্য গায়ক ও গীত-রচয়িতা যদুভট্ট রচিত বিখ্যাত বাংলা ধ্রুপদ "বিপদ ভয় বারণ, যে করে ওরে মন"-ও (ছায়ানট, ঝাঁপতাল) স্বামীজীর পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যদুভট্টের এই গানটি স্বামীজী শুধু তাঁর সঙ্গীত সংগ্রহ অংশের অন্তর্গত করেননি। গ্রন্থের ঔপপত্তিক বিষয়ে আলোচনার বিভাগে স্বামীজী গানখানির স্বরলিপিও প্রকাশ করেছেন। এই গানটি তাঁর গাইবার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে "শ্রীরামকৃষ্ণ সন্নিধানে" শীর্ষক অধ্যায়ে। সুতরাং যদুভট্টের এই গানখানি যে স্বামীজীর অন্যতম প্রিয় সঙ্গীত ছিল, তা বলা চলে। "বিপদ ভয় বারণ" গানটির প্রসঙ্গে আরো বলা যায় যে, এই গান প্রথমে ব্রহ্মসঙ্গীতরূপে রচিত ও প্রচারিত হয়েছিল। যদুভট্ট তাঁর জীবনের এক সময়ে (সম্ভবত ১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে) আদি ব্রাহ্মসমাজে গায়করূপে নিযুক্ত ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উদ্‌যোগে। সেই সময় যদুভট্ট একাধিক বাংলা ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেন। তাঁর আর একটি ব্রহ্মসঙ্গীত বিশেষ প্রসিদ্ধ হয়েছিল—"দেখিয়ে হৃদয় মন্দিরে" (দেশ, সুরফাক্তা)।

"বিপদ ভয় বারণ" গানখানি ব্রহ্মসঙ্গীতের সংগ্রহ-গ্রন্থগুলিতে স্থানলাভ করেছে এবং তার স্বরলিপি স্বামীজীর "সঙ্গীত কল্পতরু"-র তত্ত্ব অংশ ভিন্ন কাঙ্গালীচরণ সেন প্রণীত "ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি" পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এমনিভাবে দেখা যায়, যত বাংলা এবং হিন্দী গান স্বামীজীর প্রিয় ছিল এবং যে যে গান তিনি গেয়েছেন জানা গেছে, তা' প্রায় সবই এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত আছে। অধিক উল্লেখ বাহুল্য। সুতরাং গ্রন্থের গানের সংকলন যে স্বামীজী করেছিলেন, একথা বোঝা যায়। এই গীত নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য তাঁর সম্পাদকতার এক পরোক্ষ প্রমাণ এবং তার স্বাক্ষর বহন করছে।

গ্রন্থের এই "সঙ্গীত সংগ্রহ" বিভাগে প্রায় এক হাজার গান সংকলিত আছে। তার বেশির ভাগ বাংলা। প্রায় সমস্ত গানের রচয়িতাদের নাম গানের নীচে মুদ্রিত হয়েছে। এই অংশের পৃষ্ঠা সংখ্যা—৩৮৮।

গ্রন্থের যে বিজ্ঞপ্তিটি আগে উদ্‌ধৃত করা হয়েছে—"শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি, এ, মহাশয়ই প্রথমত ইহার অধিকাংশ সংগ্রহ করেন, কিন্তু পরিশেষে তিনি নানা অলঙ্ঘনীয় কারণে অবসর না পাওয়ায় ইহা সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই"—তা' বিশেষ লক্ষ্যণীয়। এই গ্রন্থের রচনাকার্য ও সংকলন হয় ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে।

এই বছরটি স্বামীজীর জীবনে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার পুনরুক্তি

নিষ্প্রয়োজন। এই গ্রন্থেও সে বিষয়ে সবিশেষ বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাঁর জীবনীর পাঠকপাঠিকাদেরও তা' সুবিদিত আছে। উক্ত বছরের শেষভাগে তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবন অবলম্বন করেন। সুতরাং এই গ্রন্থ রচনা করেন সন্ন্যাস নেবার অব্যবহিত আগে। সেজন্যে পুস্তকের কাজ সম্পূর্ণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কিন্তু যতখানি করেছিলেন তাও এক বিস্ময়ের বস্তু এবং স্বামীজীর মতন প্রতিভাধর ব্যক্তির মধ্যেই তা সম্ভব। কারণ, গ্রন্থটি শুধু গানের সংকলন নয়। সঙ্গীতের ঔপপত্তিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে সুচিন্তিত আলোচনা ও কারিকা এই গ্রন্থের আর এক অংশ এবং মূল্যবান অংশ। জীবনের সেই মহাসন্ধিক্ষণে অবস্থান করে এবং প্রবল অন্তর্বিপ্লবের সময়ে যে এমন গভীর তত্ত্বপূর্ণ রচনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, তা বাস্তবিক আশ্চর্যের বিষয়!

স্বামীজীর এই সুদীর্ঘ রচনাটি গ্রন্থের ৯০ পৃষ্ঠা অধিকার করে আছে। রাগ সঙ্গীতের তত্ত্ব ও ক্রিয়া বিষয়ে এই রচনাটি এমন সুপরিকল্পিত, সুবিন্যস্ত ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ যে এটি একটি নাতিক্ষুদ্র পুস্তকরূপেও প্রকাশিত হবার যোগ্য। সে হিসাবে বাংলার সঙ্গীত-সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজনরূপে তা স্বীকৃত ও গণ্য হতে পারত। অন্তত যে-সময়ে এটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেই যুগে।

এখানে একথা আর একবার স্মরণ করে নেওয়া যায় যে, মাত্র ২৩ বছর বয়সে স্বামীজী এটি রচনা করেছিলেন এবং তাও এক অনন্যসাধারণ মানসিক অবস্থায়। সেই যুগে এবং সেই বয়সে ভারতীয় সঙ্গীতের মূল তত্ত্ব এবং তার নানা বিষয়ের প্রয়োগবিধি সম্পর্কে এমন একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করা তাঁর সঙ্গীত-কৃতির পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা। সঙ্গীত, বিশেষ ভারতীয় সঙ্গীতের ঔপপত্তিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যে সেই বয়সেই কতখানি পূর্ণতা লাভ করেছিল—এই রচনা তার উজ্জ্বল নিদর্শন।

বর্তমান কালের বিচারে এই পুস্তকে প্রকাশিত কোন কোন মতামত হয়ত গ্রহণযোগ্য না হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রচারিত স্বরলিপি পদ্ধতি আজ অসুবিধাজনক বোধ হতে পারে। কিন্তু বর্তমান কালের সঞ্চিত জ্ঞান ও অগ্রগতির নিরিখে ৭৫ বছর আগেকার এই আলোচনার সমালোচনা সঙ্গত হবে কি? গ্রন্থের প্রকাশ-কালের পটভূমিতে তার বিচার করা অধিকতর সঙ্গত।

এই পুস্তক রচনার সময়টি আমাদের মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে

হবে, সেই কালে বাংলার সঙ্গীত-সাহিত্যের কি অবস্থা ছিল, কিংবা কি পরিমাণ সমৃদ্ধি ছিল তার। স্বামীজীর পূর্বে আর কতজন সঙ্গীততত্ত্ব আলোচনায় এদেশে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই সমস্ত বিবেচনা করলে স্বামীজীর এই রর্চনার ছিদ্রান্বেষণ করবার প্রবৃত্তি কারো হবে না!

"সঙ্গীত কল্পতরু"র পূর্বে সঙ্গীত-শাস্ত্র বিষয়ে বাংলা ভাষায় মুষ্টিমেয় কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে প্রথম মুদ্রিত পুস্তক (১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) হ'ল রাধামোহন সেনের "সঙ্গীত তরঙ্গ"। কিন্তু এই পুস্তকের মৌলিকতা বিষয়ে কোন সুপণ্ডিত সঙ্গীত-শাস্ত্রবিদ্ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সে প্রসঙ্গে বিশেষ আলোচনা এখানে অবান্তর।

"সঙ্গীত তরঙ্গ"র পঞ্চাশ বছর পরে প্রকাশিত হয় আচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রণীত "সঙ্গীতসার" (১৮৬৯ খৃঃ প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত)। তারপর ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে আত্মপ্রকাশ করে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "গীতসূত্রসার" —সঙ্গীতের তত্ত্ব বিষয়ে গত শতকে প্রকাশিত সম্ভবত শ্রেষ্ঠ আলোচনা গ্রন্থ। শেষোক্ত দুই গ্রন্থকার ভিন্ন তাঁদেরই সমসাময়িক রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একাধিক ঔপপত্তিক বিষয়ে রচিত পুস্তকের প্রকাশনাও উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, স্বামীজী তাঁর এই রচনায় শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন সঙ্গীতক্ষেত্রে ঠাকুর মহোদয়ের বিপুল অবদানের জন্যে। স্বামীজী যে তখনো সঙ্গীত-সাহিত্য এবং সাধারণভাবে সঙ্গীতজগৎ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু ও ওয়াকিবহাল ছিলেন, তাও এই শ্রদ্ধানিবেদন থেকে বেশ বোঝা যায়। এই পুস্তক যখন স্বামীজী রচনা করেছিলেন, তখন শৌরীন্দ্রমোহনের বয়স ৪৫।৪৬ বছর এবং তখন তিনি সঙ্গীতক্ষেত্রে মহান অবদানের জন্যে 'রাজা' উপাধিলাভ করেন নি।

স্বামীজীর এই রচনা মুদ্রিত হবার আগে উক্ত কয়েক জনের গ্রন্থ শুধু প্রকাশিত হয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা ও বিচার করলে স্বামীজীর সঙ্গীততত্ত্ব বিষয়ে রচনাটির মূল্যায়ন যথার্থ হবে। ··

গ্রন্থের এই তত্ত্ব অংশটির পরিচয় এবারে দেওয়া হচ্ছে। ৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী স্বামীজীর এই রচনাটি 'ভূমিকা' বা 'মুখবন্ধ' রূপে মুদ্রিত হয়নি। এর শিরোনামা আছে—'সঙ্গীত ও বাদ্য'। গান ও বাজনার বিষয়ে যেভাবে লেখক এখানে আলোচনা করেছেন, তা প্রশংসার যোগ্য। আলোচনাটি অনেকাংশে শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে লেখা এবং ভাষা বেশ প্রাঞ্জল।

প্রসঙ্গত, স্বামীজীর বাংলা রচনার ভাষা সম্পর্কে একটি কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। স্বামীজী বাংলা রচনায় কথ্য ভাষার প্রয়োগ করতেন এবং তাঁর কথ্য ভাষায় রচিত পুস্তকাদি সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে। তাঁর পরবর্তী কালের রচনাবলীতে তার নিদর্শন আছে। সেই হিসাবে তিনি বাংলা সাহিত্যে কথ্য ভাষা প্রচলন করার বিষয়ে অন্যতম পথিকৃৎরূপে গণনীয় ও স্মরণীয়। কারণ, এই কাজ তিনি সাহিত্যাচার্য প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) মহাশয়ের পূর্বেই করেছিলেন।···কিন্তু আলোচ্য রচনাটিতে স্বামীজী তথা-কথিত সাধুভাষা ব্যবহার করেন, এটি লক্ষ্যণীয়।

স্বামীজীর এই "সঙ্গীত ও বাদ্য" সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে রচিত মনে হয়, যদিও সে কথা বিজ্ঞাপিত হয় নি। শিক্ষার্থীদের জন্যে রচিত হলেও রচনাসৌকর্যে এটি সঙ্গীত-সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। গ্রন্থের আলোচনা অংশ পাঠকদের রাগসঙ্গীত সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা-লাভে সহায়তা করে।

আগেই বলা হয়েছে, এই বই শুধু সঙ্গীততত্ত্বের আলোচনা নয়। সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রাদির প্রয়োগবিধি সম্পর্কে নানা নির্দেশাদি এতে আছে। ধ্রুপদ খেয়াল প্রভৃতি গীতিরীতির বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে বিশেষজ্ঞের নিপুণতায়। তাল, লয়, সঙ্গত প্রভৃতি প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা আছে। কয়েকটি ধ্রুপদ গানের স্বরলিপি দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া আছে পাখোয়াজ, তবলা প্রতি সঙ্গত-বাদ্যের বিষয়ে সুবিস্তৃত নির্দেশাবলী। চৌতাল, ঝাঁপতাল, একতালা, আড়াঠেকা, তিওট প্রভৃতি তালের ঠেকা ও বহু বোলের সমাবেশ।

এই সমস্ত বিষয় যেভাবে বর্ণিত ও গ্রথিত হয়েছে তা' দেখে মনে হয় যে, এটি কোন প্রবীণ ও একান্তভাবে সঙ্গীত-ব্যবসায়ীর রচনা।

এই পুস্তকের পাঠকের একথা ধারণা করা কঠিন যে, গ্রন্থকার ২৩ বছরের তরুণ এবং তিনি ঐকান্তিক সঙ্গীতসেবীও নন। সঙ্গীত তাঁর বহুমুখী সাংস্কৃতিক চিন্তা ও কর্মের অন্যতম মাত্র এবং তাঁর প্রতিভা ও মনীষার এক খণ্ডরূপ।

পুস্তকের এই অংশের সূচীর উল্লেখ করলে তাঁর আলোচিত বিষয়ের পরিধি কত ব্যাপক তা বোঝা যায়। যথা—

সঙ্গীত ও বাদ্য। সঙ্গীত পরিমাপক। স্বরগ্রাম। নামপ্রকরণ। উদারা

মুদারা তারা। কোমল স্বর। তীব্র অথবা কড়ি। হারমনি। কম্পন। আরোহ ও অবরোহক্রম। গমক ও মূর্ছনা। গিট্‌কিরি। যন্ত্র বাঁধিবার নিয়ম। সেতার। এস্‌রাজ। বেহালা। মৃদঙ্গ। তবলা ও বায়া। গীত। তাল। রাগ ও রাগিনী। চৌতাল। ঝাঁপতাল। সুর ফাকতা। ধামাল। তেওরী। মধ্যমান। আড়াঠেকা। ঠুংরি। তিওট। স্বরসাধন। স্বরলিপি। ধ্রুপদ। খেয়াল। টপ্‌পা। ভৈরব রাগের স্বরলিপি। ভৈরব কাওয়ালীর স্বরলিপি। ছায়ানট, ঝাঁপতাল—স্বরলিপি। ভূপালী, সুর ফাকতা—স্বরলিপি। কানাড়া, আড়া—স্বরলিপি। ইমণকল্যাণ, সুরফাকতা—স্বরলিপি। বাজ্‌না ও বোল্‌। ঠেকা। বাজাইবার অর্থাৎ সঙ্গত করিবার নিয়ম। তেহাই। লয়। বিলম্ব লয়। দ্রুত লয়। বাজাইবার ধ্বনির নিয়ম। আড়ি বাজান। চৌতালের ঠেকা ও বিভিন্ন বোল। সুর ফাঁকতালের ঠেকা-ও বিভিন্ন বোল। ধামালের ঠেকা ও বোল। আড়া চৌতালের ঠেকা ও নানা বোল। ঢিমে তেতালার নানা বোল। আড়াঠেকার বিভিন্ন বোল। ত্রিতালীর বিভিন্ন বোল। একতালার ঠেকা ও নানা বোল। তিওটের ঠেকা ও নানা বোল্‌। ঝাঁপতালের ঠেকা ও নানা বোল্‌।···

রাগসঙ্গীতের বিভিন্ন ব্যবহারিক বিষয়ের একত্র এমন সুনিপুণ সমাবেশ তৎকালীন সঙ্গীতসাহিত্যে সুলভ ছিল না। এ পুস্তকের সেদিক থেকে বিশেষ মূল্য ছিল। উপরন্তু নানা বিষয় ও ভাবের গানের বিপুল সংগ্রহ। সেজন্যে বইটি যে সঙ্গীতশিক্ষার্থী ও সঙ্গীতজিজ্ঞাসুদের প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত ও প্রচলিত হয়েছিল, তা তার একাধিক সংস্করণের প্রকাশ থেকে ধারণা করা যায়। গ্রন্থের ক্রমবর্ধমান জন-প্রিয়তা ও চাহিদা লক্ষ্য করেই সম্ভবত তার প্রকাশক পুস্তক-স্বত্ব আত্মস্থ করেন এক অভিনব পন্থায়।

কয়েক বছর পরে গ্রন্থখানি অন্য শিরোনামা ধারণ করে ও অন্য গ্রন্থকারের কীর্তিরূপে (অবশ্য 'মুখবন্ধ' বর্জিত হয়ে) প্রকাশিত ও প্রচলিত হয়। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীতচিন্তার স্বাক্ষর বহনকারী "সঙ্গীত কল্পতরু" লুপ্ত হয়ে যায় বটতলার গ্রন্থজগৎ থেকে এবং পরে সাহিত্য জগৎ থেকেও। কারণ, আগেও উল্লিখিত হয়েছে, স্বামীজীর এ গ্রন্থের পুনঃ প্রকাশ আজ পর্যন্ত ঘটে নি।

নরেন্দ্রনাথ দত্তের "সঙ্গীত কল্পতরু" বিলোপ সাধনের পর আত্মপ্রকাশ

করলে "সচিত্র বিশ্বসঙ্গীত", বটতলার ওই একই ঠিকানা থেকে। প্রভেদের মধ্যে, দ্বিতীয় পুস্তকে আলোচনা অংশটি পরিত্যক্ত ও গীতাংশ ঈষৎ পরিবর্তিত হ'ল। আর একটি পরিবর্তনের কথাও উল্লেখ্য। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি ছিল "নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি, এ, ও বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্তৃক সংগৃহীত"। কিন্তু শেষোক্তটি হল শুধুমাত্র "বৈষ্ণবচরণ বসাক সম্পাদিত"। এই অভিনব "সচিত্র বিশ্বসঙ্গীত" পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১২৯৯ সালের বৈশাখে।

"সচিত্র বিশ্বসঙ্গীত" এর "চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন" থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্‌ধৃত করে এই গ্রন্থান্তর প্রসঙ্গ শেষ করা হবে :…"আমাদিগের পূর্ব প্রচারিত সঙ্গীত কল্পতরু নামক গ্রন্থ পাইবার জন্য আমাদিগকে সহর মফস্বল হইতে এখনও অনেকে আবেদন করিয়া থাকেন, আমরা প্রায়ই তাঁহাদিগকে সচিত্র বিশ্বসঙ্গীত লইতে পরামর্শ দিয়া থাকি। অনেকেই বিদিত আছেন যে, সঙ্গীত কল্পতরু নামক এইরূপ একখানি সঙ্গীত গ্রন্থ আমরা সর্বপ্রথমে প্রকাশ করি এবং ঐ গ্রন্থ জনসমাজে বিশেষ সমাদৃত হওয়ায় অল্পকাল মধ্যে উহার ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণের মুদ্রিত গ্রন্থ নিচয় নিঃশেষিত হইয়া চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশের আবশ্যক হয়। ঐ সময়ে আমার প্রিয়বন্ধু এবং প্রিয় সহচর শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানচন্দ্র বসাকের বিশেষ সাহায্যে ঐ গ্রন্থের অনেক স্থল পরিবর্তন পূর্বক বিস্তর নূতন বিষয় সংযোজিত হয়। গ্রন্থের বিস্তর পরিবর্তন ঘটিল বলিয়া এবং "সঙ্গীত কল্পতরু"র বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া অনেক নীচ প্রকৃতির লোক সঙ্গীত কল্পতরু নামের অনুকরণ করিয়া কয়েকখানি অসার সঙ্গীত পুস্তক্ প্রকাশ করায় গ্রন্থের নাম পর্যন্ত পরিবর্তন উচিত বিবেচনায় ইহার নাম বিশ্বসঙ্গীত রাখা হয়। অতএব যাঁহারা এখন "সঙ্গীত কল্পতরু" লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সচিত্র বিশ্বসঙ্গীত লইতে পারেন। যেহেতু "সঙ্গীত কল্পতরু"র ইহাই সংশোধিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ এবং অতঃপর "সঙ্গীত কল্পতরু"ও আর মুদ্রিত হইবে না।

২০শে অগ্রহায়ণ ১৩০৭ সাল।
কলিকাতা | **শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক'**

অলমিতিবিস্তরেণ

গ্রন্থপঞ্জী ঃ—

১। স্বামী বিবেকানন্দ, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা ৭৫—প্রমথনাথ বসু।

২। The Life of Swami Vivekananda Vol. I, [1912] P. 109—By his Eastern & Western Disciples. Published by the Advaita Ashram, Mayavati, Himalayas.

৩। Swami Vivekananda—Patriot-prophet, P. 155 —Dr. Bhupendra Nath Datta.

৪। সঙ্গীত কল্পতরু, 'বিশেষ কথা'—নরেন্দ্রনাথ দত্ত ও বৈষ্ণবচরণ বসাক সংগৃহীত।

৫। সঙ্গীত কল্পতরু, পৃঃ ১৩৫-১৩৬—নরেন্দ্রনাথ দত্ত ও বৈষ্ণবচরণ বসাক সংগৃহীত।

৬। সচিত্র বিশ্বসঙ্গীত, চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন —বৈষ্ণবচরণ বসাক ও জ্ঞানচন্দ্র বসাক সম্পাদিত।

অতিরিক্ত গ্রন্থ সূচী ঃ—

১। সঙ্গীত তরঙ্গ (প্রথম সংস্করণ, ১৮১৮ খৃঃ)—রাধামোহন সেন।

২। সঙ্গীত রাগ কল্পদ্রুম, তৃতীয় খণ্ড (১৮৪২ খৃঃ)—কৃষ্ণানন্দ ব্যাস।

৩। ব্রহ্মসঙ্গীত—আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৪। সঙ্গীতসার (প্রথম সংস্করণ ১৮৬৯খৃঃ)—ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী।

৫। ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী—নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

৬। সঙ্গীত সংগ্রহ— ,, ,, ,,

৭। গীতসূত্রসার—(প্রথম সংস্করণ ১৮৮৫ খৃঃ)—কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সঙ্গীত ও বাদ্য

কোন একটি পদার্থ আর একটি পদার্থের দ্বারা আহত হইলে তাহার পরমাণু সমষ্টিতে একপ্রকার কম্পন উপস্থিত করে। ঐ কম্পন বায়ু অথবা অন্য কোন পরিচালক দ্বারা শ্রুতিসম্বন্ধীয় স্নায়ুমণ্ডলীতে নীত হয় এবং তাহার পর আমাদের শব্দের অনুভূতি হয়।

একটি পাতলা কাচের গ্লাস একটি ক্ষুদ্র যষ্টি দ্বারা আঘাত করিলে তৎক্ষণাৎ একপ্রকার শব্দ উৎপাদিত হইবে। যদি ঐ সময়ে গ্লাসকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা যায় তাহা হইলে কম্পন অনুভূত হইবে এবং বলপূর্বক চাপিয়া ধরিলে কম্পন নিরস্ত হইবে আর সঙ্গে সঙ্গে শব্দও তিরোহিত হইবে। এইরূপ অনেক প্রকারে দেখান যাইতে পারে যে, আহত পদার্থের কম্পনই শব্দের কারণ। বংশী প্রভৃতি শ্বাসোৎপন্ন ধ্বনিতে সন্নিহিত বায়ুমণ্ডলে ঐ কম্পন প্রথমেই উৎপাদিত হয়।

একটি পুষ্করিণীতে যদি একটি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে প্রথমে একটি বৃত্তাকার ঊর্মি উৎপন্ন হয়। ক্রমে তদপেক্ষা বৃহত্তর এবং ক্রমশঃ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর বৃত্তাকার ঊর্মিমালা সমস্ত পুষ্করিণীকে আচ্ছন্ন করে। লোষ্ট্র নিক্ষেপ মাত্র সেই স্থলের জল তাড়িত হইয়া বৃত্তাকারে ধাবিত হইল এবং যে বেগ তাহাকে ঐ প্রকার করিল পরবর্তী জলরাশিকে সেই বেগ প্রদান করিয়া নিরস্ত হইল। অনেকে হয়ত মনে করেন যে, লোষ্ট্রক্ষিপ্ত স্থানেরই জল চলিতে চলিতে তীর পর্যন্ত উপনীত হয়; ইহা ভ্রান্ত। যদি কতকগুলি পয়সা সারি দিয়া সমরেখায় রাখা যায় এবং যদি একপ্রান্তের একটিকে আঘাত করা যায়, দেখা যাইবে যে মধ্যের সকল পয়সাগুলিই স্থির হইয়া আছে কেবল শেষের পয়সাটি স্বস্থান হইতে বেগে চলিয়া গিয়াছে। ইহা সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ইহার কারণ এই যে, প্রথম প্রান্তের যে পয়সাটিকে আঘাত করা হইয়াছিল সে প্রান্ত সংলগ্ন পয়সাকে আপনার বেগ প্রদান করিল; যদি নিকটে অন্য কোন পয়সা না থাকিত তাহলে সে স্বয়ংই ঐরূপ বেগে ধাবিত হইত। কিন্তু এক্ষণে তাহার উপর যে শক্তি প্রযুক্ত হইয়াছিল তাহা দ্বিতীয়টিকে দিল, অতএব আপনি শক্তিহীন

হইয়া স্থির হইল। ঐ দ্বিতীয়টি আবার তৃতীয়টিকে এইরূপে পরস্পর শক্তি সঞ্চালন করিল। কেবল শেষেরটি শক্তি সঞ্চালনের কোন দ্রব্য না পাইয়া সেই শক্তি দ্বারা স্বয়ং চালিত হইল। পূর্বোক্ত পুষ্করিণীতেও ঠিক ঐরূপ প্রক্রিয়া উপস্থিত হইবে। লোষ্ট্র পতনের যে বেগ সেই শক্তি দ্বারা সেই স্থানের জলরাশি চালিত হইল কিন্তু চতুষ্পার্শ্বেই জলরাশি দ্বারা পরিবৃত থাকায় তাহাদিগকে আপনার বেগ প্রদান করিল, তাহারাও এই পরবর্তীক্রমে শক্তি সঞ্চালন করিতে লাগিল এবং ফল হইল এই যে, কেবল মাত্র যে স্থানের জল সেই স্থানেই একবার স্ফীত হইয়া আবার নিরস্ত হইল। এই প্রকারে ক্রমান্বয়ে পুষ্করিণীস্থিত সমস্ত জলরাশি এক এক বার মণ্ডলাকারে স্ফীত হইয়া ঐ প্রকার গোলাকার ঊর্মিমালা উৎপন্ন করিল। ইহার আরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে।

যদি একটি অত্যন্ত লঘু দ্রব্য, যেমন পক্ষীর পালক জলের উপর ভাসিতে থাকে ও তথায় ঐ প্রকার তরঙ্গমালা উৎপাদিত হয় তবে দেখা যায় যে, ঐ পালক অথবা লঘু দ্রব্য কেবল একবার জলের সঙ্গে একটু উন্নত হইল আবার জলের সঙ্গে নমিত হইল, স্বস্থান হইতে কোন ক্রমে অপসৃত হইল না। যদি তরঙ্গের সঙ্গে জলরাশি স্বস্থান ভ্রষ্ট হইত অর্থাৎ যদি চলিতে থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই পালকের ন্যায় লঘু দ্রব্যকে সঙ্গে ভাসাইয়া যাইত।

যখন একটি ঘণ্টায় আঘাত করা যায় তখন ঘণ্টার ধাতুর পরমাণু-সকলেতেও ঐ প্রকার কম্পন উপস্থিত হইয়া সেই কম্পন বায়ুমণ্ডলীতে পূর্বকথিত জলের ন্যায় তরঙ্গ উৎপাদন করে। এই প্রকার জলও শব্দের পরিচালক; একটি পুষ্করিণীর উভয় প্রান্তে দুইজন লোক ডুবিয়া দুইটি ইট যদি আঘাত করে তাহা স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হয়। এক খণ্ড বৃহৎ কাষ্ঠের একপ্রান্তে যদি আঘাত করা যায় এবং এক ব্যক্তি যদি অপর প্রান্তে কর্ণ দিয়া অবস্থান করে তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি শব্দ অতি স্পষ্টরূপে শুনিতে পাইবে। কাষ্ঠ বায়ু অপেক্ষা সহজ পরিচালক।

কাষ্ঠের পলিচালক গুণ দ্বারা অনেক সময় তাহা দৃঢ় এবং সম্পূর্ণ শক্ত কিনা চিনিয়া লওয়া যায়। যদি মধ্যের কোন স্থান পচিয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে ঐ শব্দ শুনা যায় না।

১। শব্দ কি প্রকারে উৎপন্ন হয় তাহা আমরা বুঝিলাম। এক্ষণে কোন্ প্রকার শব্দকে সঙ্গীত বলা যায়, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

আমরা দেখিয়াছি যে, প্রত্যেক শব্দই, কোন একটি সময় ব্যাপিয়া কোন পদার্থের যে কম্পন তাহাকে বলে। (অনেক সময় যন্ত্র সাহায্যে এই কম্পন লব্ধ করা যায়)।

২। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমভাবের একরূপ কম্পন সঙ্গীত ধ্বনির উৎপাদক।

মনে কর কোন একটি পদার্থ হইতে এক সেকেণ্ডে ১০০ কম্পন উত্থিত হইতেছে। যদি এক সেকেণ্ডে ১০০ কম্পনের অর্দ্ধ সেকেণ্ডে ৫০টি, সিকি সেকেণ্ডে ২৫টি ইত্যাদি সমবিভাগে উৎপন্ন হয় তাহা হইলেই ঐ ধ্বনি সঙ্গীত-ধ্বনি, নতুবা নহে। যদি প্রথমার্ধ সেকেণ্ডে ৭০ ও পরার্ধে ৩০ ইত্যাদি অসংলগ্নভাবে কম্পন হয় তাহা হইলে মধুর সঙ্গীত ধ্বনি না হইয়া শ্রুতি কঠোর শব্দ উৎপাদিত হয়।

বাস্তবিক কোন্ ধ্বনি সঙ্গীত এবং কোন্ ধ্বনি সঙ্গীত নহে ইহা নিঃসংশয়ে নির্ণয় হইতে পারে না, কারণ দেখা যায় একটি সঙ্গীত ধ্বনি ক্রমে উচ্চ করিতে করিতে শেষে কর্কশ বোধ হয়। বিবিরা সচরাচর যে প্রকার উচ্চ গ্রামে গান করেন, তাহা বোধ হয় এতদ্দেশীয় অনেকের শ্রুতি কঠোর হয়। ঐ প্রকার অতি নিম্নস্বরও কর্কশ বলিয়া বোধ হয়। অপর দিকে কলিকাতার মস্তিষ্ক-বিলোড়নকারী লোক শকটাদি সমাগমে সমুত্থিত ভয়ানক শব্দ ও মনুমেণ্টের উপর হইতে এক প্রকার দূর সমাগত এবং পরস্পর মিশ্রিত হইয়া (Harmony) শ্রবণ সুখ উৎপাদন করে। সানাইয়ের শব্দ দূর এবং নিকট হইতে শুনিলেই ইহার স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে।

সঙ্গীত পরিমাপক

এই পৃথিবীতে আমাদের যাবতীয় জ্ঞান তুলনা দ্বারা উৎপাদিত হয়। "কাল" বলিলে আমরা যাহা কাল নহে তাহার সহিত প্রভেদ করি। "বাড়ী" "ঘর" বলিলেই উহাদের সহিত পৃথক পদার্থ সকলের জ্ঞান মনোমধ্যে উদিত হয়। এই প্রকার ১ মণ বলিলে সের প্রভৃতি মণ অপেক্ষা লঘুভার পদার্থ অগ্রে মনোমধ্যে আনয়ন করি। উচ্চ ধ্বনি বলিলে নীচ ধ্বনির সহিত তুলনায় ঐ জ্ঞান লাভ করি। ১ ক্রোশ বলিলে কোন একটি বিশেষ পরিমাণ হাত, গজ, ফুট ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের কত গুণ বোঝায় তাহা ভাবি। সেই

প্রকার সঙ্গীতেও নির্দিষ্ট পরিমাপক ব্যবহার হয়। যে প্রকার ঘণ্টা প্রভৃতির হিসাবের বেলায় মিনিট সেকেণ্ড ইত্যাদি কাল পরিমাপক সময়গুলি সকল দেশেই একভাবে ব্যবহৃত হয়, অস্মদ্দেশীয় সঙ্গীতে ঐরূপ হয় না। একটি নির্দিষ্ট স্বর হইতে আরম্ভ করিয়া তাহা হইতে ক্রমে উচ্চ অথবা নীচক্রমে গমন সকল দেশেই হইয়া থাকে। ঐ স্বরকে ইংরাজীতে Key note কহে। আমাদের দেশে ঐ 'কী নোট' একেবারে নির্দিষ্ট নাই। ঘণ্টা ধ্বনি প্রভৃতি যে কোন ধ্বনি হইতে আরম্ভ করিয়া সেই পরিমাণে উঠা ও নামা যায়। কিন্তু একবার যে ধ্বনিকে ভিত্তি ধ্বনি করিয়া লইব তাহা হইতে আর বিচলিত হইতে পারিব না। যেমন ৬০ সেকেণ্ডে মিনিট করিয়া লইয়া বরাবর আবদ্ধ থাকিতে হইবে, ৭০ সেকেণ্ডে মিনিট আবার করিলে চলিবে না। সেই প্রকার একটি স্বরকে ভিত্তি স্বর করিয়া তাহাতেই আবদ্ধ থাকিতে হইবে। ইহার ব্যত্যয় হইলেই প্রমাদ ঘটিবে।

স্বরগ্রাম (Gamot)

দুই পার্শ্বে দৃঢ় অর্থাৎ ধ্বনি উৎপাদন করে এই প্রকার একটি তার গ্রহণ কর। অথবা একটি সেতারের তারকে কান টিপিয়া শব্দ উৎপাদন যোগ্য কর। এই তারের কোন স্থানে অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া এক প্রকারে আঘাত করিলেই একটি ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইবে। দেখা যাইবে যে এক হস্ত দ্বারা ক্রমাগত আঘাত ও অপর হস্ত সেই স্থান হইতে সরাইয়া আনিতে আনিতে স্বর ক্রমশঃ উচ্চ হইতে থাকিবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যে কোন সঙ্গীত ধ্বনিকে আমরা স্বর ভিত্তি করিতে পারি। এ স্থলে প্রথম স্থানে অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া তারে আঘাত করিলে যে শব্দ শ্রুতিগোচর হইয়াছিল, তাহাকেই যদি আমরা Key note স্বর ভিত্তি মনে করি তাহা হইলে পূর্ব কথিত নিয়মমত আমরা উহা পরিত্যাগ করিতে পারিব না। এক্ষণে যদি অঙ্গুলি অবিচ্ছেদে অর্থাৎ ঘেঁষড়াইয়া তারের উপর চালনা করি এবং দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা ক্রমান্বয়ে আঘাত করিতে থাকি তাহা হইলে কিয়ৎকাল যদিও স্বর অল্প অল্প উচ্চ হইতে অর্থাৎ চড়িতে থাকিবে তথাপিও প্রথম স্বর হইতে ঐ উচ্চতার বৈলক্ষণ্য সহজে কর্ণ দ্বারা উপলব্ধি হইবে না। ইহার কারণ এই যে, স্বর এত অল্প অল্প করিয়া ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইয়া আসিবে যে

আমাদের কর্ণে তাহার ধারণা হইবে না। ক্রমে দেখা যাইবে যে, পূর্বোক্ত ভিত্তিস্বর এরূপ এক অবস্থায় উপস্থিত হইল যাহার উচ্চতা কর্ণদ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। ইহা দ্বিতীয় স্বর হইল। প্রথমোক্ত ভিত্তিস্বরকে "ষড়জ" কহে, ইহার সাঙ্গীতিক নাম "সা"। যে দ্বিতীয় স্বর আমরা প্রাপ্ত হইলাম তাহার নাম "ঋষভ", সাঙ্কেতিক নাম "ঋ"। ক্রমে দ্বিতীয় হইতে আরও উচ্চ স্বরে পূর্বোক্ত ক্রমে উপনীত হও। ক্রমে আর একটি নূতন স্বর পাওয়া গেল, ইহার নাম "গান্ধার"। ইহার সাঙ্কেতিক নাম "গা"। তৎপরে "মা"। আরও উচ্চে আর একটি স্বর পাওয়া যাইবে, ইহার নাম "পঞ্চম" সাঙ্কেতিক নাম "পা", এই প্রকার "ধৈবত" সাঙ্কেতিক নাম "ধা"। আর একটি ইহার উপরে পাওয়া যাইবে, ইহার নাম "নিষাদ" সাঙ্কেতিক নাম "নি"। এই প্রকার পর পর ক্রমশঃ সাতটি স্পষ্ট স্পষ্ট পৃথক স্বর পাওয়া যাইবে। যদি পূর্বোক্ত প্রণালীতে অঙ্গুলী টানিয়া এতদপেক্ষা উচ্চতর স্বর নির্গত করা যায় তাহা হইলে এইবার যে বিভিন্ন সুরে উপস্থিত হইবে, দেখা যাইবে যে তাহা যে ভিত্তি সুর অর্থাৎ "সা" হইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম ঠিক তাহাই, কেবল উচ্চ ও নীচের প্রভেদ। এবং তদুপরি উঠিলে আবার প্রথম প্রাপ্ত "ঋ" নামক সুর পাইব, কেবল প্রভেদ এই যে প্রথম "ঋ" টি নীচু এবং এটি উঁচু। এই প্রকারে যতই কেন সুরকে উচ্চ করি না ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্রমে আবার ঐ ৭টিতেই উপনীত হইবে, কেবল নিম্ন হইতে উচ্চ এবং তাহা হইতে আবার উচ্চ এবং তাহা হইতেও আবার উচ্চ এই প্রকার ঐ সাত সুরই পাইব। এই সাত সুরকে এক গ্রাম অথবা সপ্তক কহে।

নাম প্রকরণ

আধুনিক মনুষ্যের মধ্যে শিক্ষালব্ধ এবং কৃত্রিম ভাবের প্রাবল্যই অধিক। পুরাকালে প্রাকৃতিক ভাবে মানবহৃদয় পূর্ণ হইয়া থাকিত। উনবিংশ শতাব্দির কবিত্ব নীরস অথবা কষ্টকল্পিত কৃত্রিম ভাবের আলয়, প্রাথমিক মনুষ্যের সরল হৃদয় প্রকৃতির মধুময় রঙ্গভূমি। অনন্ত সাগরের অনন্ত বিস্তৃতি, অনন্ত নীলাকাশের বুদ্ধি প্রতিঘাতী প্রভা, নিবিড় অরণ্যের মহান স্তব্ধভাব, গিরি নির্ঝরের গম্ভীর হৃদয়-মত্তকারী ঝর্ঝর ধ্বনি, অভ্রভেদী পর্বতের শান্তিপূর্ণ

বিশাল বপু, নদীসকলের অর্ধস্ফুট সঙ্গীতধ্বনি, বন বিহঙ্গের হৃদয়ের অন্তস্থল স্পর্শকারী সঙ্গীত প্রাচীন মানবেরাই ভোগ করিত। আমরা শোভা দেখি, গান শুনিয়া আনন্দ প্রাপ্ত হই; অরণ্য আশ্রমী ফলমূলাহারী সরলপ্রাণ বৈদিক ঋষিদিগের বিশ্বব্যাপী হৃদয় কি তাহাতে শান্ত হয়? যে হৃদয় প্রচণ্ড বজ্রধ্বনি হইতে বর্ষার ভেকের ঘর্ঘর রবে নাচিয়া উঠিত, প্রকাণ্ড হিমাচলের চির শুভ্র শিখর হইতে ভ্রমরের গুঞ্জন এবং প্রাতঃকুন্দের বিকাশ পর্যন্ত যে প্রাণকে আত্মহারা করিত; তাহা কি ইহাতে সন্তুষ্ট হয়? আমরা সৌন্দর্য দেখি, তাঁহারা সৌন্দর্য পান করিতেন,—আমরা মধুর ধ্বনি শুদ্ধ শ্রবণ করি, ঋষির প্রাণ বিষ্ণুপদ নিঃস্যতা নির্মল সলিলা ভাগীরথীর ন্যায় আর্দ্র হইয়া সঙ্গীত তরঙ্গে মিশাইয়া যাইত। আমরা কেবল আনন্দ প্রাপ্ত হই, তাঁহারা আনন্দে বিচরণ করিতেন, আনন্দ পান ও ভোজন করিতেন এবং অস্থি মজ্জা মাংস স্থানে শরীরকে আনন্দময় করিয়া তুলিতেন। যাঁহাদের প্রাণে কবিত্ব, যাঁহাদের জীবন অলঙ্কার, যাঁহাদের কার্য ন্যায়, সেই পূজ্যপাদ ঋষিগণই এই সঙ্গীতের স্রষ্টা—স্রষ্টা বলিলে হয়ত ভুল হইবে, তাঁহারা আবিষ্কর্তা। এ দেব-দুর্লভ ধন মানুষে সৃষ্টি করিতে পারে না, এ মন্দাকিনী ধারা।

অনন্ত বিশ্ব যাঁহার কার্য, যাঁহার প্রতি ছন্দে গ্রহ নক্ষত্ররাজি ভ্রমণ করিতেছে, সেই দেবাদিদেব আদি কবি বিশ্বপতি কৃপা করিয়া কোন কোন পুণ্যবানের মস্তকে বর্ষণ করেন। ভারতের এই ভয়ঙ্কর মহাত্মশালী অতীতের স্মৃতিপূর্ণ পরিত্যক্ত এই বিশাল রঙ্গভূমির ত সেই সঙ্গীত একটি সর্বাঙ্গপূর্ণ সর্বাবয়ব সম্পন্ন অবিনশ্বর চিহ্ন। হইতে পারে আজি পাশ্চাত্যভূমি বিজ্ঞান চর্চায়, দর্শন চর্চায়, ন্যায় চর্চায়, জ্যোতিষ চর্চায়, গণিত চর্চায় ও ভৈষজ্য চর্চায় প্রাচীন ভারতকে দূর পরাহত করিয়াছে; কিন্তু ভারতের সঙ্গীত, তুমি শত সহস্র বিপ্লবের মধ্যে, লক্ষ পরিবর্তনের, ঘোর অবনতির, ঘোর দুর্গতির মধ্যে আত্মজ্যোতি বিকাশ করিয়া ধীর স্থির অথচ নিশ্চিন্ত গতিতে শত লাঞ্ছনা সহিয়া, শত বিঘ্ন বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া আপনার রাজ্য বিস্তার করিতেছ। সেই ঋষিগণই সঙ্গীতের আবিষ্কর্তা বলিয়া এই সকল কবিত্বপূর্ণ নাম এবং কবিত্বময় ভাবে সঙ্গীতের বর্ণনা করা হইয়াছে। ক্রমে আমরা দেখিব যে, তাঁহারা এই অতি দুরূহ বিজ্ঞানকে মধুময়ী কল্পনা সাহায্যে কি প্রকারে সর্বজন মনোরম করিয়াছেন। এক্ষণে যে সাতটি স্বর প্রথমে উক্ত হইয়াছে উহাদের নাম এবং তাহার উৎপত্তি বর্ণিত হইবে।

ষড়জ—ভ্রমরের গুঞ্জন হইতে এই স্বরের উৎপত্তি এবং তজ্জন্যই ঐ প্রকার নাম।

ঋষভ—ঋষভের ধ্বনি হইতে ইহার উৎপত্তি এবং তজ্জন্যই ঐ প্রকার নামকরণ হইয়াছে।

গান্ধার—ময়ূরের কেকা হইতে।

মধ্যম—ইহার নামকরণ বিষয়ে মতভেদ আছে। বোধহয় কয়টি স্বরের মধ্যস্থিত বলিয়া ইহার নাম ঐরূপ হইয়াছে।

পঞ্চম—কোকিল স্বর হইতে।

ধৈবত—কাহার মতে অশ্ব হইতে এবং কাহারও কাহারও মতে ভেক স্বর হইতে।

নিষাদ—গর্দভের ধ্বনি হইতে।

হয়ত এই সব সৌসাদৃশ্য কবি কল্পনা, বিশেষ জানিনা। কতকগুলি ভ্রমর একটি ষাঁড় ময়ুর গর্দভ ইত্যাদি পরস্পর দাঁড় করাইয়া তাহাদিগকে শব্দ করিতে দিলে এক গ্রাম নির্গত হয় কিনা, অথবা হয়ত কবিত্ব এবং গভীর মনঃসংযোগ সহকারে প্রাচীনেরা যাহা অনুভব করিতেন, আমরা তাহা করিতে অক্ষম।

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা স্থর কি তাহা বুঝিয়াছি; সচরাচর সঙ্গীতে তিন গ্রাম ব্যবহৃত হয়।

প্রথম—উদারা

যে স্বরকে আমরা ভিত্তি স্বর করিব তাহা হইতে ক্রমে নিম্ন ক্রমে নি ধ প ম গ ঋ সা এই সপ্ত সুরকে উদারা গ্রাম কহে। ইহা উচ্চারণ কালীন পেটে অধিক জোর লাগে।

দ্বিতীয়—মুদারা

ভিত্তিস্বর হইতে ক্রমে উচ্চ করিয়া সা ঋ গ ম প ধ নি এই উচ্চস্বরকে মুদারা গ্রাম কহে। ইহা উচ্চারণ করিতে বক্ষে অধিক জোর লাগে।

তৃতীয়—তারা

মুদারা গ্রামের সর্বোচ্চ স্বর অর্থাৎ নি হইতে আরও উচ্চ করিয়া সা ঋ গ ম প ধ নি সাত সুরকে তারা গ্রাম কহে। ইহা উচ্চারণ করিতে মস্তকে অধিক জোর লাগে। এই তিন গ্রামকে নাভি, বুকি ও শিরি কহে।

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে কোন দুই স্বরের মধ্যে যে ব্যবধান তাহা স্পষ্ট প্রতিলক্ষ্য হয় না। কিন্তু অভিজ্ঞদিগের নিকট প্রত্যেক সূক্ষ্ম সুরগুলি না হউক কতকগুলি হয়। শাস্ত্রকারেরা এক সপ্তকের অর্থাৎ সা হইতে আরম্ভ করিয়া নি পর্য্যন্ত সপ্তসুরের মধ্যে যে সমস্ত ব্যবধান তাহাকে অখণ্ড ধরিয়া একবিংশ ভাগ করিয়াছেন। অর্থাৎ সচরাচর যে প্রকার এক গ্রামের মধ্যে প্রধান সাতটি সুরও কতক কোমল সুর ভিন্ন সহজে চিনিতে পারা যায় না, অতি সুশিক্ষিত কর্ণে তদপেক্ষা অনেক অধিক তারতম্য বোধ হইয়া থাকে। সমস্ত গ্রামের মধ্যে একবিংশতি ভাগ উপলব্ধ হইয়াছে। এই এক একটি ভাগের নাম শ্রুতি।

কোমল সুর

এই শ্রুতিগুলির মধ্যে কতকগুলি সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে যেগুলি তদপেক্ষা উচ্চ শুদ্ধ সুরের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় তাহাদিগের নাম কোমল সুর।

তীব্র অথবা কড়ি

যেগুলি কোন নিম্ন শুদ্ধ সুরের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় তাহাদিগের নাম তীব্র বা কড়ি সুর।

নিম্নলিখিত সুর সকল কোমল ব্যবহৃত হয়, যথা—ঋ, গ, ধ, নি। কেবল মধ্যম তীব্র ব্যবহার হয় অর্থাৎ কোমল পঞ্চম। ইহার নাম কড়ি মধ্যম।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে এক সপ্তক পার হইলেই পুনর্বার সেই সপ্তক পদে ফিরিয়া আইসে। যথা সা হইতে আরম্ভ করিয়া নিষাদে উপনীত হইলে পুনর্বার সা আসিয়া উপস্থিত হইবে। অন্য সুর কেন হইল না? ইহার কারণ বিবৃত হইতেছে। ইহা বুঝিতে গেলে প্রথম (হারমণি) স্বর সংযোগ কাহাকে বলে বুঝা উচিত।

এক বা তদধিক স্বরের এক বা তদধিক স্বরের সহিত মিশ্রণের নাম হারমণি। বিভিন্ন স্বর সকল মিশ্রিত হইয়া নূতন একটি স্বর উৎপাদন করিলে তাহাকে হারমণি বলে।

পূর্বে বলা হইয়াছে, সকল প্রকার স্বরই কম্পন হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই কম্পনের ত্রিবিধ ক্রিয়া উপস্থিত হয়।

১। মন্দ কম্পন—যদি কম্পন আস্তে আস্তে হয় তাহা হইলে আওয়াজের বিস্তৃতি অধিক হয় যাহাকে বাজখাই বলা যায় সেই প্রকার গভীর।

তাহাদের গলায় কম্পন অধিক হয়না এই জন্য আওয়াজের বিস্তৃতি অনেক অধিক।

২। ঐ এক প্রকার কম্পন যদ্দ্বারা আওয়াজ দূরে শুনা যায়। প্রথম প্রকার আওয়াজ অতি ভরাট হইলেও এবং নিকটে অতি পূর্ণ বোধ হইলেও দূরগামী হয় না।

৩। ক্ষিপ্র কম্পন—অতি শীঘ্র শীঘ্র কম্পিত হইলে আওয়াজ অতি উচ্চ হয়, এবং দূরগামী হয়, কিন্তু বিস্তৃতি কমিয়া আইসে। যেমন স্ত্রী কণ্ঠ।

মনে করুন একটি যন্ত্র অথবা কণ্ঠ হইতে একটি ১০০ কম্পনের ধ্বনি নির্গত হইতেছে, যদি আর একটি যন্ত্রে অথবা কণ্ঠে ঐ প্রকার ঠিক ১০০ কম্পনের একটি ধ্বনি নির্গত হয় তাহা হইলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই দুইটি শব্দ এক হইবে। কিন্তু যদি একটি ১০০ আর একটি ৭০ হয় তাহা হইলে কতক কতক মিলিবে। কিন্তু যদি ৫০ হয় তাহা হইলেও প্রায় সম্পূর্ণ মিলিবে। ইহার কারণ এই যে একটি সংখ্যা যেমন দুই, উহাকে দুই গুণ করুন ৪ হইল। এই ৪টি কি? সেই দুই কেবল দুইবার। ঐ প্রকার তিনগুণ করুন ৮ হইল। এই ৮টি কি? সেই দুই কেবল একবার না হইয়া তিনবার হইল। সেই প্রকার যেমন একটি দুই আর একটি দুইয়ে কোন প্রভেদ নাই কিন্তু ৪ প্রভৃতির সঙ্গে কেবল গুণের প্রভেদ।

সেই প্রকার ১০০ কম্পন উত্থিত শব্দ ও ১০০ কম্পনোত্থিত ৩ শব্দে কোন প্রভেদ নাই এবং ৫০ কম্পনোত্থিত শব্দের সঙ্গে কেবল গুণের প্রভেদ। আমরা একটির ১০০ ও আর একটি ৫০ কম্পন দ্বারা প্রস্তুত শব্দ এক বলিয়া চিনিয়া লই কেবল উচ্চ ও নীচ এই প্রভেদ থাকে। এইজন্য যতই চড়াই না কেন এক সপ্তক ভিন্ন আর স্বর পাওয়া যায় না।

আরোহ ও অবরোহ ক্রম

একটি স্বরকে ভিত্তি করিয়া ক্রমে ক্রমে উঠিয়া যাওয়ার নাম আরোহক্রম ও ক্রমে ক্রমে নামিয়া আসার অবরোহ ক্রম।

গমক ও মূর্ছনা—একটি সুরের উপর স্থায়ী হইয়া তাহাকে কম্পন করাকে গমক কহে। কোন সুর হইতে অবিচ্ছেদে আর এক সুরে গমনের নাম মূর্ছনা।

গিট্‌কিরি—দ্রুতবেগে বিচ্ছেদ ক্রমে কোন স্বর হইতে আরোহী অবরোহী অথবা দুইটি ক্রমকে মিশাইয়া কতকগুলি স্বর দেখাইবার নাম গিটকিরি।

যন্ত্র বাঁধিবার নিয়ম

তম্বুরা—এই যন্ত্র গান করিবার সর্বাপেক্ষা উপযোগী।

ইহা বাম হস্তের দিক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম তারটি পঞ্চম তাহার পর মধ্যের দুইটিকে স্বর এবং তাহার পরটিকে নিম্নের স্বর করিতে হইবে।

প্রথমে মধ্যের দুইটি তার বাঁধা উচিত; পূর্বে বলা হইয়াছে যে, কোন্ স্বরকে ভিক্তি করিতে হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। অতএব মধ্যের দুইটিকে যে কোন প্রকারে ইচ্ছা বাঁধিতে পারা যায়।

দুইটিই এক হওয়া চাই অর্থাৎ দুইটি হইতেই সম্পূর্ণ হারমণি (Harmony) নির্গত হওয়া চাই। কিন্তু একবার ভিত্তি অবলম্বন করিলে তাহা হইতে সরিয়া যাওয়া যাইতে পারে না। এইজন্য প্রথম তারটি যাহাকে পঞ্চম করিতে হইবে এই মুল স্বরের নিম্নের গ্রামের পঞ্চম করা উচিত। সর্বশেষ তারটি এই দুইটি মূল স্বর যে গ্রামের সেই গ্রামের নিম্ন গ্রামের সা অর্থাৎ পঞ্চমটি যে মূল স্বরের পঞ্চম সেই স্বর করিতে হইবে! অর্থাৎ ইহার সহিত তম্বুরার মধ্য তার স্বরের যেন ঠিক অর্ধ হারমণি হয়।

সেতার—সেতারে প্রধানত ৫টি তার থাকে। দুইটি তম্বুরার ন্যায় জুড়ির অর্থাৎ মূল স্বরের তার। যেটি বাজাইবার তার সেটিকে এই মূল স্বরের উপরিস্থ গ্রামের মধ্যম করিয়া বাঁধিতে হয়। জুড়িদ্বয়ের অপর পার্শ্বে আর একটি তার থাকে সেইটিকে উপরি গ্রামের পঞ্চম করিতে হইবে ও অবশিষ্টকে তম্বুরার ন্যায় জুড়ির নিম্ন গ্রামের স্বর করিতে হইবে। সেতার যন্ত্রে সাধারণত ১৫খানি পরদা থাকে ঐ সকল পরদায় যথাক্রমে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া বাজাইতে হয়।

এস্‌রাজ—ইহা প্রায় সেতারের অনুরূপ, বাঁধিবার প্রণালীও ঐরূপ; কেবল অধিকের মধ্যে তরফ অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী কতকগুলি তার থাকে। অন্যান্য সমস্ত সেতারের ন্যায় বাঁধিতে হয় কেবল তরফ বাঁধিবার নিয়ম স্বতন্ত্র।

কেহ কেহ তরফের তারগুলিকে সা হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর বাঁধিয়া যান। কিন্তু এতদপেক্ষা আর এক প্রকার বাঁধিবার নিয়ম আছে যাহা

অপেক্ষাকৃত একটু কঠিন হইলেও বাজনার অত্যন্ত উপযোগী। নিয়মটি এই ; যে রাগ অথবা রাগিণী গীত হইবে সেই সেই রাগ অথবা রাগিণীতে যে যে স্বরের প্রয়োজন তরফগুলি ঠিক সেই সেই স্বরে বাঁধিতে হইবে। তরফ থাকিবার অর্থ এই যে, তদ্দ্বারা বহু সংখ্যক সুরের হারমণি পাওয়া যায়। যদি একটি স্বরে একটি তম্বুরা একটি সেতার ও একটি মৃদঙ্গ এক সুরে বাঁধা থাকে তাহা হইলে মৃদঙ্গে আঘাত করিলেই অন্য যন্ত্রগুলি সঙ্গে সঙ্গে বাজিয়া উঠিবে। সেই নিয়মাধীনভাবে ছড়ি পড়িবামাত্র সমস্ত তরফের তারগুলি হইতে অতি অল্প অল্প সুর নিঃসৃত হইয়া একটি হারমণি হইবে। যদি যে রাগ গীত অথবা বাদিত হইতেছে সেই অনুযায়ী তরফ বাঁধা হয় তাহা হইলে ঐ রাগের উপযোগী হারমণি নিঃসৃত হইয়া তাহাকে অধিক মনোরম করিবে।

বেহালা—এটি আমাদের দেশীয় যন্ত্র নহে, ইহার জন্মস্থান ইটালি। এতদ্দেশে ইহা পোর্তুগীজদিগের দ্বারা আনীত হয়।

ইহা তাঁতের উপর ছড়ির দ্বারা বাদিত হয়। ইহাতে চারিটি তাঁত থাকে। দক্ষিণ দিক হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয়টিকে সুর করিতে হয়। প্রথমটি তাহার উচ্চ গ্রামের পঞ্চম এবং তাঁহার পরেরটিকে নিম্ন গ্রামের নিষাদ এবং তাহার পরেরটিকে নিম্ন গ্রামের মধ্যম করিতে হয়।

ইহাতে কোন পরদা লাগান নাই। অঙ্গুলি দ্বারা অনুমান করিয়া সুর অবধারণ করিয়া লইতে হয়।

চর্মযন্ত্র

মৃদঙ্গ—ইহাই অতি প্রাচীন কালের বাদ্যযন্ত্র। ধ্রুপদ নামক গানের অঙ্গবিশেষের সহিত ইহা বাদিত হইয়া থাকে। চর্মবাদ্যের মধ্যে সংস্কৃত গ্রন্থে ইহারই উল্লেখ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়, যথা ;—

"সঙ্গীতায় প্রসৃতস্বরজা স্নিগ্ধ গম্ভীরঘোষম্।" কালিদাস। কথিত আছে, শিব যখন ব্রহ্মনামে উন্মত্ত হইয়া নাচিতেন তখন গণপতি এই যন্ত্র বাজাইতেন।

মৃদঙ্গের দুই দিক বাজাইতে হয়। যে দিক দক্ষিণ হস্তের দ্বারা বাজাইতে হয় তাহাতে গাব্ দেওয়া থাকে। অপর দিকে শুদ্ধ একটি চর্মাবরণ থাকে। এই চর্মাবরণের উপর ময়দা আটা লাগাইয়া দিতে হয় এবং বাদ্যান্তে তুলিয়া ফেলিতে হয়। মৃদঙ্গের দক্ষিণ দিক কেবল বাঁধিতে হয়। মৃদঙ্গের মধ্যে মধ্যে চর্ম নির্মিত সূত্রের দ্বারা আবদ্ধ ঐ সকল সূত্রের মধ্যে মধ্যে আটটি

কাষ্ঠ খণ্ড থাকে তাহাদিগকে গাঁট্টা কহে। এই সকল চর্ম সূত্রের মধ্যে মৃদঙ্গের চর্মের উপর যে ব্যবধান সকল আছে তাহাদিগকে ঘাট কহে। ঐ সকল একটি একটি করিয়া হাতুড়ির আঘাতে উচ্চ বা নীচ করিয়া কোন তম্বুরা প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে বাঁধিতে হয়। যতক্ষণ সমস্ত ঘাটগুলি সমস্বর ও তম্বুরা প্রভৃতির সঙ্গে এক না হয় ততক্ষণ মৃদঙ্গ হইতে এক প্রকার ঝাঁজি শব্দ নির্গত হয়। সমস্বর হওয়া ইহার প্রমাণ। এই প্রকারে দক্ষিণ দিক ঠিক হইয়া গেলে বাম দিকে ময়দা লাগাইতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত তম্বুরা হইতে নিম্ন পঞ্চম অথবা ষড়জ না নির্গত হয় ততক্ষণ লাগান উচিত। বাস্তবিক উপযুক্ত প্রকারে স্বর বাঁধা হইলে মৃদঙ্গ হইতে অতি শ্রুতিমধুর অথচ গম্ভীর ধ্বনি নির্গত হয়।

তবলা ও বামা—যে প্রকার বীণা হইতে সেতার, এস্‌রাজ প্রভৃতির সৃষ্টি সেই প্রকার মৃদঙ্গ হইতে তবলা ও বামার সৃষ্টি। তবলা ও বামা দেখিলেই বোধ হয় যেন একটি মৃদঙ্গকে কাটিয়া দুই খণ্ড করা হইয়াছে। কেবল মৃদঙ্গের বাম দিকে প্রতিবারে আঠা লাগাইতে হয়। বামায় একেবারে গাব দেওয়া থাকে। ধ্রুপদ নামক গানের অঙ্গবিশেষের সহিত মৃদঙ্গের বাদ্য হয়। অন্যবিধ গীতের সহিত তবলা বাজান যায়। মৃদঙ্গের ধ্বনি অতি গম্ভীর, তবলা অপেক্ষাকৃত লঘু। মৃদঙ্গে সমস্ত হস্ততল প্রয়োগে বাদ্য উত্থাপিত হয় তবলায় হস্ত তলের এক ভাগ মাত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

বাঁধিবার নিয়ম. মৃদঙ্গের যেরূপ তবলারও সেইরূপ। বিশেষ এই যে তবলার আয়তন ক্ষুদ্র বলিয়া অতি উচ্চ স্বরে বাধা যায়। এবং যে সকল গীতের সহিত উহার বাদ্য হয় তাহারাও অতি উচ্চ স্বরে গীত হইয়া থাকে।

গীত

পূর্বে যে স্বরগ্রামের উল্লেখ করা হইয়াছে, আমরা দেখিয়াছি তাহারা সচরাচর তিন গ্রামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে উদারা নামক গ্রামের মধ্যম হইতে আরম্ভ করিয়া তারা গ্রামের পঞ্চম পর্যন্ত সচরাচর ব্যবহৃত আছে। পুরুষের কণ্ঠে মুদারা গ্রামের সকল স্বর উদারার সকল এবং তারার কতকগুলি সহজে উচ্চারিত হয়। স্ত্রীকণ্ঠে মুদারা সমস্ত তারা সমস্ত এবং উদারার কতকগুলি উচ্চারিত হয়।

পূর্বোক্ত সা ঋ গ ম প্রভৃতি সপ্তস্বর, কোমল এবং কড়ি স্বর ও গমক,

মূর্ছনা, গিট্‌কিরি ও ভূষিকা গ্রামত্রয় বিভাগানুসারে প্রযুক্ত হইয়া সঙ্গীত উৎপাদন করে।

মনে করুন তিনটি সুর আছে, যথা—সা ঋ গ। এক এক সেকেণ্ড অন্তর এক একটিকে উচ্চারণ করিতেছেন অর্থাৎ সমানভাবে সা ঋ গ তিন সেকেণ্ডে উচ্চারিত হইতেছে। দেখা যাইবে যে ইহা দ্বারা একটি একটি সঙ্গীত পদ প্রস্তুত হইল, যদি ঐ তিনটি সুর স্থানে তিনটি অক্ষর সংযোগ করা যায় তাহা হইলে একটি গীতাংশ হইল। আবার ঐ গীতাংশ সা ঋ গ এই ক্রমে উচ্চারণ না করিয়া ঋ সা গ এই ক্রমে উচ্চারণ করা যায়। আবার গ সা ঋ এই ক্রমে হয়। এই প্রকার ঋ গ সা, গ ঋ সা, সা গ ঋ প্রকারও করা যায়। স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে প্রত্যেক বারেই এক একটি নূতন গীতাংশ উৎপন্ন হইতেছে। এতক্ষণ কেবল আমরা সুরকেই পরিবর্তন করিতেছিলাম, সময়কে করি নাই, অর্থাৎ সুর তিনটিকেই কেবল আগু পাছু করিয়া উচ্চারণ করিতেছিলাম। সময় সেই এক এক সেকেণ্ড অন্তর রহিয়াছে অর্থাৎ প্রত্যেক বারেই তিনটি সুর এক এক সেকেণ্ড অন্তর উচ্চারিত হইতেছে। কিন্তু যদি আমরা সময়কে ঐ প্রকার পরিবর্তন করি, যেমন সা হইতে ঋ দুই সেকেণ্ডে উচ্চারণ করিয়া ঋ হতে গ এক সেকেণ্ডে সমাধান করি এবং পূর্বের ন্যায় এবার সময়ের পরিবর্তন করি তাহা হইলে কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন গীত খণ্ড উৎপন্ন হইবে।

গীত সম্বন্ধে যতটুকু এখানে আবশ্যক বলা গেল, পরে বিস্তার করা যাইবে। এক্ষণে তাল সম্বন্ধে এস্থলে যতটুকু জানার আবশ্যক বলা যাইতেছে। পরে উহারও বিস্তার করা হইবে।

তাল

তাল না হইলে সঙ্গীত একেবারে অসম্ভব। কম্পন হইতে সুরের উৎপত্তি। কিন্তু ঐ কম্পন কোন একটি সময় ব্যাপিয়া হইতেই হইবে, ঐ সময় হইতেই তালের উৎপত্তি। তালের পরিমাপক আছে তাহাদিগকে মাত্রা কহে। ঐ মাত্রার অবস্থিতির বিষয়ে কোন নিয়ম নাই। উহা অর্ধ সেকেণ্ডও হইতে পারে অর্ধ ঘণ্টাও হইতে পারে। কিন্তু একবার স্থির হইলে সমস্ত গান ঐ মাত্রা হইতে বিচ্যুত হইতে পারিবেনা। যে প্রকার পূর্বে গীত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে আমরা কোন শব্দকে মূল শব্দ করিতে পারি কিন্তু একবার

তাহা স্থির হইলে আর তাহা হইতে বিচ্যুত হইতে পারিব না। ঐ সকল মাত্রার সমষ্টির নাম তাল। এক অথবা কয়েকটি স্বর অর্ধ এক ইত্যাদি সংখ্যক মাত্রায় উচ্চারিত হইয়া সঙ্গীত উৎপাদন করে। সচরাচর অতি অল্প সময়কেই মাত্রা করা হয়। এই জন্য বারম্বার ঐ অল্প সময় নিরূপণ করা দুরূহ বলিয়া তালের সৃষ্টি হইয়াছে। মনে করুন একটি গানে ১০০ মাত্রা ব্যবহৃত হইল। এক্ষণে প্রত্যেকবার ঐ মাত্রা মনে করিয়া রাখা অতি সুকঠিন ; এইজন্য এক দুই আড়াই তিন ইত্যাদি সংখ্যক মাত্রা জড়াইয়া এক একটি তালের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা দ্বারা সংখ্যার হ্রাস হওয়াতে মনে করিয়া রাখিবার অনেক সুবিধা হয়। অধিকন্তু আমাদের প্রতিবার সম নামক মাত্রায় গীতের বিরাম হইবার যে নিয়ম আছে তজ্জন্য মাত্রা অপেক্ষা তাল গণনা অধিক উপযোগী। সম কাহাকে বলে এবং গানের বিরামই বা কি তাহা পরে সবিশেষ বর্ণিত হইবে। এইরূপে আমরা দেখিলাম যে কোন একটি সময় ব্যাপিয়া কতকগুলি কম্পন হইতে গীতধ্বনি উত্থিত হয়। কতকগুলি গীতধ্বনি কয়েকটি সময় জ্ঞাপক মাত্রায় উচ্চারিত হইলে সঙ্গীতাংশ হয়। ঐ সময় এবং স্বরের ক্রম ক্রমশঃ পরিবর্তিত করিয়া প্রায় অসংখ্য গীতখণ্ড উৎপাদিত করিতে পারে।

রাগ ও রাগিণী

পূর্বে বলা হইয়াছে যে কতকগুলি স্বর গমক, মূর্ছনা ও গিট্‌কারি সংযোগী আরোহী অবরোহী ইত্যাদি ক্রমে বিন্যস্ত হইয়া এক একটি রাগ রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থাৎ কোন একটি বিশেষ রাগে যে সকল স্বর প্রযুক্ত হয় ঐ সকল স্বর বিবিধ প্রকারে বিন্যস্ত হইয়া রাগ উৎপাদন করে। রাগ এবং রাগিণী তিনভাগে বিভক্ত, যথা—ওড়ব, খাড়ব এবং সম্পূর্ণ। যে সকল রাগে ৭টি স্বরই ব্যবহৃত হয় তাহারা সম্পূর্ণ, যাহাতে ৬টি তাহারা খাড়ব, যাহাতে ৫টি ব্যবহৃত হয় তাহারা ওড়ব। মনে করুন একটি সম্পূর্ণ রাগ যথা ভৈরব। ইহাতে ৭টি স্বরই প্রযুক্ত হয়। এক্ষণে এই ৭টি স্বর আমরা অঙ্কশাস্ত্র দ্বারা জানি যে ৭ রকম করিয়া সাজান যাইতে পারে। ঐ প্রকার আর অনেক প্রকার তাল আছে প্রত্যেক তালেই ঐরূপ হইলে সর্বশুদ্ধ এত অধিক হয় যে, একজন লোক একটি রাগ সম্পূর্ণ করিয়া একটি জীবন শেষ করিতে পারেনা।

শাস্ত্রকারেরা রাগ সকলকে পুরুষ কল্পনা করিয়া রাগিণী সকলকে তাহাদের স্ত্রী কল্পনা করিয়াছেন। সাধারণতঃ ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী লোকে বলিয়া থাকে। কিন্তু এ বিষয়েতেও অনেক মতভেদ আছে। সচরাচর এই কয়টিকেই রাগ বলিয়া উল্লেখ করা হয়। যথা ;—ভৈরব, শ্রী, মালকোষ, বসন্ত, মেঘ, নটনারায়ণ। শাস্ত্রকারেরা রাগ রাগিণী সকলকে আবার সময় বিশেষ ও কাল বিশেষে গেয় করিয়াছেন। বর্ষাকালে মল্লারাদি রাগিণী ভাল লাগে, বসন্তে বাহার বসন্ত ইত্যাদি যে সকল কথা আছে তাহার বিপক্ষে অনেকে বলেন যে কেবল অভ্যাস বশতঃ অর্থাৎ ঐ ঐ সময়ে ঐ ঐ রাগ রাগিণী শুনিয়া শুনিয়া অভ্যাস হইয়া গিয়াছে বলিয়া ভাল লাগে,—কালে ও রাগে কোন বিশেষত্ব নাই। কিন্তু আমাদিগের বোধ হয় যে, ঐ প্রকার স্পষ্টই দেখা যায় জলবায়ুর নৈসর্গিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনের ভাবের পরিবর্তন হয় এবং মনের ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি স্বর ভাল লাগে। তদ্দারা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ঐ প্রকার রাগ রাগিণী বিভাগ অতি প্রকৃতি-সঙ্গত ও স্বাভাবিক। আধুনিক সকল গানে যে ঐ সকল ভাব উপস্থিত করাইতে পারেনা তাহার অনেক কারণ দেখা যাইতে পারে। হয়ত প্রথমতঃ রাগ রাগিণী শুদ্ধ ভাবে গীত হয় না। দ্বিতীয়ত, যে সকল রাগিণ্যাদিতে যে সকল ভাব প্রকাশ হওয়া উচিত তাহার সম্পূর্ণ বিপর্যয় হইতেছে ; যেমন একটি আদিরসের রাগিণী, ইহাতে একটি করুণরসের গীত রচিত হইল। সচরাচর যে সকল রাগ রাগিণী দিবা রজনীর যে যে সময় গীত হওয়া উচিত তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রভাতে—ভৈরব, ললিত, যোগিঞা, আশা, বিভাস, তোড়ি, ভৈরবী, আলাইয়া, বাঙ্গালী, বেলাবলী ইত্যাদি।

মধ্যাহ্নে—সারঙ্গ, গৌড়সারঙ্গ ইত্যাদি।

বৈকালে—মূলতানি, ভীমপলশ্রী, বারোয়াঁ, পিলু ইত্যাদি।

অপরাহ্নে—শ্রী, পুরবী, গৌরী, পূর্বা ইত্যাদি।

প্রথম রাত্রে—ইমন কল্যাণ, কেদার, হাম্বির, বাগেশ্রী, কানাড়া ইত্যাদি।

অধিক রাত্রে—বাহার, বসন্ত, বেহাগ ইত্যাদি।

তাল—পূর্বে যে প্রকার স্বর সংযোগ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে তাল সম্বন্ধেও অনেকটা ঐরূপ নিয়ম। যে প্রকার স্বরের মূল শ্রুতি সেই প্রকার তালের মূল মাত্রা। ঐ সকল মাত্রা একত্রিত করিয়া তালের সৃষ্টি হইয়াছে। কোন

তালে হয়ত চারি কোন তালে হয়ত ছয় ইত্যাদি মাত্রার ব্যবহার হয়। এই জন্যই মাত্রার নিয়ম একপ্রকার হইলেও অর্থাৎ সকল তালেই এক ওজনের মাত্রা ব্যবহৃত হইলেও তাহাদের মধ্যে প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

চর্ম যন্ত্রের অঙ্গ বিশেষ হইতে উত্থিত শব্দ সকলকে ধা, ধিন্, তা, কেটে, তেটে, থুন্, ঘেড়ে, নাক্, গদি, ঘেনে ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

[তারপর লেখক ভিন্ন ভিন্ন তালের ঠেকা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন এবং এক একটি তালের রূপ ও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে তাদের পরিচয় দিয়েছেন।

এইভাবে কাওয়ালি, একতাল, চৌতাল, ঝাঁপতাল, সুর ফাকতা, ধামাল, তেওরী, মধ্যমান, আড়াঠেকা, ঠুংরী, তিওট ইত্যাদি তালের বিষয়ে গ্রন্থকার আলোচনা করেছেন। তারপর তিনি কণ্ঠসাধনার প্রণালী বিষয়ে নিম্নলিখিত নির্দেশ দিয়েছেন।—বর্তমান লেখক]

স্বর সাধনা

১। একটি তানপুরা লইয়া পূর্বোক্ত প্রণালীতে বন্ধন কর। ইহার মধ্যের দুই তার মুদারা গ্রামের সা হইল। দক্ষিণ দিকের শেষটি উদারা গ্রামের সা হইল এবং বামে প্রথমটি উদারার পঞ্চম।

২। মধ্যের দুইটির সহিত স্বর ঐক্য অর্থাৎ সমসংখ্যক কম্পন বিনির্গত করিবার চেষ্টা কর। ইহাই সা, এইরূপে ঋ গ ম প ধ নি নির্গত কর।

৩। নিম্নের লিপি অনুযায়ী স্বর সাধন কর।

	॥ ॥	॥ ॥	॥ ॥	॥ ॥	॥ ॥	॥ ॥	॥ ॥	॥ ॥
(১)	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	সা

এক এক সুর বহির্গত করিয়া চারি চারি মাত্রা তাহাতে সমান রাখ, পরে অন্য একটি বাহির কর অর্থাৎ সা বলিয়া হাতে সমান তাল এক এক সেকেণ্ড ওজনের চারিবার দাও এবং তাহার পর ঋ উচ্চারণ কর। ইহাকেও পূর্বের ন্যায় চারি সেকেণ্ড স্থায়ী কর এবং তাহার পর গ উচ্চারণ কর। এই প্রকারে মুদারার সমস্ত সপ্তক এবং তারার সা পর্যন্ত আট সুর বার বার উচ্চারণ কর। এই প্রকার নিম্নের অর্থাৎ উদারা গ্রামের সমস্ত সুর উচ্চারণ কর এবং উপরের অর্থাৎ তারা গ্রামের যতদূর পার অন্ততঃ মধ্যম পর্যন্ত বারম্বার উচ্চারণ কর।

সাবধান যেন শব্দ অনুনাসিক না হইয়া পড়ে। যতদূর সাধ্য পূর্ণ কণ্ঠে উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করিবে এবং কোন প্রকার অঙ্গভঙ্গী অর্থাৎ বিকৃত মুখব্যাদনাদি না হয়।

ইহা কতক অভ্যাস হইলে নিম্নলিখিত লিপিগুলি পর পর অনুসরণ কর।

২। { ॥ | ॥ | ॥ | ॥ | ॥ | ॥ | ॥ | ॥ |
{ স | ঋ | গ | ম | প | ধ | নি | র্সা |

এক একটি সুর দুই দুই মাত্রা কাল উচ্চারণ করিতে হইবে।

৩। { । | । | । | । | । | । | । | । | }
{ সা | ঋ | গ | ম | প | ধ | নি | র্সা | }

এক একটি সুর এক এক মাত্রায় উচ্চারণ করিতে হইবে।

৪। { ॥ | ॥ | ॥ | ॥ | ॥ | ॥ | ॥ | ॥ }
{ সা ঋ গ ম প ধ নি র্সা র্সা নি ধ প ম গ ঋ স }

সা দুই মাত্রা কাল উচ্চারণ করিয়া ঋ এক মাত্রা, তাহার পর গ দুই মাত্রা কাল ও ম এক মাত্রা, এইরূপে সা পর্যন্ত। পুনর্বার এই তারের সা দুই মাত্রা কাল উচ্চারণ করিয়া নি ১ মাত্রা কাল। পরে ধ দুই মাত্রা, প এক মাত্রা কাল। ইহার নাম অনুলোম বিলোম, অর্থাৎ একবার সা হইতে আর এক সা-তে উঠিয়া তথা হইতে পুনর্বার সা-তে নামিয়া আসিতেছে।

। । । । । । । ।
৫। সাঋ গম পধ নির্সা র্সানি ধপ মগ ঋসা

এক মাত্রার মধ্যে সা ঋ দুই সুর উচ্চারণ কর। ঐ গম পধ ইত্যাদি। আবার নামিয়া আইস।

। । । । ।
৬। সাঋগ মপধ নির্সানি ধপম গঋসা

তিনটি করিয়া সুর অনুলোম বিলোম ক্রমে এক এক মাত্রার মধ্যে উচ্চারণ কর।

। । । ।
৭। সাঋগম পধনির্সা র্সানিধপ মগঋস

। । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥
৮। স ঋ গ ঋ গ ম গ ম প ম প ধ প ধ নি ধ নি র্সা

। । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥
র্সানি ধা নিধপ ধ প ম প মগ মগঋ গঋস

| | | | ‖ | | | | ‖ | | | | ‖ | | | | ‖
৯। সা ঋ   স ঋ গ   ঋ গ   ঋ গ ম   গ ম   গ ম প   ম প   ম প ধ

| | | | ‖ | | | | ‖ | | | | ‖ | | | | ‖
প ধ   প ধ নি   ধ নি   ধ নি সা   স নি   স নি ধ   নি ধ   নি ধ প

| | | | ‖ | | | | ‖ | | | | ‖ | | | | ‖
ধ প   ধ প ম   প ম   প ম গ   ম গ   ম গ ঋ   গ ঋ   গ ঋ স

| | | | ‖ | | | | | | ‖ | | | |
১০। স ঋ গ ঋ স   স ঋ গ ম গ ঋ স   স ঋ গ ম

| | | | ‖ | | | | | | | | | | ‖
প ম গ ঋ স   স ঋ গ ম প ধ প ম গ ঋ স

| | | | | | | | | | | | | | ‖
সা ঋ গ ম প ধ নি ধ প ম গ ঋ সা

| | | | | | | | | | | | | | | ‖
সা ঋ গ ম   প ধ নি সা   সা নি ধ প   ম গ ধা স

| ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖
১১। স ঋ   সা গ   সা ম   সা প   সা ধ   সা নি   সা সা (তারা)

| ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖
সা নি   সা ধ   সা প   সা ম   সা গ   স ঋ   সা সা (মুদারা)

১২। কোমল সুর সুরের নামের উপর চিহ্ন দ্বারা নির্দিষ্ট হইল।

‖   ‖   ‖   ‖   ‖   ‖   ‖   ‖
স   ঋ   গ   ম   প   ধ   নি   সা

‖   ‖   ‖   ‖   ‖   ‖   ‖   ‖
সা   নি   ধ   প   ম   গ   ঋ   সা

‖ ‖ | | | | | ‖ |
১৩। সা   ঋ   গম   প   ধ   নি   সা

‖ ‖ | ‖   ‖ |
সা   নি   ধ   প   ম গ ঋ সা

এই প্রকারে সম আরোহী এবং অবরোহী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে মাত্রা লঘু করিয়া আনিতে হইবে। পর পর বিষমস্তম্ভ সুর অভ্যাসের ফল এই যে, ইহা দ্বারা সুর পরিচয় হইয়া যাইবে। যেরূপ বর্ণ পরিচয় উত্তম রূপ না হইলে পড়া যায় না, সেইরূপ স্বরাভ্যাস উত্তমরূপে না হইলে গান গাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

স্বরলিপি। যে প্রকার অক্ষরাদি দ্বারা মনের ভাব অপরের নিকট ব্যক্ত করা যায় ও ভবিষ্যৎ কালেও উহা পাঠ করিলে অতীত কালের ভাব অথবা

বাক্য মানসপটে উত্থিত হয়, সেই প্রকার সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা গীত লিখিয়া রাখার নাম স্বরলিপি। এ পুস্তকে যে স্বরলিপি প্রদর্শিত হইবে, তাহাতে নিম্নলিখিত চিহ্নগুলি আমরা ব্যবহার করিব।

উ উদারা। মু মুদারা। তা তারা। 1 মাত্রা। ব কোমল স্বর। VX তীব্র স্বর। OR মূর্ছনা, UM গিট্‌কারী, M গমক।

ধ্রুপদ। ধ্রুবপদ এই নাম হইতে ধ্রুপদ হইয়াছে। ধ্রুবপদ অর্থাৎ জগদীশ্বরের গুণগান। সঙ্গীতের এই অঙ্গ বিশেষত ঈশ্বরে মহিমা কীর্ত্তনেই নিযুক্ত হইয়া থাকে। কোন কোন বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইলেও ধ্রুপদ গীত হইবার রীতি ছিল। এবং রাজার সিংহাসনারোহণ বিবাহাদি মঙ্গল কার্য্যেও প্রযুক্ত হইত। এই অঙ্গে অকম্পিত স্বরই অধিকাংশ ব্যবহার হয়। গমক এবং মূর্ছনাই অধিক থাকে। ইহার চারিটি অঙ্গ আছে। যথা— অস্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী আভোগ। ধ্রুপদ অতি গম্ভীর গান। যে সকল তাল ধ্রুপদের তাল বলিয়া বিখ্যাত আছে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন তালে ধ্রুপদ গীত হয়না। বোধহয় অতি প্রাচীনকালে এতদ্দেশে কেবল ধ্রুপদেরই পরিচালনা ছিল। মুসলমানদের রাজত্বের পর খেয়াল টপ্পা প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। ধ্রুপদ গায়কের রাগ রাগিণীর শুদ্ধতার দিকে অত্যন্ত দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এবং ইহার তাল অত্যন্ত কঠিন।

খেয়াল। খেয়াল শব্দের অর্থ ইচ্ছা অর্থাৎ স্বাধীনতা। ধ্রুপদের যেসকল নিয়ম আছে, তাহা অতি কঠোর ; তাহা হইতে কোন ক্রমে চ্যুত হইবার উপায় নাই। খেয়ালে অনেক স্বাধীনতা ব্যবহার করা যায়। ধ্রুপদ ভাব বিশেষে না হইলে অসিদ্ধ, খেয়ালে যে ভাব ইচ্ছা, গীত হইতে পারে। ধ্রুপদে চারি তুক ছাড়া আর নড়িবার উপায় নাই, খেয়ালে তান প্রভৃতির দ্বারা যথা ইচ্ছা রাগিণীকে বিস্তার করা যাইতে পারে। খেয়ালে দুইটি তুক্ অর্থাৎ কলি থাকে ও প্রথমটির নাম অস্থায়ী, দ্বিতীয়টির নাম অন্তরা। এই প্রকার প্রসিদ্ধি যে, আমীর খস্‌রু নামক আলাউদ্দিন বাদশাহের কোন সভাসদ বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য গোপালের ধ্রুপদ হইতে খেয়ালের সৃষ্টি করেন। ক্রমে সদারঙ্গ নামক ও অদারঙ্গ নামক গায়কদ্বয় হইতে ইহা বিশেষ পুষ্টি লাভ করিয়াছে। ধ্রুপদ অতি গম্ভীর ; উত্তমরূপ সঙ্গীতে অধিকার না থাকিলে অনেক সময় এই গান বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হয়। খেয়ালে ধ্রুপদের গাম্ভীর্য এবং টপ্পার মিষ্টতা উভয়ই বিদ্যমান।

টপ্‌পা। টপপার সৃষ্টি প্রধানত স্ত্রী কণ্ঠের জন্যই হইয়াছিল। প্রবাদ আছে যে, প্রথমে উহা আফগানিস্তান হইতে এদেশে আনীত হয়; পরে এদেশে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। টপ্‌পার বাক্য বিন্যাস অধিকাংশই প্রেম বিষয়ক, ইহার তালসকলও অপেক্ষাকৃত লঘু। দোষ এই যে, ইহাতে রাগ রাগিণীর শুদ্ধতা সবসময়ে রক্ষিত হয়না। গিট্‌কারীই টপ্‌পার সর্বস্ব। পূর্বেই বলা হইয়াছে, উচ্চস্বর হইতে অনেক অধিক কম্পন নির্গত হয়। যত কম্পন অধিক হয়, কম্পনাত্মক গিট্‌কারী ততই মিষ্ট এবং পরিষ্কার হয়। এইজন্য উচ্চ স্ত্রী কণ্ঠের নিমিত্ত সর্বাপেক্ষা গিট্‌কারী উপযোগী।

এতদ্ভিন্ন পারস্যদেশীয় এবং আরবী কতকগুলি সুর আমাদের সঙ্গীতে গৃহীত হইয়াছে। ইহারা অনেকস্থলে আমাদের যে সকল রাগ রাগিণীর সহিত তাহাদের ঐক্য আছে, তাহাদের নাম প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এক্ষণে আমাদের সঙ্গীত মধ্যে সম্যক প্রবিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু জাতীয়ত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে। ধ্রুপদ খেয়াল ও টপ্‌পার মধ্যে টপ্‌পাই লোকের চিত্ত সহসা আকর্ষণ করে। ধ্রুপদ সর্বাপেক্ষা অল্প। সঙ্গীত শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ লোকেরা টপ্‌পায় একেবারে মোহিত হয় এবং ধ্রুপদ যেস্থলে গীত হয়, তথা হইতে অনেক সময় উঠিয়া যায়। যে পদার্থে আমাদের মন অধিক নিবিষ্ট হয়, তাহাই আমাদের অত্যন্ত সুখপ্রদ হয়। তাল যদি অনেক দেরিতে পড়িতে থাকে, তাহা হইলে অনভ্যস্ত লোকের ধৈর্যচ্যুতি হইয়া যায়, কাজেই মনোনিবেশ হয়না এবং সুখের পরিবর্তে অসুখ উপস্থিত হয়। ধ্রুপদের তাল সাধারণত অতি বিলম্বে আইসে, এই নিমিত্ত সাধারণ লোকের চিত্তরঞ্জক হয়না, ধ্রুপদের সুর সকল আবার খেয়াল টপ্‌পার ন্যায় বহু প্রকার করা যায়না। কাজেই দুই একবার গাহিলেই তাহার নূতনত্ব নষ্ট হইয়া যায় এবং আর শুনিতে ভাল লাগেনা।

খেয়াল বিশেষতঃ টপ্‌পার তাল অতি ক্ষিপ্র; একটি খেম্‌টা তালের গান আর একটি চৌতালের গান দুইটির তুলনা কর, খেম্‌টা সহজেই সকলের চিত্ত বিনোদন করিবে। তাহার কারণ এই যে, অনভ্যস্ত-তাল লোকের চৌতালের গজেন্দ্র গমনে মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া যায়। কিন্তু খেম্‌টার তাল এত শীঘ্র শীঘ্র পড়ে যে, তাহাকে সকলে সহজেই আয়ত্ব করিতে পারে। টপ্‌পার সুর সম্বন্ধেও ঐরূপ। টপপার সুরে রাগ রাগিণী প্রকাশের বিশেষ কোন যত্ন নাই, কেবল তাহাদের ছায়া থাকিলেই যথেষ্ট। আবার গিট্‌কারী

এত শীঘ্র এবং নূতন নূতন চলিতে থাকে যে, সকলে সহজেই তাহা বুঝিতে পারে, কাযেই টপ্‌পা মিষ্ট লাগে।

আমদের দেশে সকল বিষয়েই স্বাধীন চিন্তার স্রোত যে প্রকারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সঙ্গীতেও তাহা লক্ষিত হয়।

যাহা হইয়া গিয়াছে, তদপেক্ষা অধিক আর কিছুই হইতে পারেনা, এই বিশ্বাস জাতীয় জীবনে দৃঢ় প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। শিক্ষার অভাবই এইরূপ বিশ্বাসের মূল কারণ। প্রাচীনেরা কোন পথ অবলম্বন করিয়া ঐ সকল রাগ রাগিণীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, লোকে সে বিষয়ের কোনও অনুসন্ধান করেনা। কেবল তাঁহারা যেগুলি করিয়া গিয়াছেন, তাহা শিক্ষা করাই যথেষ্ট বিবেচনা করে। যদি কেহ ঐ সকল পথ অবলম্বন না করে, তাহা হইলে তাঁহাকে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। অপর দিকে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সঙ্গীতের বহুল চর্চা থাকায় প্রায় সকল গীতই হিন্দি ভাষায় গ্রথিত হইয়াছে। গায়ক-মণ্ডলীর বিশ্বাস এই যে, হিন্দি ভাষায় না হইলে তাহা গীত হইল না। অনেক গায়ক সেই রাগ, সেই তাল কেবল ভাষা বাংলা গীত লজ্জাকর মনে করেন। ইঁহারা সঙ্গীতের মূল সূত্রসকল কিছুই বুঝেন নাই, কেবল শর্করাবাহী গর্দভের ন্যায় এবং গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় মূর্খ কুসংস্কারপূর্ণ ওস্তাদ প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন। নাম লইবার ইচ্ছা সকলেরই বলবতী; বাংলা গাহিলে লোকে আদর করিবে না, ওস্তাদমণ্ডলী অবজ্ঞা করিবেন, এই ভয়ে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন। কিন্তু এই কুসংস্কারের কুজ্‌ঝটিকা-মালা ভেদ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। কেন বাংলা খেয়াল হইবেনা? ব্রাহ্মসমাজ হইতে যে সকল বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ রচিত হইয়াছে, তাহা কি কোন অংশে হিন্দি ভাষায় রচিত ধ্রুপদ অপেক্ষা মন্দ? আবার এদেশে যদি সঙ্গীতের চর্চা সমধিক হয়, যদি বাংলা ভাষায় নূতন নূতন রাগ রাগিণীর সৃষ্টি হইয়া গীত হয়, তাহা হইলে হিন্দি গানও বাংলা ভাষায় না গাহিলে চলিবেনা।

এই সর্বলোকসুখপ্রদ সর্বসন্তাপহারী মোক্ষপ্রদ সঙ্গীত শাস্ত্র কি এতই সহজ যে, চিরকাল অবিজ্ঞ কুসংস্কারান্ধ "ওস্তাদজী" দিগের হস্তে পড়িয়া থাকিবে। আমরা দেখিয়াছি যে, বীজগণিত এবং শব্দ শাস্ত্রের অতি সূক্ষ্ম তত্বসকল ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। অলঙ্কার, ন্যায় এবং মনোবিজ্ঞানের সহিত ইহার প্রাণে প্রাণে মিল, তাহা বাহুল্য ভয়ে বিস্তার করিলাম না। এ সম্বন্ধে

মহারাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সমস্ত হিন্দু জাতির অকপট কৃতজ্ঞতার পাত্র। তাঁহার যত্নে তাঁহার অধ্যবসায়ে এবং তাঁহার বিপুল অর্থসাহায্যে এই মুমূর্ষু সঙ্গীতশাস্ত্রের পুনরুদ্ধার হইতেছে।

আমরা নিম্নে পূর্বোক্ত প্রণালীতে স্বরলিপি বদ্ধ করিয়া কতকগুলি গীত প্রদান করিলাম।

[তারপর ভৈরব রাগের সার্গম দিয়ে গ্রন্থকার ভৈরব কাওয়ালীতে রবীন্দ্রনাথের 'তুমি কি গো পিতা আমাদের' গানটির প্রথম দু'কলির স্বরলিপি গ্রথিত করেছেন।

অতঃপর যদু ভট্ট রচিত 'বিপদ ভয় বারণ যে করে ওরে মন' (ছায়ানট, ঝাঁপতাল) সম্পূর্ণ গানখানির স্বরলিপি দেওয়া আছে।

এর পরে 'চন্দ্র বরিষে জ্যোতি তোমারি' (ভূপালী, সুর ফাকতা) গানের স্বরলিপি, 'আদি নাথ প্রণব রূপ সম্পূরণ দাও হে তব প্রসাদ' (ইমণ কল্যাণ—সুর ফাকতা) এবং 'দাও হে সুমতি দীনে, দীনবন্ধু ভগবান (কানাড়া, আড়া) ইত্যাদি গানের স্বরলিপি দিয়ে কণ্ঠসঙ্গীতের প্রসঙ্গ লেখক শেষ করেছেন। তারপর আরম্ভ হয়েছে সঙ্গতের কথা। —বর্তমান লেখক।]

বাজনা এবং বোল

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সময় নিরূপণ ব্যতিরেকে গান হইতে পারে না এবং ঐ সময় হস্তে নিরূপণ না করিয়া যন্ত্রে নিরূপণ করার নাম বাজনা।

ঠেকা।—কোন তালের বাজনা যে মূল হইতে উৎপন্ন হয়, সেই মূলের নাম ঠেকা। অর্থাৎ মনে করুন চৌতাল, ইহাতে বারটি মাত্রা আছে, ঐ বারটি মাত্রা আবার চারিটি তাল এবং দুইটি ফাঁকে বিভক্ত করা হইয়াছে। ঐ তাল এবং ফাঁক কয়েকটি আবার হস্তে না দিয়া উহাদের মধ্যগত শূণ্য সময় সকল কতকগুলি ধ্বনি দ্বারা পূর্ণ করিয়া ঐ বারটি মাত্রারই মধ্যে কয়েকটি ধ্বনি সূচক কথা নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার নাম ঠেকা। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া বাদ্যকরেরা আরও মিষ্টি হইবে বলিয়া এক দুই অথবা বহু ঐ প্রকার বার মাত্রাবিশিষ্ট তালকে একত্র করিয়া কতকগুলি ধ্বনি সূচক কথা সন্নিবেশিত করিয়াছেন, ইহাদের নাম বোল্।

নিম্নে চৌতাল প্রভৃতির কতকগুলি বোল্ প্রদর্শিত হইল।

বাজাইবার অর্থাৎ সঙ্গত করিবার নিয়ম

বাদ্যকরকে গায়কের অনুসরণ করিতে হইবে। গায়ক যে স্থানে তাঁহার গানের প্রধান সম করেন, বাদ্যকরকে সেই স্থান উত্তমরূপে লক্ষ্য করিতে হইবে এবং সেই স্থান হইতে বাজনা আরম্ভ করিতে হইবে। এবং এ প্রকার বোল বাজান উচিত, যাহা ঐ স্থানে যখন গায়ক প্রত্যাবৃত্ত হইবেন, সেই সময়ে শেষ হয়। যদি বোল এত বড় হয় যে, তথায় শেষ হয় না, তাহা হইলে বিশেষ বিবেচনার সহিত এ প্রকার আগে বোল শেষ করিতে হইবে যে, তথা হইতে তেহাই মারিলে বাজনা যথা নির্দিষ্ট প্রধান সমে আসিয়া শেষ হয়।

তেহাই—বাজনা শেষ হইবার সময় সময় বিবিধ প্রকরণের কয়েক মাত্রাত্মক অতি ক্ষুদ্র বোল তিনবার বাজাইতে হয়, ইহার শেষটি ঠিক গানের প্রধান সমে আসিয়া শেষ হওয়া চাই। ইহা প্রয়োগ করিবার অর্থ এই যে, তদ্বারা গানের প্রধান সমটি বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে এবং শ্রোতৃবৃন্দের মনে পূর্ব হইতেই বিশেষরূপে প্রতিভাত হয়।

লয়—গীতের মূল মাত্রার সময় স্থাপনের নাম লয়। অর্থাৎ যে সময়ের মধ্যে একটি মাত্রা উচ্চারিত হয়, সেই সময় যে নিয়মে অবলম্বিত হয়, সেই নিয়মের নাম লয়।

মনে করুন, একটি গান এক এক সেকেণ্ডে এক একটি মাত্রা এই নিয়মে হইতেছে। যদি গীতের প্রথম ছত্র অর্দ্ধেক এই নিয়মে এবং অপরার্দ্ধেক দুই সেকেণ্ডে এক এক মাত্রা করিয়া উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে গীত অশুদ্ধ লয় হইবে।

লয় দুই প্রকার

বিলম্ব এবং দ্রুত।

বিলম্ব লয়

মাত্রাত্মক সময় দূর ব্যবহিত হইলেই সেই গানকে বিলম্ব কহা যায় অর্থাৎ যাহার মাত্রা অধিক সময় ব্যাপিয়া করিতে হয় তাহাই বিলম্ব লয়। ধ্রুপদ গাহনা সচরাচর অস্থায়ী এবং অন্তরা বিলম্ব পদে গাহিবার নিয়ম আছে।

এমন কি কেহ কেহ আপনাদের তাল বোধ দেখাইবার জন্য এত বিলম্ব করেন যে, অনেকের তাহা বিরক্তিকর হইয়া উঠে। বিলম্ব পদ গাহনা ধ্রুপদে বিশেষ উপযোগী, কারণ ধ্রুপদে সুর বিশেষ করিয়া দেখাইবার অত্যন্ত আবশ্যক, দ্রুত লয়ে ইহা তত অধিক নিষ্পন্ন হয় না।

দ্রুত লয়

মাত্রা যে সময় ব্যাপিয়া উচ্চারিত হয়, সেই সময় অল্প হইলেই তাহাকে দ্রুত লয় কহে। ধ্রুপদের আভোগ সঞ্চারী অপেক্ষাকৃত দ্রুত লয়ে গাওয়া হয়। খেয়ালের অঙ্গ বিশেষ "তেলেনা" প্রভৃতি অতি দ্রুত লয়ে গাওয়া হয়। সকল বিষয়ই সকলের হৃদয় সহজে আকর্ষণ করিতে পারে না। যাহা সহজেই হৃদয় মুগ্ধকর, তাহা যদি আবার একটু অধিক মনোযোগের সহিত দেখা কিম্বা শুনা যায়, তাহা হইলে অধিক মোহিত করে। যে পদার্থে আমরা যত অধিক মনোযোগ প্রদান করি, তাহা ততই সুন্দর বোধ হয়। এই জন্যই ইংরাজীতে প্রবাদ আছে যে, প্রণয়ীর চক্ষু কাফ্রীর কৃষ্ণ ললাটেও হেলেনের অনুপম সৌন্দর্য উপলব্ধি করে। ধ্রুপদ প্রভৃতি কতকগুলি গাহনা সকলের মনঃপূত হয় না। ইংরাজী গাহনা শুনিলে অনেকে স্থানত্যাগ করিতে উদ্যত হন, কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিরা উহাতে আবার আনন্দ অনুভব করেন। ধ্রুপদ সাধারণের অপ্রীতিকর হইবার একটি প্রধান কারণ এই যে, উহা বিলম্ব পদে গীত হয়। মনঃসংযম অতি কঠিন ব্যাপার। এক ভাবে অর্থাৎ এক পদার্থে মনকে মুহূর্তও স্থির রাখা যে কত কষ্টকর, তাহা যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। মন সর্বদাই ভিন্ন ভিন্ন রস চাহে। ধ্রুপদে এক এক সুর এক এক কথার উপর অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। এই জন্যই উহা অনেকের ভাল লাগে না। টপ্পা প্রভৃতি দ্রুতলয়ের গীতে সুর অতি শীঘ্র শীঘ্র মাত্রার সহিত পরিবর্তিত হইতে থাকে। অতএব মনঃসংযম তত অধিক কষ্টকর হয় না।

বাজাইবার ধ্বনির নিয়ম

বাদকের বাদ্য গায়কের কণ্ঠকে যেন ছাড়াইয়া না উঠে। বাজনা গানকে অনুসরণ করিবে, গান বাজনাকে নহে।

আড়ি বাজান

কতকগুলি প্রথমাভাবে ছন্দোহীন অথচ উত্তম তাল এবং ছন্দোবিশিষ্ট বোলের দ্বারা গায়ককে তাল লয় হইতে বিচ্যুত করার নাম আড়ি বাজান। গায়কও অনেক সময় ঐ প্রকার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহার প্রধান দোষ এই যে, ইহা দ্বারা অনেক সময়ে রাগাশুদ্ধি উপস্থিত হয়। কিন্তু ইহাতে আমোদও আছে। উভয়ের প্রতিযোগিতা বশতঃ উভয়ের এবং শ্রোতৃবৃন্দের মনে একপ্রকার তীক্ষ্ণ আনন্দ উপস্থিত হয়।

চৌতাল

+| | ০| | ১| | ০| | ২ | |
ঠেকা | ধা ধা | ধেন তা | কৎ তাগে | ধেন্ তা | তেটে কতা |
৩| | +
গদি ঘেনে | ধা |

+ | | ০| | ১ | |
(১) ধাৎ ধেনে নাক ধেৎ | ধেনে নাক ধেনে নাক | ধেৎ তা গদি ঘেনে |
০ | | ২ | | ৩| | +
ধা গদি ঘেনে ধা | কতাক্ থুংগা ধা | তেটে কতা গদি ঘেনে | ধা |

+ | | ০| | ১ | |
(২) ধুম্‌কেটে তাকা তাকা | ধুম্‌কেটে তাকা তাকা | ধুম্‌কেটে ধুম্‌কেটে |
০ | | ২ | | ৩ | | +
তাকা তাকা ধুম্‌কেটে | তাকা ধুম্ কেটে ধুম্ | কেটে তাকা গদি ঘেনে | ধা |

+ | | ০ | |
(৩) ধুম্ কেটে কেটে তাগ্ | তাগ্ তেটে ধুম্ কেটে |
১| | ০ | | ২ | |
কেটে তাগ্ তাগ্ তেটে | কেটে তাগ তাগ্ তেটে | ধুম্ কেটে ধুম্ কেটে |
৩ | | + | | ০ | |
কেটে তাগ তাগ তেটে | ধুম্‌কেটে গদিন্ তা | কেটে তাগ তাগ তেটে |
১ | ০ | | ২ | |
কতাৎতা কেটে তাগ | তাগ তেটে ধুম্ কেটে | কেটে তাগ তা |
৩ | | +
তেটে কতা গদি ঘেনে | ধা |

+ | | ০ | |
(৪) ধা ধিন্ ধাগে তেটে | কেটে তাগ তাগ তেটে |

১ | | ০ | | ২ | |
তাকা তাকা ধুম্ কেটে | কেটে তাগ্ তাগ্ তেটে | তাগা ধুম্ কেটে তাগ |

৩ | | + | | ০ | |
তা ক্কা থুন্ গা | তাকা থুন্ নান্ নান্ | ধেৎ ধেৎ ধেত্তা

১ | ০ | | ২ | |
ঘেঘে তেটে ঘেঘে তেটে | কেটে তাগ তাগ তেটে | ধেৎ ক্রাং ধুম্ |

৩ | |
কেটে তাকা গদি ঘেনে | ধা |

+ | | ০ | |
(৫) ধা ধিন্ ধাগে তেটে | কেটে তাগ তাগে তেটে |

১ | | ০ | | ২ |
তাকা ধুম্ কেটে তাক | তাক্কা থুন্ গা | কেটে তাগ তাগ তেটে |

৩ | +| | ০ | |
কেটে তাগ্ তাগ তেটে | ধুম্ কেটে গদ্দিন্ তা | কেটে তাগ তাগ্ তেটে |

১| | ০ | | ২ | |
ধুম্ কেটে গদ্দিন্ তা | কেটে তাগ তাগ তেটে | তাক্ ধুম্ কেটে তাগ |

৩| | +| | ০| | ১| | ০ |
থুন্ থুন্ থুন | তাগ্ ধুম্ কেটে তাগ | থুন্ থুন্ থুন্ | তাগ্ থুন | গ্রেদিন থুন্|

২ | | ৩ | | +| | ০ | |
গ্রেদিন থুন্ থুন্ | কেটে তাগ গদি ঘেনে | ধা গ্রেদিন | গ্রেদিন্ থুন্ থুন্ |

২ | | ০| ২| ৩ | |
কেটে তাগ গদি ঘেনে | ধা গ্রেদ্দিন | গ্রেদ্দিম্ থুন্ থুন্ | কেটে তাগ গদি ঘেনে |

+
ধা |

+ | | ০ | | ১ | |
(৬) তাগে ধেৎ তাগে | ধেৎ ধা তেটে | কেটে তাগ্ তা |

০ | | ২ | | ৩ | | + | |
ধেৎ তা | গদি ঘেনে | গদি ঘেনে ধা | কেড়ে কেড়ে কেড়ে নাগ |

০ | | ১| | ০ | | ২ |
ধেৎ তা | ধুম্ কেটে ধুম্ কেটে | তাক্কা থুন্গা | তাক্ থুন্ থুন |

৩ । । + । । ০ । ১ । ।
কেটে তাক্ গদ্দি ঘেনে । ধা ঘে ঘে ধা । ঘে ঘে ধা ঘে । ধিন্ নানা ।

০ । । ২ । । ৩ । ।
নানা কেটে তাগ্ । তাগ্ তেরে কেটে তাগ্ । তাগ্ তেরে গদ্দি ঘেনে ।

+ । ০ । । ১ । ।
ধা কেটে তাগ্ । তাগ্ তেরে কেটে তাগ্ । তাগ্ তেরে গদ্দি ঘেনে ।

০ । । ২ । । ৩ । ।
ধা কেটে তাগ । তাগ তেরে কেটে তাগ্ । তাগ তেরে গদ্দি ঘেনে ।

+
ধা ।

+ । । ০ । ।
(৭) ধা তেরে ঘেড়ে নাগ । তেরে কেটে দিন দাগ ।

১ । । ০ । । ২ । ।
ধেরে কেটে তেটে তেটে । ঘেঘে তেটে কেটে তাগ । ঘেঘে দি তেরে কেটে ।

৩ । । + । । ০ । ।
তাগ দি তেরে কেটে । গদ্দি ঘেনে ধাধা । গদ্দি ঘেনে ধা ধিন্ ।

১ । । ০ । । ২ । ।
ধা তেরে কেটে তাগ্ । তাগ্ তেরে কেটে তাগ । তেরে কেটে দিগ্ দাগ ।

৩ । । +
দিগ্ দাগ তেরে কেটে । ধা ।

+ । । ০ । ।
(৮) ধা গিদ্দে ঘেনে নাগ । নাগ তেরে কেটে তাগ ।

১ । । ০ । । ২ । ।
তেটে তেটে কেটে তাগ । তাগ্ তেরে কেটে তাগ । দি ঘেনে না ঘেনে নাগ ।

৩ । । + । । ০ । । ১ । ।
নাগ নাগ তেরে কেটে । ধেৎ তা । ধেৎ তা । কেটে তাগ তেরে কেটে ।

০ । । ২ । । । ৩ । ।
কেটে তাগ তেরে কেটে । ধেরে কেটে কেটে তাগ । ধেরে কেটে ধেরে কেটে ।

+
ধা ।

+ । । ০ । ।
(৯) ধা গেদ্দি ঘেনে না গেদ্দি ঘেনে । ধাগে ধেৎ ধাগে ধেৎ ধাগে তেটে ।

১ | | ০ | |

তাকেটে তাকা তাকেটে তাকা | কেটে কেটে কেটে তাকেটে তাকা |

২ | | ৩ | |

তাকেটে তাকা তাকেটে তাকা | ধা গেদ্দি ঘেনে না গদ্দি ঘেনে |

+ | | ০ | |

ধাৎ ধাৎ ধা থুন্ থুন্ থুন্ | তাকা থুন্ থুন্ গ্রেদ্দিন তা ঘেনে |

১ | | ০ | |

ধুম্ কেটে তাকা গ্রেদ্দিন তা ঘেনে | তাকা ধুম্ কেটে তাকেটে ধেকেটে |

২ | | ৩ | | +

তাকেটে ধেন্ নেধা তাকেটে | ধেন্ নেধা তা কেটে ধেন্‌নে | ধা |

+ | ০ | | ১ | |

(১০) ধা কেটে | তাকেটে ধেকেটে | তাগ্ ধুম কেটে |

০ | | ২ | | ৩ | | + | |

গ্রেদ্দিন তানে | ধাগিনা নাগিনা | তাগেদে ঘেড়াং | তাগ্ ধুম্ কেটে |

০ | | ১ | | ০ | | ২ |

দেগ্‌নে ঝাণ্ | তাগ ধুম্ কেটে | দেগনে ঝাণ্ | তাগ্ দেদে কতা |

৩ | | + | | ০ | | ১ | |

গ্রেদ্দিন তানে | ধা ঘেঘে তেটে | কতা থুন্ থুন্ | গ্রেদ্দিন তানে |

০ | | ২ | | ৩ | | +

ধা গ্রেদ্দিন | তানে ধা | গ্রেদ্দিন তানে | ধা |

+ | | ০ | | ১ | |

(১১) ধাধা নিধা | তেটে তেটে কেটে তাক | ঘেঘে তেটে কেটে তাগ |

০ | | ২ | | ৩ | |

ধাধা নিধা | ঘেঘে তেটে ঘেঘে তেটে | ঘেঘে তেটে ঘেঘে তেটে |

+ | | ০ | | ১ | |

কতা ঘেঘে তেটে কতা | ঘেঘে তেটে ঘেঘে তেটে | ক্রেধেৎ ক্রেধেৎ |

০ | | ২ | | ৩ | | +

ক্রাং ক্রাং | তেরেকেটে তাকা ধুম্ | কেটে তাকা গদি ঘেনে | ধা |

+ | | ০ | | ১ | |

(১২) ঘেঘে দেন্ তা | গ্রেদ্দিন তাকে | ধুম্ কেটে কেটে |

০ | | ২ | | ৩ | | + | |

তাকাৎ থুন্ | দেৎ তেটে তেটে | তা ঘেন্ নাড়ে | তাকা ধাকা |

০ । । ১ । । ০ । । ২ । ।
থুন্না নান্না । তাকেটে ধাকেটে । তাকা থুন্ থুন্ । তাকা ধুম্ কেটে ।

৩ । । +
তাকা গদ্দি ঘেনে । ধা ।

\+ । । ০ । ।
(১৩) তাক্ কেটে ধেধে কেটে । তাগ ধেৎ ধুম্ কেটে তাগ্ থুনা ।

১ । । ০ । । ২ । ।
ধাক্রে ধানে ধা । গদ্দি ঘেনে ধা । কেটে তাক্ গদ্দি ঘেনে ধাকেটে তাগ্ ।

৩ । । +
গদ্দি ঘেনে ধা কেটে তাগ্ গদ্দি ঘেনে । ধা ।

\+ । । ০ । । ১ । । ০ । ।
(১৪) ধাগে ঘেধা । ঘেঘে ত্রেকেটে । ধেৎতা । গদ্দি ঘেনে ।

২ । । ৩ । । + । । ০ । ।
তাগ্ ক্রাং ধা । কেটে তাগ্ তেরে কেটে । ধা ঘেনে । গদ্দি ঘেনে ।

১ । । ০ । । ২ । । ৩ । ।+
ক্রাং ক্রাং । ধ ত্রেকেটে তাগ্ । ধেটে তেটে । কতান্ ধা ।

\+ । । ০ । । ১ । ।
(১৫) ধাগে ঘেধা । ঘেঘে তেটে । ঘেন্ তেরে কেটে তাগ ।

০ । । ২ । । ৩ । । + । । ০ । ।
ধা গে ধিন্ । ধেৎ তা ধেৎ । তা তেটে । ধা তেটে । গদ্দি ঘেনে ।

১ । । ০ । । ২ । ।
কৎ তেরে কেটে তাগ্ । ধা কত্রে । কেটে তাগ ধা ।

৩ । । +
কৎ ত্রেকেটে তাগ । ধা ।

\+ । । ০ । ।
(১৬) ধেরে কেটে ধেরে কেটে । ধেৎ ধেৎ ধেরে কেটে ।

১ । । ০ । ২ । ।
কেটে তাগ ধেরে কেটে । কেটে তাগ্ ধ্রাং । ক্রাং না কেড়ে নাগ ।

৩ + । ।
তাগ্ তেরে কেটে তাগ্ । তেরে কেটে তাগ্ দি ।

০ । । ১ । । ০ । ।
কেটে তাগ গদ্দি ঘেনে । কৎ ধা । কেটে তাগ ধা ।

২ । । ৩। । +
তেরে কেটে তাগ ধা । তা গদ্দি ঘেনে । ধা ।

\+ । । ০ । ।
(১৭) তা ধেৎ ধেৎ ধা ধেন তা । ঘেন্ তেরেকেটে তাগ দিগ্ দাগ্ তেটে ।

১ । । ০ । ।
ক্রাং কতেটে ঘ্রাং কতেটে । ধাত্রেকেটে ধেকেটে ঘেনে নানা নানা ।

২ । । ৩ । ।
ঘেন্ নারান্ ঘেন্ নারান্ । ধা ধেটে কতা থুন্ থুন্ ।

\+ । । ০ । ।
ধা ধেটে কতা কতা থুন্ থুন্ । কতা কত্রে কেটে তাগ তেগ তাগ তেটে ।

১ । । ০ । ।
ক্রেধেৎ ক্রেধেৎ ক্রাং কেড়ে নাগ তেরে কেটে । ধেৎ ধেরে কেটে ঘ্রাং ঘ্রাং ।

২ । । ৩ ।
দি ঘেনে দি ঘেনে না ঘেনে নান্ । তাগ্ দিগ্ তাগ্ তেটে ঘ্রাং

। +
তেটে ঘ্রাং তেটে ঘ্রাং । ধা

\+ । । ০ । । ১ । ।
(১৮) তেটে তেটে ধুম্ কেটে । গদি ঘেনে নাগ ধেৎ । ক্রাং তা ধেৎ ।

০ । । ২ । । ৩ । । + । ।
থুন্‌না তাগ ধা । গদি ঘেনে থুন্না । গদি ঘেনে ধা ধা । ক্রাং থুন্না ।

০ । । ১ । । ০। । ২ ।
ক্রাং ধা ধা । তাক ক্রাং তাগ । ধা তাক্ ক্রাং । তাগ্ ধা ।

৩ । । +
ক্‌া ত ক্রাং তাগ্ । ধা ।

\+ । । ০ । ।
(১৯) ধা গদ্দি ঘেনে নাগ । নাগ্ তেরে কেটে তাগ ।

১ । । ০ । ।
তেটে তেটে কেটে তাগ । তাগ তেটে কেটে তাগ ।

২ । । ৩ । । +
ধেরে কেটে ধেরে কেটে । কৎ তেরে কেটে তাগ । ধা ।

\+ । । ০ । ।
(২০) ধেরে কেটে ধেরে কেটে । ধেরে কেটে ধেরে কেটে ।

১ | | ॰ | |
ধেৎ ধেৎ ধেরে কেটে | ধেৎ ধেৎ ধেরে কেটে |

২ | | ৩ | |
ধেরে কেটে কেটে তাগ | তাগ তেরে কেটে তাগ |

+ | | ॰ | | | ১ | |
তেরেকেটে তাকাধুম | কেটে তাগ থুন্ | ক্রেধা ক্রেধা |

০ | | ২ | | ৩ | |
ক্রেধেৎ ধেৎ ধেৎ | ধাড়ি কেড়ে নাগ | ধেতা কৎ |

+ | | ০ | |
কৎ তেটে ঘেঘে তেটে | তাগ দিগ্ তাগ্ তেটে |

১ | | ০ | |
দিগ নাগ্ নাগ্ নাগ | | দিগ্ দাগ দাগ দাগ |

২ | | ৩ | | +
তেরে কেটে তাকাধুম্ | কেটে তাগ গদি ঘেনে | ধা |

+ | | ০ | |
(২১) ধেটেৎ ধেটেৎ ধা | কেটে ধেৎ তাগে তেটে |

১ | | ০ | |
ঘেঘে তেটে দিগ্ দাগ | দিগ্ দাগ্ তেরেকেটে |

২ | | ৩ | |
তাগে তেটে তাগে দিগ্ | ঘেনে নাগ ঘেনে নাগ |

+ | | ০ | | ১ | |
গদিন্ তানে ধা | ধা ধানে ধা | তাকা থুন্না গদিন্-তা |

০ | | ২ | |
কেড়ে নাগ নাগে ধেৎ | কতা কত্রেকেটে তাগ তাগ্ |

৩ | | + | |
দিগ্ দাগ তেরেকেটে | ক্রেধেৎ তাগে তেটে |

০ | | ১ | |
কেটে তাগ্ তেরে কেটে | তাগ্ দিগ্ তাগ তেটে |

০ | | ২ | | ৩ | |
ধ্রাং তাগ দিগ | তাগ্ তেটে ধ্রাং | তাগ্ দিগ্ তাগ তেটে |

+
ধা |

```
     + |         |         ০          |           |
(২২) কত্রেকেটে    তাগ | তাগ্    তেরে    কেটে    তাগ |

১  |         |         ০   |       |      ২   |      |
ধেরেকেটে  তাগ্  ধেরে | কেটে  তাগ  ধা | ধেরে  কেটে  ধেৎ |

৩  |  |     +  |  |          ০  |   |           ১  |      |
ধেটে কতা | ক্রেধা ক্রেধা | ক্রেধেৎ ধেৎ ধেৎ | ধাতি কেড়ে নাগ |

০ |          ২                            ৩     |     |
ধেতা   কৎ | তেটে   তেটে   কেটে   তাগ | তা   গদি   ঘেনে |

+
ধা |

     +     |       |      ০       |      |      ১ |     |
(২৩) ধেরে  কেটে  কৎ | ধেরে  কেটে  কৎ | দ্রেগে  দ্রেগে |

০ |        |      ২ |       |     ৩        |       |
নাগে    তেটে | কতাৎ    তা | ঘেন   তেরে   কেটে   তাগ |

+ |        |    ০  |       |     ১ |      |    ০ |     |
নাগে    দেৎ | তাগে    দেৎ | তাগ    ধা | গদি    ঘেনে |

২   |    |    ৩  |       |     + |       |    ০ |     |
দেৎ   দেৎ | তাগ্    দেৎ | তেটে    কতা | গদি    ঘেনে |

১   |    |     ০ |       |    ২  |       |    ৩ |    |
গদি   ঘেনে | তেটে    কতা | ত্রেকেটে   তাগ্ | দেৎ   দেৎ |

+ | |     ০  |      |     ১ |   |    ০ | |     ২  |    |
ধা — | ত্রেকেটে তাগ | দেৎ দেৎ | ধা — | ত্রেকেটে তাগ |

৩ |    |   +
দেৎ  দেৎ | ধা |

      +       |        |             ০       |       |
(২৪) ধেরে   কেটে   কেটে   তাগ | তাগ   তেটে   ঘ্রাং |

১ |            |       ০     |     |      ২    |     |
ধেরে কেটে কেটে তাগ | তাগ তেটে ঘ্রাং | ধেৎ তাকান ধেৎ |

৩ |         |         +  |        |      ০     |     |
তাকান্   তাকান্ | গ্রেদিন   গ্রেদিন | থুন্  থুন্  থুন্  থুন্ |

১ |        |      ০ |     |      ২       |       |
গ্রেদিন গ্রেদিন | থুন্ থুন্ থুন্ থুন্ | ধেরে কেটে ধেরে কেটে |
```

৩ | | + | | ০ | |
তেটে তেটে কেটে তাগ | তেরে কেটে তাকা ধুম্ | কেটে তাগ থুন্ |

১ | | ০ | | ২ | |
ক্রাং না কেড়ে নাগ | তেরে কেটে তাগদি | তা ক্রাং ধা |

৩ | | +
কেটে তাগ্ গদি ঘেনে | ধা |

+ | | ০ | | ১ | |
(২৫) তাগ তাগ তেটে কেটে | তাগ্ তেটে ঘ্রাং | তেটে ঘ্রাং তেটে |

০ | | ২ | | ৩ | |
কেটে তাগ ঘ্রাং | ধেৎ তা গদি ঘেনে | নাগ তেরে কেটে তাগ |

+ | | ০ | | ১ | |
তাগ তেরে কেটে তাগ | তাগদি কেটে তাগ | ধেৎ তা তেরে কেটে |

০ | | ২ | | ৩ | | +
ধা ধেৎ তা | তেরে কেটে ধা | ধেৎ তা তেরে কেটে | ধা |

+ | | ০ | |
(২৬) ধা কেটে তাগ ধেরে | কেটে তাগ ধেরে কেটে |

১ | | ০ | | ২ | |
ধেরে কেটে তাগ ধেরে | কেটে তাগ ধেরে কেটে | ধেরে কেটে ঘ্রাং |

৩ | | + | | ০ | |
ধেরে কেটে কেটে তাগ | তাগ্ তেটে কেটে তাগ | ধেরে কেটে ঘ্রাং |

১ | | ০ | | ২ | |
ধেৎ তা কেড়ে নাগ | তেটে কতা গদি ঘেনে | ধেৎ ধেৎ ধেরে কেটে |

৩ | | +
তাগ্ ধেরে কেটে তাগ | ধা |

+ | | ০ | |
(২৭) ধাকেটে তাগ ধেরে | কেটে তাগ ধেরে কেটে |

১ | | ০ | |
ধেরে কেটে ধেরে কেটে | কেটে তাগ ধেরে কেটে |

২ | | ৩ | |
কেটে তাগ তেরে কেটে | তাগ তেরে কেটে তাগ |

+ | | ০ | | ১ | |
দি ঘেড়ে নাগ ধেড়ে | কেটে তাগ্ ধেরে কেটে | ধেরে ধেরে ধেরে ধেরে |

০ । । ২ । ।
কেড়ে নাগ তেরে কেটে । কেটে তাগ তেরে কেটে ।

৩ । । +
কেটে তাগ দেৎ দেৎ । ধা ।

+ । । ০ । । ১ । ।
(২৮) কতেটে থুকেটে । কত্রেকেটে ধেকেটে । ক্রেধেৎ ধেকেটে ।

০ । । ২ । । ৩ । ।
দি ঘেনে নাগ । দ্রেগে গদি ঘেনে । দ্রেগেনে ঘেড়াং ।

+ । । ০ । । ১ । ।
ধাগে তেটে কদে । তাগে তেটে কদে । গ্রেগেনে গ্রেগেনে ।

০ । । ২ । । ৩ । । +
দি ঘেনে নান্ । দ্রেগে গদি ঘেনে । দ্রে ঘেনে ঘেড়াং । ধা ।

+ । । ০ । ।
(২৯) কদ্ দেৎ দেৎ ধা দেন্ তা । ঘেঘে তেটে তেটে তাক্কা ধেক্কা ।

১ । । ০ । ।
গ্রেদিন্ গ্রেদিন্ ক্রাং ক্রাং । তাকেটে ধেকেটে কতা ঘেঘে তেটে-।

২ । । ৩ । ।
কত্রেকেটে ধেকেটে ধেটেৎ ধাগিনা । গ্রেগেনে গ্রেগেনে দিঘেনে দিঘেনে ।

+ । । ০ । ।
দ্রেগে গদি ঘেনে তাকেটে ধেকেটে । তাকাধুম্ কেটে তাকাৎ থুন্ ।

১ । । ০ । ।
তাকা ধুম কেটে তাকা থুন্ থুন্ । তাকা ধুম্ কেটে তাকা থুন্ থুন্ ।

২ । । ৩ । ।
ধাগি নাক ধেৎ ধেটে তেটে তেটে । তাগ তাগ তেটে ধেৎ ধেৎ ধেৎ ।

+
ধা ।

+ । । ০ । । ১ । ।
(৩০) ধা ধা দেন তা । ধা ধা দেন্ তা । কেটে তাগ তাগ তেটে ।

০ । । ২ । । ৩ । ।
কেটে তাগ তাগ তেটে । ধুম্ কেটে তাকা ধুম্ । কেটে তাকা থুন ।

+ । । ০ । । ১ । ।
ধা তেরে কেটে তাগ । ধা ধা তেরে কেটে । ঘেঘে তেটে দিগ দাগ ।

০ । । ২ । । ৩ । ।
দিগ দাগ তেরে কেটে । তাগ তেটে তাকা ধুম্ । কেটে তাগ গদ্দি ঘেনে ।

\+
ধা ।

\+ । । ০ । ।
(৩১) ক্রেধেৎ ক্রেধেৎ ঘেঘে । তেটে কতাগ্ দি ঘেনে ।

১। । ০ । ।
তাগ ধেৎ ধা তেরে কেটে তাগ । ধা গদ্দি ঘেনে নাগ ।

২ । । ৩ । ।
কতা কৎ তেরে কেটে তাগ তাগ । তাগ তাগ দিগ্ দাগ ।

\+ । । ০ । । ১ । ।
ধাগে দিন দানা নানা । কতা কৎ ত্রেকেটে তাগ তাগ । ধা ক্রে ধা নে ধা ।

০ । । ২ । ।
ধা গে দিন্ দানা নানা । তাক্কা থুন্‌গা কত্রেকেটে তাগ ।

৩ । । +
ধেরেকেটে কেটেতাগ ধেরেকেটে ধেরেকেটে । ধা ।

\+ । । ০ । ।
(৩২) কৎ তেটে তেটে কতা । কত্রেকেটে তাগ তা ।

১ । । ০ । । ২ । ।
গ্রেদেন দেধা ত্রেকেটে তাগ । ধাৎ ধানে ধা । তেটে তেটে কতা ।

৩ । । + । ।
কত্রে কেটে তাগ ক্রাং । ক্রাং তা ঘেন্ নেঘেনে ।

০ । । ১ । । ০ । ।
ঘেন্ ত্রেকেটে তাগ ধাগে দেনে । ধা ধেৎ ধেৎ তা । গদ্দি ঘেনে ধা ।

২ । ।
ঘেন্ তেরে কেটে তাগ্ তাগ্ তেরে কেটে তাগ ।

৩ । । +
ক্রাং ক্রাং ক্রেধেৎ ধেরে কেটে । ধা ।

\+ । । ০ । ।
(৩৩) কৎ তেটে থুন্ তেটে । কেটে তাগ্ তাগ তেটে ।

১ । । ০ । । ২ । ।
তাকা ধুম কেটে তাগ । তাকাৎ থুন্ গা ধা । গদ্দিন্ তা কেটে তাগ ।

৩ । । + । । ০ । ।
তেটে কতা গদি ঘেনে । ধেৎ ধেৎ ধেৎ ধেৎ । ধেরেকেটে ধেরেকেটে ।

১ । । ০ । । ২ । ।
কেটে তাগ তাগ তেটে । কেটে তাগ তাগ তেটে । তেরে কেটে তাকাধুম ।

৩ । । + । । ০ । । ১। ।
কেটে তাকা গদি ঘেনে । ধা ক্রাং ধা । ক্রাং ধা ধা । ধেন্ তা কেটে তাগ ।

০ । । ২ । । ৩ । । +
তেরেকেটে দিগ দাগ । ধুম্‌কেটে তা ক্রাং । তা ক্রাং তা ক্রাং । ধা ।

+ । । ০ । ।
(৩৪) কৎ তেটে ঘেনে নানা । ঘেঘে ত্রেকেটে দিগ্ দাগ ।

১ । । ০ । । ২ । ।
দিগদাগ তেটে কতা । কতানে নান্ তেটে । ঘেঘে তেটে ঘেঘে তেটে ।

৩ । । + । । ০ । ।
তাগ দিগ্ তাগ দিগ । তাগ দিগ ধেৎ তাকান । তাগদিগ্ তেটে কতা ।

১। । ০ । ।
গদি ঘেনে নান্ ত্রেকেটে তাগ । ত্রেকেটে তাগ ত্রেকেটে তাগ ত্রেকেটে ।

২ । । ৩ । ।
তাকা ধুম্ তেরেকেটে তাগ । গদি ঘেনে ধা গদি ঘেনে ধা গদি ঘেনে ।

+
ধা ।

+ । । ০ । ।
(৩৫) ধেরে কেটে ধেরে ধা তেরে । কেটে তাগ ধেৎ তাকানে ।

১ । । ০ । । ২ । ।
তাকা তাকা তা । গদি দে ঘেনে কতা । গদি কতা ঘেন্ তেরে কেটে তাগ ।

৩ । । + । ।
তাকা তাকা দেৎ । ঘেনাক দি ঘেনে তেটে ।

০। । ১ । । ০ । ।
ঘেন্ ত্রেকেটে তাগ্ তাগে তেটে । তাকা তাকা থুন্ । ঘেৎ তা ঘেন্নে নানা ।

২ । । ৩ । । +
ক্রাং ত্রেকেটে ঘ্রাং ত্রেকেটে । তাদেৎ থুন্ না । ধা ।

+ । । ০ । । ১ । ।
(৩৬) ঘেন্ তেরে কেটে তাগ । তাগ্ তেরে কেটে তাগ । ধেৎ তা ।

০ | | ২ | | ৩ | |
ঘেন্ না ঘেনে | ঘেন্ তেরে কেটে তাগ | তাগ তেরে কেটে তাগ |

+ | | ০ | | ১ | |
তাকা ধুম্ কেটে তাক | থুন্ থুন্ থুন্ | কৎ তেরে কেটে তাগ |

০ | | ২ | | ৩ | | +
তাগ্‌দি কেটে তাগ্ | ধা ঘেড়ে নাক ধা | ঘেড়ে নাক ধা ধা | ধা |

+ | | ০ | | ১ | |
(৩৭) কত্তাক দি ঘেনে ধা | ত্রেকেটে ধেকেটে | ঘেঘে তেটে গদ্দি |

০ | | ২ | | ৩ | |
ঘেড়ে নাগ তেরে কেটে | ধা ধা নি ধা | তেটে কতা গদি ঘেনে |

+ | | ০ | | ১ | | ০ | |
ধেৎ তাকান | ধেৎ তাকান্ | তাকান্ ধেৎ ধেৎ | ধেরে কেটে ধেটে কত্তান্ |

২ | | ৩ | | +
ধেটে কত্তান্ | কতা কতা গদি ঘেনে ধা |

+ | | ০ | | ১ | |
(৩৮) ধা গদি ঘেনে | তা কেটে ধেকেটে | কত্রেকেটে ধেকেটে |

০ | | ২ | | ৩ | | + | |
ধেটেৎ ধাগিনা | ধুম্‌কেটে তাগ | গ্রেদিন তাগিনা | তাকা ধুম্ কেটে |

০ | | ১ | | ০ | | ২ | |
তাকেটে ধেকেটে | ধেকেটে ক্রাং | ধা ধেকেটে | ক্রাং ধা |

৩ | | +
ধেকেটে ক্রাং | ধা |

+ | | ০ | | ১ | |
(৩৯) দেৎ দ্রেগে দ্রেগে দ্রেগে | দ্রেগে দ্রেগে দ্রেগে দ্রেগে | ঘেনাগে ধাকৎ |

০ | | ২ | | ৩ | |
তেটে কতা গদি ঘেনে | কৎ ঘ্রাং ধা | কেটে ধেৎ ধেরে কেটে |

+ | | ০ | | ১ | |
দিঘেনে নাগে ঘেনান্ | তাগ দি ঘেনে | তা ঘেনে ধাত্রেকে তাগ |

০ | | ২ | | ৩ | | +
ক্রাং দেৎ থুন্ | ত্রেকেটে তাগ দেৎ দেৎ | তা গে দেৎ | ধা |

+ | | ০ | | ১ | |
(৪০) থুন্ ধাগে দেৎ তাগে | দেৎ ঘেনান্ তাগে | কতা দেৎ ত্রেকেটে দেৎ |

০ । । ২ । । ৩ । । + । ।
তাদেৎ থুন্ । ঘেনে নানা গদ্দি । ত্রেঘেন্নে ঘেনে কতা । গদ্দি ধেটে কতা ।

০ । । ১ । । ০ । ।
তাকেটে ধেকেটে কতা । ধেটে কতা নে ধা । ঘেঘে তেটে ধাকৎ ।

২ । । ৩ । । +
দিকৎ তাকেটে । ঘেন্নে কতা ত্রেকেটে । ধা ।

সুর ফাঁকতাল

+ । । ০ । ১ । । ২ । । ০ । ।
ঠেকা । ধা ঘেড়ে । নাগ ধা । ঘেড়ে নাগ । গ দ্দি । ঘেড়ে নাগ ।

+ । । ০ । ।
(১) ধুম্ কেটে কেটে তাগ । তাগ তেটে ধুম্ কেটে ।

১ । । ২ । । ০ । ।
কেটে তাগ তাগ তেটে । গদি ঘেনে ধা গদি । ঘেনে ধা গদি ঘেনে ।

+
ধা ।

+ । । ০ । । ১ । ।
(২) তেরে কেটে তাগ তেরে । কেটে তাগ তেরে কেটে । ধেৎ তা ।

২ । । ০ । । + । । ০ । ।
গদি ঘেনে । কতা ঘে ধা । তেটে ঘেনে । ঘেন তেরে কেটে তাগ ।

১ । । ২ । । ০ । ।
তেরে কেটে ধা । তেরেকেটে তাগ তেরে । কেটে তাগ তেরে কেটে ।

+ । । ০ । । ১ । । ২ । । ০ । ।
ধেৎ তা । ত্রেকেটে তাগা । ধা ত্রেকেটে । তাগা ধা । ত্রেকেটে তাগা ।

+
ধা ।

+ । । ০ ।
(৩) ধাগে তেটে কদে তাগে তেটে কদে । তাকা ধুম্ কেটে

। ১ । ।
তাগে তেটে কদে । তেরে কেটে তাগ ধুম্ কেটে তাগ ।

২ । । ০ । । +
ত্রেকেটে তাগেনা ধা ত্রেকেটে । তাগিনা ধা ত্রেকেটে তাগিনা । ধা ।

+ | | ০ | | ১ | |
(৪) ঘেন্ তেরে কেটে তাগ | তাগ্ তেরে কেটে তাগ | ঘেৎ তা ঘেন্ |

২ | | ০ | | + | |
নে ঘেনে ঘেনে | তেরেকেটে তাগ তাগ | তেরে কেটে তাগ |

০ | | ১| | ২ | |
কেটে তাগ গদি ঘেনে | ধা কেটে তাগ | গদি ঘেনে ধা |

০ | | +
কেটে তাগ গদি.ঘেনে | ধা |

+| | ০ | | ১ | |
(৫) ধা কেটে তাগ ধা | কেটে তাগ্ তেরে কেটে | তাগ দি ঘেনে নাগ |

২ | | ০ | | + | | ০| |
থুন্ না না না | তেটে কতা গদি ঘেনে | তা ঘড়ান্ তাগ | ঘড়ান ধা ধা |

১ | | ২ | | ০ | |
দেন্ তা কেটে তাগ | তেরেকেটে তাকা ধুম্ | কেটে তাগ গদি ঘেনে |

+
ধা

+ | | ০ | | ১ | |
(৬) ধা তেরে ঘেড়ে নাগ | দিদি কেটে তাগ | ধ্রাং নাকেটে তাগ |

২ | | ০ | | +| | ০ | | ১ | |
তেটে কতা গদি ঘেনে | ধা কৎ | দি কৎ | তাগ্ ধা ধা | কেটে তাগ ধা |

২ | | ০ | | +
কেটে তাগ্ তেরে কেটে | তাগ ধা গদি ঘেনে | ধা |

+| | ০ | |
(৭) ধুম্ কেটে কেটে তাগ | তাগ্ তেটে ধুম্ কেটে |

১ | | ২ | | ০ | |
কেটে তাগ তাগ তেটে | কতা কতা কেটে তাগ | তাগ্ তেটে ঘেন্ তেরে |

+ | | ০ | | ১ | | ২ | |
কেটে তাগ তেরে কেটে | তা ধ্রাং তা | ধ্রাং তা ধ্রা | আং তা ধ্রাং |

| +
| তা ধ্রাং তাগ | ধা |

+ | | ০ | | ১ | |
(৮) ধা গেড়ে নাগ ধা | ঘেড়ে নাগ ঘেড়ে নাগ | ধাধা ঘেড়ে নাগ |

২ । । ০ । । + । ।
ঘেড়ে নাগ ঘেড়ে নাগ । ধাগে তেটে তাগে তেটে । ঘেঘে তেটে ঘেঘে দি

০ । । ১ । । ২ । ।
কৎ তেটে কেটে তাগ । তাগ তেটে কেটে তাগ । ধুম্ কেটে তাকা ধুম্

০ । । + । । ০ । । ১ । ।
কেটে তাকা গদি ঘেনে । ধেৎ তা । ধুম্ কেটে ঘ্রাং । ধা ধুম্ কেটে

২ । । ০ । । +
ঘ্রাং ধা । ধুম্ কেটে ঘ্রাং । ধা ।

+ । । ০ । ।
(৯) ধেরে কেটে ধেরে কেটে । ধেৎ ধেৎ ধেরে কেটে

১ । । ২ । । ০ । । + । ।
ধেরে কেটে কেটে তাগ । তাগ তেরে কেটে তাগ । ধা তা । ধা -

০ । । ১ । । ২ । । ০ । ।
ধেৎ ধেৎ । ধেরে কেটে কেটে তাগ । তাগ তেরে কেটে তাগ । ধা তা

+ । । ০ । । ১ । । ২ । ।
ধা - ধেৎ ধেৎ । ধেরে কেটে কেটে তাগ । তাগ তেরে কেটে তাগ

০ । । +
ধা তা । ধা ।

+ । । ০ । । ১ । ।
(১০) ধা ধিন্ । ধা তেরে কেটে তাগ । তাগ তেরে কেটে তাগ

২ । । ০ । । +
গদি ঘেনে ধা গদি । ঘেনে ধা গদি ঘেনে । ধা ।

+ । । ০ । ।
(১১) কৎ তেরে কেটে তাগ । ধেৎ ধেৎ ধেরে কেটে

১ । । ২ । । ০ । ।
কেটে তাগ তেরে কেটে । তাগ ঘ্রাং ধা । কেটে তাগ তেরে কেটে

+
ধা ।

ধামার

+ । । । ০ । । ১ । । ০ । । । ২ । । ০ । ।
ঠেকা । ক ধেটে । ধেটে । ধা - । গদিন । দিন । তা - ।

+ । । । ০ । । ১ । ।
(১) ধা গে তেটে তেটে । ধা গে তেটে । গদি ঘেনে

০ । । । ২ । । ০ । । +
তাগে তেটে তেটে । তাগে তেটে । গদ্দি ঘেনে । ধা ।

+ । । । ০। । ১ । । ০ । । ।
(২) ধাৎ তেটে তেটে । ধুম্ কেটে । গদ্দি ঘেনে । কৎ তেটে তেটে ।

২ । । ০ । । + । । । ০ । । ১ । ।
কেটে তাগ । তেরে কেটে । দি ঘেড়ে নাগ । নাগ নাগ । নাগ নাগ ।

০ । । । ২ । । ০। । +
ধেৎ তা ধেৎ । তেটে কতা । গদ্দি ঘেনে । ধা ।

+ । । । ০ । । ১ । । ০ । । ।
(৩) কৎ তাগে তেটে । কেটে তাগ । তাগ তেটে । ধাগে তেটে তেটে ।

২ । । ০ । । + । । । ০ । । ১ । ।
ধাগে তেটে । ধাগে তেটে । ধা ঘেনে নাগ । তাগে তেটে । ঘেনে নাগ ।

০ । । । ২ । । ০ । । +
নাগে তেটে তেটে । তেটে কতা । গদ্দি ঘেনে । ধা ।

+ । । । ০ । । ১ । । ০। । ।
(৪) কৎ তেটে তেটে । ঘেঘে তেটে । কেটে তাগ । কতাক ধেকেটে ।

২ । । ০ । । + । । । ০ । ।
ধেৎ ধেৎ । ধেরে কেটে । ঘেনাক দিঘেনে । ধাগে তেটে ।

১ । । ০ । । । ২ । । ০ । ।
গদ্দি ঘেনে । কৎ ত্রেকেটে তাগ তা । কৎ ধা । গদ্দি ঘেনে ।

+ । । । ০ । । ১ । । ০ । । ।
ধা ধেৎ ধেৎ । ঘেঘে তেটে । গদ্দি ঘেনে । ঘেতেটে তা ঘেনে ।

২ । । ০ । । + । । । ০। । ১ । ।
তাকা ঘেঘে । তেটে তাকা । কৎ তেটে তেটে । ধুম্ কেটে । গদ্দি ঘেনে ।

০। । । ২ । । ০। । + । । । ০ । ।
ধা ধেন্ না । ঘেঘে তেটে । দ্রাং । ধা ত্রেকেটে তা ঘেনে । তাগে ধিন্ ।

১। । ০ । । । ২ । । ০ । । +
তা ঘেন্না । ধা ত্রেকেটে তাগ্ তা । কৎ ধা । গদ্দি ঘেনে । ধা ।

+ । । । ০ । । ১ । । ০। । ।
(৫) কদ্ ধেৎতা । ত্রেকেটে ধেৎ । ধেৎ তা । ধেন্নে ধাগে না ।

২ । । ০ । । + । । । ০। ।
তাকা ধুম্ । কেটে তাকা । ধা তেটে তা গেনে । ধাগে তেটে ।

১ | | ০ | | | ২| | ০ | |
গদি ঘেনে | কৎ তেটে তেটে | কতা ঘেঘে | তেটে কতা |

+| | | ০| | ১ | | ০ | | |
কতেটে তাগেনে | কতা ঘেঘে | তেটে কতা | ত্রেকেটে ধা ধা |

২ | | ০| | +
ত্রেকেটে ধা | গদি ঘেনে | ধা |

+| | | ০| | ১| | ০| | |
(৬) ধেৎ তাকান্ | ঘেঘে তেটে | গদি ঘেনে | কৎ তেটে তেটে |

২| | ০| | +| | | ০| | ১| |
কতা ঘেঘে | তেটে কতা | ঘেনে ঘেনান্ | ধুম্ কেটে | গদি ঘেনে |

০| | | ২| | ০ | | +| | |
কদে কদেৎ | দেদেৎ | ধেরে কেটে | ঘে নাক তেটাক |

০ | | ১| | ০| | |
ঘেন্ তেরেকেটে তাগ | তাগে তেটে | কৎ তেটে তেটে |

২ | | ০ | | +
ঘেন তেরে ঘেঘে তেরে | কেটে তাগ্ তেরে কেটে | ধা |

+| | | ০| | ১ | | ০| | |
(৭) ধেৎ ধেরেকেটে | ঘেঘে তেটে | গদি ঘেনে | ধা ত্রেকেটে ধেকেটে |

২ | | ০| | +| | | ০| | ১| |
ঘেন্ তা | রা ন্ | তান্ না ড়ে | ঘেঘে তেটে | ধেটে কতা |

০| | | ২| | ০| | +| | |
কতা কতানে | কতা কতা | কেটে তাগ | কতা কত্রেকেটে তাগ |

০| | ১| | ০| | | ২| | ০| |
তিগ্ তাগ | তেটে কতা | ঘেন্ তেটে তেটে | ঘেনে নানা | ঘেঘে দি |

+ | | | ০| | ১| | ০ | |
দি ঘেনে না ঘেনে | নাগ দেগ | তাগ তেটে | ঘেন্ তেটে ঘেঘে তেটে

| ২ | | ০ | | +
কেটেতাগ | তেরে কেটে তাকা ধুম্ | কেটে তাগ গদি ঘেনে | ধা |

+| | | ০| | ১| | ০| | |
(৮) ধুম্ কেটে তাগ | ধুম্ কেটে | তাকা তাকা | কতা ঘেনান্

| ২ | ০ | | +| | | ০| | ১ | |
ঘেঘে দেৎ | তা ঘেন্ না | ধা দি ঘেনে | ধা ধা | কেটে তাগ

০ । । । ২ । ।
কেটেতাগ তাগ তেরেকেটে তাগ । তেরে কেটে তাকা ধুম্ ।

০ । । +
কেটে তাকা গদি ঘেনে । ধা ।

+। । । ০। । ১। । ০। । ।
(৯) ঘেন্ তেটে তেটে । ঘেঘে দি । ঘ্রাং । নাগ তেটে তেটে ।

২। । ০। । +। । । ০। । ১। । ০। । ।
কেটে তাগ । তেরেকেটে । কৎ ধাগেনা । ধাগে দি । ঘ্রাং । দি তাগ ।

২ । । ০ । । +। । ।
ধেটে কতা । গদি ঘেনে । ঘেন্ তেরেকেটে তাগ তাগ তেরে ।

০। । ১ । । ০ । । ।
কেটে তাক তাকাধুম্ । কেটেতাগ থুন্ । কৎ তেরে কেটে তাগতাগ দি ।

২ । । ০ । । +
কেটে তাগ্ ধা ঘেড়ে । নাগ ধাঘেড়ে নাগ । ধা ।

+ । । । ০ । । ১ । ।
(১০) ধাগে তেটে তেটে । ধাগে তেটে । কতা কৎ তা ।

০ । । । ২ । । ০ । ।
কত্রেকেটে তাগ তেরে কেটে । তাগ্ তেরে কেটে তাগ । তেরেকেটে দেৎ ।

+। । । ০। । ১। । ০ । । । ২ । ।
ধেৎ ধা নে । তাট্ দ্রেগে । দেন্ তা । তেটে ধা তেটে । ধা তেটে ।

০ । । +
ধা তেটে । ধা ।

আড়া চৌতাল

+। । ১ । । ০। । ২। । ০। । ৩। ।
ঠেকা । ধাগ । ধা গে । দেন্তা । তেটে । ধাগে । দেন্তা ।

০। ।
গদি ঘেনে ।

+। । ১। । ০ । । ২। । ০ । ।
(১) ধা কেটে । ধা ধা । তেরে কেটে । ঘেন্ তেরে । কেটে তাগ ।

৩ । । ০ । ।
তেরে কেটে । নাগ দেৎ ।

+। । ১। । ০। ।
(২) ধ্রাং তাগ দেৎ । ধ্রাং গদি ঘেনে । নাগ তেরে কেটে তাগ ।

২ । । ০। । ৩। ।
তেরেকেটে কৎ তেরে । কেটে তাগ তেরেকেটে । গদিঘেনে ধা গদি ।

০। । +
ঘেনে ধা গদি ঘেনে । ধা ।

+। । ১। । ০। ।
(৩) ধ্রাং ধা ঘেড়ে । থুন্না ঘেড়েনাগ । নাগ তেরে কেটে তাগ ।

২ । । ০। । ৩। ।
তেরে কেটে গদি ঘেনে । ধা ক্রাং ধা । কেটেতাগ্ তেরেকেটে ।

০। । +
তাতা ধা গদি ঘেনে । ধা ।

+ । । ১ । । ০। । ২। । ০ । ।
(৪) তাদেৎ । থুন্ নান্ । তেটে কেটে । তাগ ঘেঘে । তেটে ধ্রাং ।

৩। । ০। । +। । ১। । ০। ।
ধা গেদ্দি । ঘেনে তেটে । কতা দেৎ । থুন্ কতা । কত্রেকেটে তাগ ।

২। । ০। । ৩। । ০। ।
ধ্রাং তাগ তাক । তাকে তাগ ধ্রাং । তেটে কতা । গদি ঘেনে ।

+। । ১। । ০। । ২। । ০। ।
ঘেঘে দেৎ । দেৎ ঘেতেটে । ধ্রাং-ন্না । তেটে তাক্রাং । - তাগ থুন্ ।

৩ । । ০ । । +
গেড়ে গেড়ে থুন্ । গেড়ে গেড়ে থুন্ । ধা ।

+ । । ১। । ০। ।
(৫) ধা তেরেকেটে তাগ । দেৎ ধাগে । নাধা কেটে তাগ ।

২ । । ০ । । ৩। । ০। ।
তেরে কেটে ধ্রাং । কেটে তাগ থুন্ । ঘে তেটে তা । ঘেনে তাকা ।

+ । । ১। । ০। । ২। ।
ধেৎ ধেৎ ধেরেকেটে । ধ্রাং দিগ্ । দাগ তেটে । ঘেনে কতা ।

০। । ৩। । ০। । +
ক ত্রেকেটে তাগ্ । ক্রাং ক্রাং । ক্রাং দেৎ । ধা ।

+। । ১। । ০। । ২। । ০ । ।
(৬) থুন্ ধাগে । দেৎ ঘেনা । নে ধাগে । তেটে কতে । টে কতেটে ।

৩ | ০ | + | ১ | ০ |
কতা গদি | ঘেনে নাগ | ঘেঘে দেৎ | ঘেনে কতা | ঘেতেরে কেটে তাগ |

২ | ০ | ৩ | ০ |
ক্রাং ধা | কৎ খেটে | থুন্না কেটে তাগ | তেরে কেটে নাগ দেৎ |

\+
ধা |

\+ | ১ | ০ | ২ | ০ |
(৭) গেড়ে গেড়ে থুন্ | তা ঘেন্নে তাকা | গদি ঘেনে | কদ্ দেৎ | তেটে |

৩ | ০ | + | ১ | ০ |
ঘ্রাং তেটে | ঘ্রাং তেটে | কতেটে ঘে | নাক্ ধাগে | তেটে তাগে |

২ | ০ | ৩ | ০ | + | ১ |
তেটে ঘেন্ তেরে | কেটে তাগ কৎ | ধা থুন্ | ধাগে তেটে | গদ্দি | কেটে তাগ |

০ | ২ | ০ | ৩ |
তা ঘেন্নে | ক্রাং কেড়ে নাগ | তেরে কেটে তাকাধুম্ | কেটে তাকা গদি

০ | + | ১ | ০ | ২ | ০ |
ঘেনে | ঘ্রাং ঘ্রাং | গদেৎ তা | নে তেটে | ধা গদেৎ | তানে | তেটে ধা |

৩ | ০ | +
গদেৎ তা | নে তেটে | ধা |

\+ | ১ | ০ | ২ | ০ |
(৮) নাগ দেৎ | থুন্না দ্রেগে | দ্রেগে দ্রেগে | দ্রেগে ধা | গদি ঘেনে |

৩ | ০ | + | ১ | ০ | ২ |
কতা ক্রাং | ত্রেকেটে দেৎ | ধা গেনে না | গেনে ধাগে | থুন্ থুন্ | থুন্

০ | ৩ | ০ |
কতা | ঘেন্ তেরে কেটে তাগ্ | তাগে গেড়ে গেড়ে | গেড়ে গেড়ে থুন্ |

\+ | ১ | ০ | ২ | ০ |
ধা গদ্দি | ঘেনে ধাগে | ধাগেনা না | ক্রাং ক্রেধেৎ | ধেরে কেটে কেটে

৩ | ০ | + |
তাগ | তেরে কেটে কেটে তাগ | তেরে কেট্টে তাগ্ দ্দি | কেটে তাগ |

১ | ০ | ২ | ০ | ৩ |
ঘেঘে দ্দি | ঘেনে ক্রাং | ধা ঘেঘে | দ্দি ঘেনে ক্রাং | ধা ঘেঘে |

০ | +
দ্দি ঘেনে কড়ান | ধা |

+ | | ১ | | ০ | | ২ | |
(৯) ধেরেকেটে তাগ ক্রাং | তাগ ক্রাং | কেড়ে নাগ দেৎ | ঘে ঘে দেৎ

০ | | ৩ | | ০ | | + | | ১ | | ০ | |
তা ঘেন্নে | তা তা তা | ঘে ঘে তেটে | কৎ থুন্ নাগ | দেৎ ক্রাং | তা ঘেনেতা

২ | | ০ | | ৩ | | ০ | |
তানে ধাগে | দেৎ দেৎ | থুন্ থুন্ ঘ্রাং | থুন্ থুন্ ঘ্রাং |

+ | | ১ | | ০ | | ২ | | ০ | |
ধা তেটে | থুন্না ক্রেধেৎ | কেটে তাগ্ | ঘ্রাং ঘে ঘে | তেরে কেটে তাগ্ |

৩ | | ০ | | + | |
দেৎ তা তাগ্ | দেৎ তাকা থুন্ থুন্ | তেরে কেটে ধেরে কেটে

১ | | ০ | | ২ | | ০ | |
কেটে তাগ্ ধেরে কেটে | কৎ তাগ্ ক্রাং | তাগ্ ক্রাং তাগ্ | ক্রাং তাগ

৩ | | ০ | | +
ক্রাং তাগ্ | ক্রাং তাগ | ধা |

+ | | ১ | | ০ | | ২ | | ০ | |
(১০) ধেটেৎ | ধেৎ ন্না | তেটে ঘেঘে | তেটে ক্রেধা | তেটে গদি ঘেনে

৩ | | ০ | | + | | ১ | | ০ | |
ঘে তেরে কেটে | তাগ্ দেৎ | কতেটে ক | তেটে ঘেঘে | তেটে কতা

২ | | ০ | | ৩ | | ০ | | + | | ১ | |
কেড়ে কেড়ে দেৎ | তা ঘেনা | ঘেন্নে | না তেটে | দিঘেনে দি | ঘেনে তাগে

০ | | ২ | | ০ | | ৩ | | ০ | | + |
দিগ্ তাগে | ধাগে ধাগে | ধা ঘেন্নে | ঘেঘে দেৎ | ত্রেকেটে দেৎ | কতা গদি

১ | | ০ | | ২ | | ০ | |
ঘ্রাং ঘ্রাং | ত্রেকেটে ঘ্রাং | দেৎ তেরে কেটে তাগ | তাগ তেরেকেটে তাগ্

৩ | | ০ | | +
তা-তা | নে তাগ | ধা |

+ | | ১ | | ০ | | ২ | |
(১১) দি ঘেনে তাদেৎ | ধেৎ ধা | দেন্তা কৎ | দেন্তা ক্রেধে

০ | | ৩ | | ০ | | + | |
ক্রেধেৎ ধেকেটে | দিগ্না ধানে | ধাগেতেটে কদে | কত্তেটে দিগ

১ | | ০ | | ২ | | ০ | |
দাগ তেটে ঘেনে | দি ঘ্রাং কেড়ে | নান্ তেটে ঘে তেটে | কতেটে ঘেতেটে |

৩ | | ০ | | +
ধাতি থুন্না—ত্রেকেটে তাগ ধেরে কেটে তাগ | ধা |

\+ | | ১ | | ০ | | ২ | |
(১২) ধেৎ তা তা গিনা | ধাকৎ তেটে | কতা গদি ঘেনে | ঘেনে নানানানা |

০ | | ৩ | | ০ | | + | |
ঘেনে ধাগে তেটে | ধাগেনা ক্রাং | ক্রাং তেটে কদে | কৎ ধাগে তেটে |

১ | | ০ | | ২ | | ০ | |
কতা কত্রেকেটে তাগ | ক্রাং নাড়ে | দিঘেনে ক্রাং | কদ্ দেৎ দেৎ |

৩ | | ০ | | +
কতা ঘেন্ ত্রেকেটে তাগ | গ্রেগেনে ক্রাং না | ধা |

\+ | | ১ | | ০ | |
(১৩) ধাতেরে ঘেড়ে নাগ | তেরে কেটে দিগ দাগ | ঘেঘে তেটে ঘ্রাং |

২ | | ০ | | ৩ | |
গদিন্ তা ঘেনে নাগ | ধেরে কেটে কেটে তাগ্ | তেরে কেটে দিগদাগ |

০ | | + | | ১ | | ০ | |
দিগ্ দাগ তেরে কেটে | কতেটে ক | তেটে কতা | গদি ঘেনে ক্রাং |

২ | | ০ | | ৩ | | ০ | | +
কেড়ে নাগ তেরেকেটে | নাগ দেৎ | ধেৎ ধেৎ ক্রাং | তাগে তেটে ক্রাং | ধা

\+ | | ১ | | ০ | |
(১৪) তেরেকেটে তাগ দি | কেটে তাগ্ ধেরেকেটে | তাগ ধেরেকেটে |

২ | | ০ | | ৩ | | ০
তাগ ধা | কতাৎ তাকেটে তাগ | তেরেকেটে কৎ তেরেকেটে | তাগ্

| | +
তেরেকেটে ক্রাং | ধা |*

ঢিমে তেতালা

\+ | | | | ৩ | | | |
(১) ধেৎ ধেৎ ঘেনে নাগ | দ্রেগে তেটে কেটে তাগ |

০ | | | | ১ | | | | +
গ্রেদেন তাকে ধাগে | তেটে কতা গদি ঘেনে | ধা |

+ | | | | ৩ | | | | ০ | | | |
(২) ধেৎতা ধেৎতা | ধেৎতা ঘেন্নে ঘেনে | ধা ঘেনে গদি ঘেনে |

১ | | | | +
ঘেড়ে নাগ তেরে কেটে নাগ তেরে কেটে তাগ | ধা |

+ | | | | ৩ | | | |
(৩) ধাগেৎ তেটে ধাগে | দেন্‌তা কেটে তাগ ত্রেকেটে দেৎ |

০ | | | | ১ | | | | +
ত্রেঘেন্নে কড়ান তাগ | —ধা তেটে নাতা তেরে কেটে তাতা | ধা |

আড়া ঠেকা

+ ৩
(১) ধাগে তেটে গদি ঘেনে | ধাগে তেরেকেটে দেন তা কতা |

০ ১ +
তাগে তেটে তাক্‌-ঘ্রাং ০ধা | তেরেকেটে দেন্‌ তা গদি ঘেনে ॥ ধা |

+ ৩
(২) ধাগেনা ঘেনাগ ত্রেকেটে ধাগিনা | (আড়ি) ধেকেৎ০ ধাগিনা দিগে

০ ১ +
দা গতেটে | ক্রাং ধাগিনা ধাগিনা নাগিনা | ধাগিনা ক্রাং ক্রাং ধাগিনা ॥ ধা |

+ ৩
(৩) ধা তেরে-কেটে ধাগিনা ধাগিনা ধা-তেরে-কেটে | (আড়ি) ধাগিনা

নাগিনা তেরে-কেটে-তাক তেরেকেটে তাক | তেরেকেটে তাক ধেৎ ধা ধা

১ +
ঘেতেটে তা খেনে | দেৎ ০ তে টে তেটে গ্রেদিন ০ তা ০ কে ॥ ধা |

+ ৩
(৪) ধা-তেরে-কেটে ধাগিনা ধাগেনা গ তেটে | (আড়ি) ধা-তেরে-কেটে

০
ধাগিনা ধাগেনা গতেটে | কৎ তা ০ গেতেটে কৎ-তেরে-কেটে ধেতেটে |

১ +
ধেৎ ধে ০ রেকেটে ঘেঘেনা গতেটে ॥ ধা |

+ ৩
(৫) ধাঘে ঘেধা ধেঘে ঘেঘে | নাগ থুন্না কেটে তাক তেরেকেটে |

০ ১ +
তেরেকেটে তাতা কতা ঘেঘে | নাগ থুন্না কেটে তাক তেরেকেটে ॥ ধা |

+ ৩ ০
(৬) ধাঘে ঘেধা ঘেঘে ধাগে | দিন্ না নানা নানা | কত্তাৎ ০ তা কেটে তাক |
১ +
ধেরেকেটে কেটেতাক তাকতেরে কেটেতাক ॥ ধা |

+ ৩
(৭) ঘেনে ধেনে ঘেনে ধাড়া | ঘেনে ধাড়া ঘেনে ধাড়া |
০ ১ +
কৎ তাড়া ঘেনে ধাড়া | ঘেনে ধাড়া ঘেনে ধাড়া ॥ ধা |

+ ৩
(৮) ধা-তেরে কেটে-ধা তেরেকেটে ধাতে | ধা তেরেকেটে ধা-ধেটে
০ ১
কেটে তাক | তেরেকেটে তাগ্ দি কেটে তাগ ধাতে | ধা তেরেকেটে
+
ধা-ধেটে কেটে তাগ ॥ ধা

+ ৩
(৯) ধা-তেরে কেটে-ধা তেরে কেটে ধেটে | ঘেঘে নাগ্ দেনে তাতা |
০ ১
তা-কেটে তাক-তা কেটে তাক তেটে | ধা-ঘেড়ে নাগ দি কেটে তাক
+
গদি ঘেনে ॥ ধা |

+ ৩
(১০) ধা ঘেনা ঘেনে-ধা তেরে কেটে | ধাগে নাগে দেন্ তা কেটে তাক |
০ ১
তাক তেরে কেটে তাক তেরে কেটে তাক তাক | ধা ঘেনা ঘেনে-ধা
+
তেরেকেটে ॥ ধা |

+ ৩
(১১) ধেটেৎ ০ ধেন্ ০ নে ধেটে | ধেরে ধেরে কেটে তাগ্ তাগ্ তেরে
০ ১
কেটে তাগ | তেরে কেটে তাগ্-তা তাগ্ দি কেটে তাগ্ | ধেটেৎ
+
০ ধেন্ ০ নে ধেটে ॥ ধা

\+ ৩ ০
(১২) ধেটে তেটে কতান্ ০ | তাগ্ ধাতা ঘেন্ না | ঘেন্-তেরে কেটে

১ +
তাগ্ তাগ্ তেরে কেটে তাগ্ | ঘেটে তাগ্ দি ধা-তেরে কেটে তাগ ॥ ধা |

\+ ৩ ০
(১৩) ধেনে ধেনে ধাগে নাধা | ধেরে কেটে ধেনে ধাগে নাধা | দেন্ তা

১
কেটে তাগ তাগ তেরে কেটে তাগ | তেরে কেটে তাগ-দি কেটে তাগ

\+
গদি ঘেনে ॥ ধা |

\+ ৩
(১৪) ঘেড়ান্ ০ দে নাগে দেনে | দেনে ঘেনে নাগে তেটে |

০ ১ +
ধাগে তেটে ধাগে + তেরে কেটে | দেনে ঘেনে নাগে তেটে ॥ ধা |

\+ ৩
(১৫) ধাগে + তেরেকেটে ধেনা ঘেনে | ধাগে নাধা তেরেকেটে ঘেনে |

০ ১
ঘেড়ে নাগ্ তেরেকেটে তাগ্ তেরে কেটে তাগ | তেরে কেটে তাগ্-দি

\+
কেটে তাগ গদি ঘেনে ॥ ধা |

\+ ৩
(১৬) ধাগে + তেরে কেটে ধেনা ঘেনা | ধাগে দেন্ তা কেটে তাগ

০
তেরে কেটে | তাগ তেরে কেটে তাগ তেরে কেটে তাগ তাগ |

১ +
ধাগে দেন্ তা কেটে তাগ্ তেরে কেটে ॥ ধা |

ত্রিতাল

\+ ৩
(১) ঘেড়াং ধাধা তেরেকেটে নাগ্-দেৎ | ঘেড়াং ধাধা দেন্ তা কেটে তাগ্ |

০ ১
তেরে কেটে তাগ্ তাগ্ তেরেকেটে নাগ্ দেৎ | ঘেড়াং ধাধা দেন্ তা

\+
কেটে তাগ্ ॥ ধা |

(২) +ধাগে তেরেকেটে ধেনা ঘেনে | ৩ঘেঘে নাগ দেনে তাগ |

০তাগে তেরে কেটে দেন্ তা কতা | ১গদি ঘেনে নাগে তেটে ‖ +ধা |

(৩) +ধিন্ ধিন্ ০ ধা | ৩গ্রে দিন তা ০ | ০ধা গে না ধা | ১গ্রে দিন্ ০ তা ‖

+ধা |

(৪) +ধাগি নাধা + তেরেকেটে ধাগি | ৩নাধা + তেরেকেটে ধাধা +

তেরেকেটে | ০ধাগি নাধা + তেরেকেটে দেন্ তা | ১কেটে তাগ তেরেকেটে

তাগ্ ধেৎ তেরে কেটে ‖ +ধা |

(৫) +ধিন্ ধিনা + তেরেকেটে ধিনা | ৩ঘেঘে নাতিন্ ০ তি তাতা |

০তিন্ তিনা + তেরেকেটে ধিনা | ১ঘেঘে না তিন্ ০ তি তাতা ‖ +ধা |

(৬) +ধা থুন্ গা তেরেকেটে নাগ দেৎ | ৩ঘ্রাং ধাধা দেন্ তা কেটে তাগ্ |

০তাগ্ তেরে কেটে তাগ্ ধেরে ধেরে কেটে তাগ | ১ঘ্রাং ধাধা দেন্ তা

কেটে তাগ ‖ +ধা |

(৭) +ঘেনে তাতা ঘেনে তাতা | ৩ঘেড়ে নাগ তেরে কেটে নাগে তেরে

কেটে তাগ | ০তাগ্ তেরে কেটে তাগ্ তেরে কেটে তাগ-তা |

১কেটে তাগ তেরে কেটে তাগ তেরে কেটে তাগ ‖ +ধা |

(৮) +দেৎ দেৎ + তেরেকেটে দেৎ | ৩কৎ-+ তেরে কেটে তাগ তাগ ধা |

০ ১
দিগ্-ধা তেরেকেটে ধা ০ | তেরে কেটে তাগ্ তেরে কেটে তাগ তেরে কেটে ॥

+
ধা |

+ ৩
(৯) ধাগে + তেরেকেটে ধেনা ঘেনা | ধা গেনা দেন্ তা কেটে তাগ্ |

০ ১
তাগে + তেরেকেটে ধেনা ঘেনা | ধা গেনা দেন্ তা কেটে তাগ ॥

একতালা

+ ৩ ০ ১
ঠেকা | ধিন্ ধিন্ ধা | ধা দিন্ তা | তা তিন্ তাগে | ত্রেকেটে ধে না ॥

+
ধা |

+ ৩ ০
ঘে না ঘেড়ে | ধা তাক থুনা | কেটে তাক তাক তেরে কেটেতাক |

১ +
তেরেকেটে তাক ধেৎ তেরে কেটে কেটে ॥ ধা |

+ ৩ ০
(১) ধাগে তেটে কদে | ধাগে নাগে দেনে | তাতা কতা ত্রেকেটে |

১
দেন্ তা গদি ঘেনে ॥

+ ৩ ০
(২) ধাগে তেটে কদে | ধাগে ঘ্রাং ঘ্রাং | ত্রেকেটে দেন্ তা কেটে তাক |

১
ধা-তেরে কেটে-ধা গিনা ॥

+ ৩
(৩) ঘড়াং ধাধা ঘেড়ে নাক্ | তেরেকেটে তাক তেরে কেটে তাক |

০ ১
তেরেকেটে তাকতাক তেরেকেটে | ধাগি নাধা তেরেকেটে ॥

+ ৩ ০
(৪) ঘড়াং ধাধা তেরেকেটে | ঘড়াং ধাধা দেন্ তা | কেটে তাগ

১
তাগ তেরে কেটেতাগ | তেরেকেটে তাগ ধেৎ তেরে কেটে ॥

+ ৩ ০
(৫) ঘড়াং ধাধা তেরেকেটে | ধাগি নাধা ত্রেকেটে | দেন্ তা কেটে

১
তাক্ তেরেকেটে | তাগ্ তেরে কেটে তাগ্ তেরে কেটে ॥

+ ৩
(৬) ঘড়াং ধাতে ঘেনে | তেরেকেটে তাগ্তাগ্ তেরেকেটে |

০ ১
কতে টেতা ঘেনে | তেরে কেটে দিগ্দাগ্ তেরেকেটে ॥

+ ৩ ০
(৭) ঘড়াং গদি ঘেনে | ঘেঘে নাক দেনে | কৎ-তেরে কেটে তাক

১
তেরে কেটে | তাগে তেটে ঘেনে ॥

+ ৩
(৮) কৎ তেটে ঘেতেরে | কেটেতাগ তাগ তেরে কেটে তাগ |

০ ১
তেটে কধা তেটেঘেটে | তাগ-দি ধা-তেরে কেটেতাগ ॥

+ ৩
(৯) ধা তেরেকেটে তাক্-ঘ্রাং | ধা তেরেকেটে তাক্-ঘড়াং |

০ ১
তা ঘড়াং তাক-ঘড়াং | ধা-+ তেরে কেটে তাক + তেরেকেটে ॥

+ ৩
(১০) ধা + তেরেকেটে তাক ঘড়াং | ধাগি নাধা + তেরেকেটে |

০ ১ +
ধা + তেরেকেটে তাক-ঘড়াং | ধাগি নাধা + তেরেকেটে | দেন্তা কতা

৩ ০
কতা | কেটে তাগা দেনে | ধা + তেরেকেটে তাক-ঘড়াং |

১
ধাগি নাধা + তেরেকেটে ॥

+ ৩ ০
(১১) কড়াং তেটে কদে | ধাগে দিং ঘেনা | + তেরেকেটে দেন্তা

১
কেটেতাগ | তেরেকেটে তাগতেরে কেটেতাগ ॥

+ ৩ ০
(১২) ধাগি নাধা + তেরেকেটে | ধাগি নাধা + তেরেকেটে | ধাধা

১ +
থুন্না কতা | + তেরেকেটে তাক-ধেৎ + তেরেকেটে | কতা কধা গিনা |

৩ ০ ১
ধাগি নাধা + তেরেকেটে | ধাধা থুন্না কতা | +তেরেকেটে তাক্-ধেৎ

+ তেরেকেটে ॥

+ ৩
(১৩) ধা- তেরে কেটে-ধা তেরেকেটে | ধা-তেরে কেটে-ধা ধা |

০ ১ +
ধা-তেরে কেটে-ধা গিনা | ধাগি নাধা ধা | ঘেন্ তেটে তেটে |

৩ ০ ১
ঘেঘে তেটে তেটে | কতা কধা গিনা | ধা-তেরে কেটে-ধা গিনা ॥

+ ৩ ০
(১৪) ধাগি নাধা গিনা | ধাগি নাথু্ ০ না | তেরেকেটে তাক্‌তেরে

১ + ৩
কেটেতাক | ধাগি নাধা গিনা | ধা-তেরে কেটে-ধা গিনা | ঘেড়াং ঘেনে নাক |

০ ১
তেরেকেটে তাক-ধা গিনা | ধা-তেরে কেটে-ধা গিনা ॥

+ ৩ ০
(১৫) কৎ তাঘে নেতা | কৎ তা ঘেন্ ০ তা | নেতা তেরেকেটে ধা |

১ + ৩
নেতা তেরেকেটে দেনে | ঘেনে ধাগে তেরেকেটে | ঘেনে ধাগে দেন্‌তা |

০ ১
কেটেতাগ তাগতেরে কেটেতাগ | তেরেকেটে তাগ-ধেৎ তেরেকেটে ॥

+ ৩ ০
(১৬) কৎ তাগে তেটে | ঘেনে ধাগে তেরেকেটে | ধাগি নাথুন্ ০ না |

১ + ৩
ধা তেটে তেটে | ক-তেরে কেটে-ধে কেটে | ঘেনে ধাগে তেটে |

০ ১
ধা-তেরে কেটে-ধা তেরেকেটে | ধা-তেরে কেটে-ধা গিনা ॥

+ ৩ ০
(১৭) ঘেনে কড়াং কড়াং | কৎ তা ঘেনে তা | ঘেনে কড়াং কড়াং |

১ + ৩
তেরেকেটে | তাগ-ধা গিনা | ঘেনে ঘেন্-তেরে কেটে-তাগ | দিগ্‌দাগ তেটে |

০ ১
তেরেকেটে | তাগ্‌তেরে কেটেতাগ | তেরেকেটে তাগ-ধা গিনা ॥

+ ৩ ০
(১৮) ধাগে তেটে ঘেনে | ঘেনে নাক দেনে | ধেৎ তাথুন্ ০ না |

১ + ৩
কেটে নাগ তেটে | কতে টেতা গেনে | ধা-তেরে কেটে-ধা গেনে |

০ ১
ধা-তেরে কেটে-ধা গেনে | ঘেনে নাক দেনে ॥

+ ৩ ০
(১৯) ধাগে নাগ নাগ | তেরেকেটে তাক ধা গিনা | ধেটেৎ ০ধা গিনা |

১ + ৩ ০
দিগে তাগ তেটে | কড়াং ০ধা গিনা | ধাগি নানা গিনা | ধাগি নাকড়াং ০ |

১
কড়াং ০ধা গিনা ॥

+ ৩
(২০) ধা-তেরে কেটে-ধা গিনা | ধাগি নাধা তেরেকেটে | ধাগি নানা গিনা |

১ +
তেরেকেটে তাকতেরে, কেটেতাক | তেরেকেটে তাক-ধেৎ ধাধা |

৩ ০ ১ +
ঘেড়ে টেতা ঘেনে | দেৎ তেটে তেটে | গ্রেদিন ০তা ০কে | ধা তেটে তেটে |

৩ ০ ১
ধেৎ তেটে তেটে | গ্রেদ্দিন ০তা ০কে | ধা গদি ঘেনে ॥

+ ৩ ০
(২১) ধা-তেরে কেটে-ধা গিনা | ধাগে নাগে তেটে | ধা-তেরে কেটে-ধা গিনা |

১ + ৩
ধাগে নাগে তেটে | কৎ তাগে তেটে | কৎ-তেরে কেটে-ধে কেটে |

০ ১
ধেৎ ধেরে কেটে | ঘেঘে নাগ তেটে ॥

\+ ৩ ০
(২২) ধা-তেরে কেটে-ধা গিনা | ধাগে নাগে তেটে | কতা ধেৎ তেটে |

১ + ৩ ০
কতা গদি ঘেনে | ঘেনে ঘেনে কতা | ঘেনে নাগ তেটে | কড়াং তেটে কদে |

১
তেরেকেটে তাগ ধা গিনা ॥

\+ ৩ ০
(২৩) ধেনে ধেনে ধাধা | ধাগি নাধা ধেটে তাক | তেরেকেটে দেন্‌তা কতা

১
ধাগি নাধা কেটেতাক ॥

\+ ৩
(২৪) ধেৎ ধা-তেরে কেটে তাক | ধেৎ ধা-তেরে কেটেতাক |

০ ১
কেটেতাক তাকতেরে কেটেতাগ | তেরেকেটে তাক-ধেৎ তেরেকেটে ॥

\+ ৩ ০
(২৫) ধা ধা ধা | তেরেকেটে ধাগে দেন্‌তা | তেরেকেটে তাক-ধা গিনা |

১ + ৩
ধাগে ধেনে ধাধা | ধা ধা ধা | তেরেকেটে ধাগে দেন্‌তা |

০ ১
কেটেতাক তাকতেরে কেটেতাক | তেরেকেটে তাক-ধেৎ তেরেকেটে ॥

\+ ৩ ০ ১
(২৬) ধেনে ধেনে ধাগে | ধাগে তেনে তাগে ধেটেৎ ০ধা গিনা তাগে তেনে

তাগে ॥

\+ ৩ ০
(২৭) ধাগি নাধা তেরেকেটে | ধেকে টেধান ০ | ধাগি নাধা তেরেকেটে |

১ + ৩
ধেকে টেধান্ ০ | ধাধা থুন্না কেটেতাগ | তেরেকেটে তাগ-দেৎ ০ |

০ ১
তেরেকেটে তাগ তেরে কেটেতাগ | তেরেকেটে তাগ-দেৎ ০ ॥

+ ৩ ০
(২৮) ঘেন্ তেটে ঘেনে | ধাগে ধা-তেরে কেটেতাক | দেৎ ক্রেদেৎ ৎদে |

১ + ৩ ০
ঘেনে তাগে তেটে | ধাগে তেটে তেটে | তেটে কতা কতা | ধা-তেরে কেটে

১
তাগ ধা | ধাধা কেটেতাগ তেরেকেটে ॥

+ ৩ ০
(২৯) ধা গধে নাক | তেটে কধে নাক্ | ধা-তেরে কেটে-ধে কেটে |

১ + ৩ ০
ঘেনা কধে ঘেন্ | ধা গধে নাক | তেটে কধে নাক | ধা-তেরে কেটে-ধে কেটে |

১ + ৩ ০
ঘেনা কধে ঘেন্ | ধাগি নানা গিনা | তাগে দেঘে ড়াং | ধা-তেরে কেটে-ধে

১
কেটে | ঘেনা কধে ঘেন্ ॥

+ ৩ ০
(৩০) তেরেকেটে ধেনে নাগ | ধেৎ ধাগে থুন্না | ধাগে নাধা কেটেতাগ |

১ + ৩
তেরেকেটে ধাগে নাধা | কৎ তেটে তেটে | কৎ-তেরে কেটে-তা গেনে |

০ ১
ধাগে নাধা কেটেতাগ | তেরেকেটে তাগ-ধেৎ তেরেকেটে ॥

তিওট

+ ৩
(১) ধাগে নাধা ত্রেকেটে | ধাগে নাগে দেন্‌তা কেটেতাগ্ |

০ ১
ত্রেকেটে তাগ তাগ তেটে | ধাগে নাধা ত্রেকেটে ধা ধিন্ ॥

+ ৩
(২) ঘেড়াং ধাধা তেরেকেটে | ঘেড়াং ধাধা ধা-তেরে কেটে তাগ |

০ ১
তাগ তেরে কেটেতাগ তেরেকেটে | ঘেড়াং ধাধা ধা-তেরে কেটে তাগ ॥

+ ৩ ০
(৩) ধান্ ঘেনে ত্রেকেটে | ধান্ ঘেনে ধাগে ত্রেকেটে | ধা-তেরে কেটেতাগ

১
তেরেকেটে | ধান্ ঘেনে ধাগে ত্রেকেটে ॥

+ ৩
(৪) ধাগে ত্রেকেটে তাগ্‌তাগ্‌ | ত্রেকেটে তাগ ধাগে তেটে |

০ ১
ধাগে দেন্‌তা কেটেতাগ্‌ | তেরেকেটে তাগ দেৎ তেরেকেটে ॥

+ ৩ ০
(৫) ঘেড়াং ধাধা তেরেকেটে | ধাগে নাগে দেনে ঘেনে | ঘেনে

১
ঘেন্-নাগ দেনে | তেরেকেটে তাগ্‌তাগ তেরেকেটে তাগ তাগ ॥

+ ৩ ০
(৬) কৎ তেটে তেটে | ঘে-তেরে কেটেতাক নাগ দেৎ | তা ক্রাং ০তা ক্রাং |

১
কেটেতাগ তেরেকেটে তাগ-দেৎ তেরেকেটে ॥

+ ৩ ০
(৭) ধাগে ঘেঘে ধাগে | ধাগে ঘেঘে ঘে-তেরে কেটেতাগ | কৎ-তেরে

১
কেটেতাগ তেরেকেটে | তাগতেরে কেটেতাগ তাগ-দ্দি কেটেতাগ ॥

ঝাঁপতাল

+ ৩ ০ ১ +
ঠেকা | ধা গে | ধা গি না | তে টে | ধা গি না | ধা- তেরে কেটে তাগ |

৩ ০ ১ +
ঘেনে ঘেনে ঘেনে | ধাগে নাধা | কেটে তাগ তেটে | কতা কতা |

৩ ০ ১
কতে টেতা গেনা | ঘেন্-তেরে কেটে তাগ | দ্দিগ দাগ তেটে ॥

+ ৩ ০ ১
(১) কৎ তেটে | ধেড়া ঘেনে নাগ | ধেড়ে ঘেনে | ঘেন্-তেরে কেটেতাগ

তেরেকেটে ॥

+ ৩ ০
(২) ধাগে তেটে । ধাগ নাগে তেটে । কৎ-তেরে কেটে তাগ ।
১
তেরেকেটে তাগ-দি কেটে তাগ ॥

+ ৩ ০
(৩) ধেরেকেটে কেটেতাগ । তেরেকেটে কৎ তেরেকেটে । তাগ-দেৎ
১ + ৩
তেটেকতা । গদি ঘেনে কৎ তেটে ঘেনে । ক্রাং-০ক্রাং ০দি । ঘেনে কতা
০ ১
গদি ঘেনে তেরেকেটে তাগ । ধাগে- ০থু ০না- কতা । তাগে- ০না
ক্রাং- ০ক্রাং ০ক্রাং ॥

+ ৩ ০ ১
(৪) ধাগে তেটে । ধাগে নাগে তেটে । তাগে তেটে । ঘেনে নাগে তেটে ।
+ ৩ ০ ১
কতা কতা । কেটে তাগে তেটে । কতে কেটে তাগ । তেরেকেটে
তাগ-দি কেটে তাগ ॥

+ ৩
(৫) ধেৎ-ধেরে কেটেগদি । ঘেনে ধাগে তেটেতাগে তেটেতেটে ।
০ ১
ধাতেরে কেটেধা ঘেনেধাগে । তেটেগদি ঘেনেকৎ ধেরেকেটে ॥

+ ৩ ০
(৬) ঘেঘে-দি কতেটেতা । গেনেগদি ঘেনেনাগ তেটেতেটে । ঘেঘে-দেৎ
১
তাঘেন্‌০নে । কতাকতা কৎ০তেরেকেটেতাগ তেরেকেটে-ঘ্রাং ॥

+ ৩ ০
(৭) কৎ-তেটে তেটেঘেঘে । দেন্‌-তাকেটেতাগ ঘ্রাং ধাগেনাকৎ । ঘেঘেদি০
১ +
ধাগনাধা । ক্রাং তাগে ০দ্রে ঘেদ্রে-ক্রাং । তেরেকেটে কেটেতাগ ।
৩ ০ ১
তেরেকেটে তাগতেরে কেটেতাগ । ধেরেকেটে তাগ-ঘ্রাং । -০তাগ ঘ্রাং ঘ্রাং ॥

+ ৩
(৮) ধেৎ ধেৎ ধেটে- ০ধা | ঘে-০ন্নে ঘেঘেতেটে কেটেতাগ |

০ ১ +
তেটে ০ক তাক্-ধা | ঘেনে নানা কৎ ঘেঘে-দেৎ | তেটে কতা কতা ধাগ্ |

৩ ০
ধাগে দেন্ তা কেটে তাগ | তেরেকেটে কৎ-তেরে |

১
কেটেতাগ তাগ-০ ঘ্রাং ০দেৎ ॥

+ ৩
(৯) ঘ্রান্-তেটে ধাগে-ত্রেকেটে | ঘ্রাং ধাত্তিৎ-০ ধেন্ ০-ঘেঘে |

০ ১
তেটে কতা-কৎ ত্রেগে তেটে | ক্রাং ধাঘেন্-০নে ঘেনে তাগে |

+ ৩
তেটে-ধা০ তেরে কেটে ধা০-ঘেনা | ধাগে থুন্ ধেটেৎ-০ ধা থুনা-কেটে তাগ্ |

০ ১
দেৎ-তেরে-কেটে-দেৎ তেরে-কেটে-কৎ-তেরে | কেটে তাগ-কতা

ধাগেন্-০না তেরেকেটে-তাগ ॥

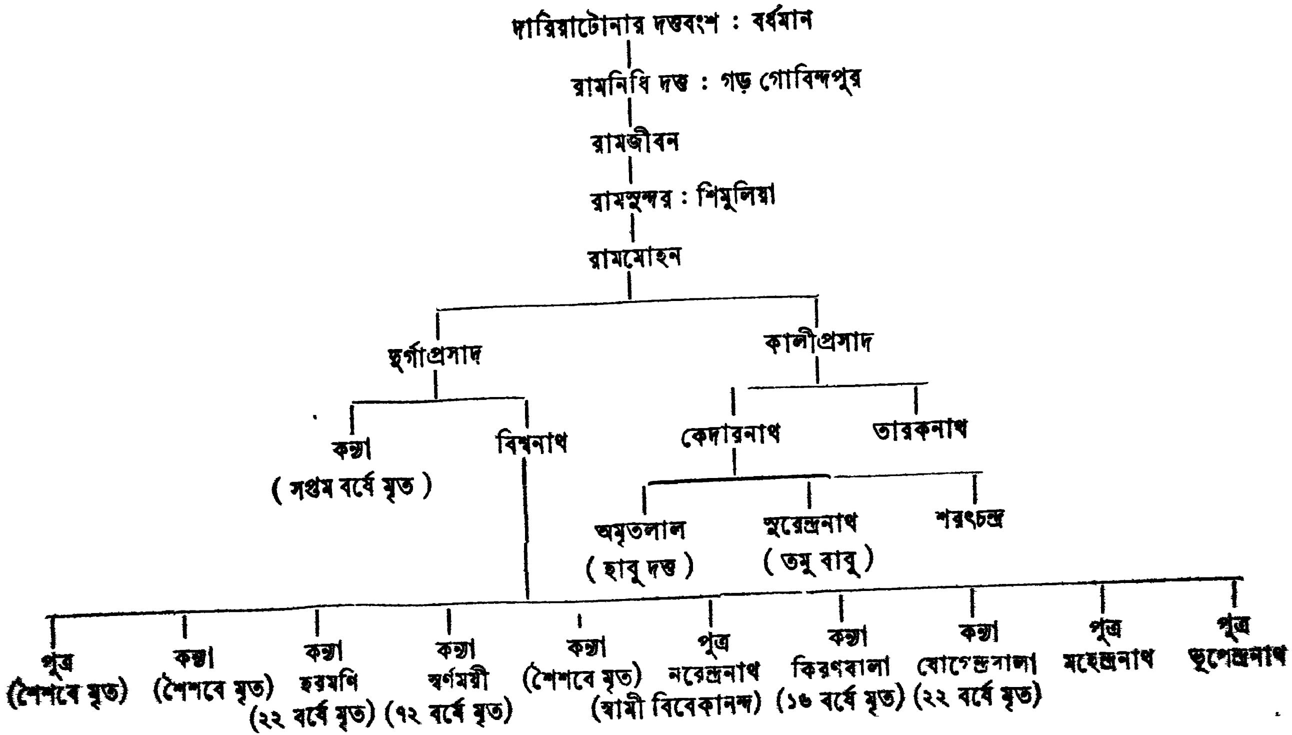
+ ৩
(১০) ধেরেকেটে-কৎ তাঘেন-০ নে | কতাকতা ঘেনে ধাগে নানা গেনে |

০ ১
ঘ্রাং দেৎ-ধাদেৎ | ত্রেকেটে-দেন্‌তা কেটেতাগ-তেরেকেটে দেৎ-তেটে |

+ ৩
ধা-তেটে ধা-তেটে | গদ্দি ঘেনে ঘেন্-তেরে-কেটেতাগ দেৎ |

০ ১
ত্রেঘেন্-০নে ধেরেকেটে কেটেতাগ | তেরেকেটে-তাগদেৎ০ দেৎ তা-ঘেনে ॥

নির্দেশিকা


দারিয়াটোনার দত্তবংশ : বর্ধমান
রামনিধি দত্ত : গড় গোবিন্দপুর
রামজীবন
রামসুন্দর : শিমুলিয়া
রামমোহন
দুর্গাপ্রসাদ
কালীপ্রসাদ
কন্যা
(সপ্তম বর্ষে মৃত)
বিশ্বনাথ
কেদারনাথ
তারকনাথ
অমৃতলাল
(হাবু দত্ত)
সুরেন্দ্রনাথ
(তমু বাবু)
শরৎচন্দ্র
পুত্র
(শৈশবে মৃত)
কন্যা
(শৈশবে মৃত)
কন্যা
হরমণি
(২২ বর্ষে মৃত)
কন্যা
স্বর্ণময়ী
(৭২ বর্ষে মৃত)
কন্যা
(শৈশবে মৃত)
পুত্র
নরেন্দ্রনাথ
(স্বামী বিবেকানন্দ)
কন্যা
কিরণবালা
(১৬ বর্ষে মৃত)
কন্যা
যোগেন্দ্রবালা
(২২ বর্ষে মৃত)
পুত্র
মহেন্দ্রনাথ
পুত্র
ভূপেন্দ্রনাথ